সাইয়েদ কুতুব শহীদ
তাফসীর
ফী যিলালিল
কোরআন
১ম খন্ড
কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১ম খন্ড

সূরা আল ফাতেহা

ও

সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

কোরআনের অনুবাদ ও

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ

মাওলানা সোলায়মান ফারুকী

হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১ম খন্ড সূরা আল ফাতেহা ও সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৬২ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৫

১৭তম সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪৩২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ মাঘ ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: একশত চল্লিশ টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

Ist Volume
(Sura Al Fateha & first part of Sura Al Baqara)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 362 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition
1995
17th Edition
Rabiul Awal 1432 February 2011
Price Tk. 140 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-09-X

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়
এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আলামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

এই খন্ডে যা আছে

❒

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়- হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত- এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ্ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ্ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ্ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

সাইয়েদ কুতুব শহীদ একটি মহা জীবন

বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের পঠিত–বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ভাষায় অনুদিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' শহীদ সাইয়েদ কুতুবের সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার এক অমর সৃষ্টি। আধুনিক জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত আরব আজমের প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে কোরআনের বাণী পৌঁছে দেয়ার এক প্রচন্ড তাগিদ রয়েছে এই তাফসীরের পাতায় পাতায়।

শহীদ সাইয়েদ কুতুব বিংশ শতকের একজন কালজয়ী প্রতিভা। তার প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানকোষ থেকে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর পাশাপাশি তিনি আরো অনেক কয়টি ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন। তার প্রতিটি বই যেমনি ইসলামী জ্ঞান গরিমায় মহীয়ান তেমনি তা জেহাদের উদ্দীপনায়ও বলীয়ান। তাঁর সাহিত্য যেমনি ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে তেমনি জেগে থাকা মানুষকে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ও প্রকাশিত হাজার হাজার ইসলামী সাহিত্যের সাথে শহীদ কুতুবের গ্রন্থমালার এখানেই তফাৎ।

তাফসীর শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের শত শত তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেখানে সেই বিশাল ভান্ডারে আরেকটি সংখ্যা যোগ করার জন্যে যে এই মহাপুরুষ তাঁর কলম ধরেননি, কিছুদূর এগুলে আমি জানি, আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন। আমি শুধু আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, 'ফী যিলালিল কোরআন' সত্যিই আমাদের সময়ের এক বিস্ময়কর তাফসীর। দুনিয়ার সব কয়টি সেরা তাফসীর গ্রন্থের পাশাপাশি এটি নিসন্দেহে আমাদের সাহিত্যে এক মহা মূল্যবান সংযোজন।

যে মহান চিন্তানায়কের কলম থেকে এই তাফসীর গ্রন্থটি নিসৃত হয়েছে, সেই গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশের এ পবিত্র মুহূর্তে তার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে দু'টো কথা না বললে মনে হয় তার রূহের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

সাইয়েদ কুতুবের শাহাদাতের পটভূমিকা

১৯৬৬ সালের ২৯শে আগস্ট সকাল বেলায় মিসরের যালেম শাসক জামাল নাসের–সাইয়েদ কুতুব এবং তার দু'জন সাথী মোহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ ও মোহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলকে নির্মমভাবে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। তিনজন মর্দে মোজাহেদ একত্রে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর জেলে তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, ফলে তিনি দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৫ সালের মে মাসে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একই বছরের ১৩ই জুলাই তারিখে যখন তাকে ১৫

বছর কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয় তখন তিনি এতো অসুস্থ ছিলেন যে, সেই আদেশটি শোনার জন্যে আদালতের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দশ বছরের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক যুলুম নিপীড়নের পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। তদানীন্তন ইরাকী প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের ব্যক্তিগত অনুরোধে জামাল নাসের কিছুদিনের জন্যে তাকে মুক্তি দিলেও সে তাকে আবার গ্রেফতারের নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে।

মুক্তির পর তিনি কায়রোর উপকন্ঠ-'হুলওয়ানে' অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তার সাথে যারা দেখা করতে আসতেন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। এ সময় অন্যান্য আরব দেশগুলো থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতারা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্যে তার কাছে ছুটে আসতেন। যালেম শাসকদের সাথে মোকাবেলা করে সারা বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করার বিষয়েই তারা তার সাথে আলোচনা করতেন। বলতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যসহ সব কয়টি আরব ভূখন্ডের ইসলামী দলগুলোর জন্যে সাইয়েদ কুতুব ছিলেন তখন প্রেরণার এক বিরাট উৎস।

এটাই ফেরাউনের উত্তরসূরী নাসের চক্রের সহ্য হলো না। তারা ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করলো। গ্রেফতারী পরোয়ানা পড়েই তিনি স্পষ্টত নিজের ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি জানি যালেমরা এবার আমার মাথাটাই চাইবে, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। নিজের মৃত্যুর জন্যে আমার কোনো আক্ষেপও নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আমার জীবনের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আগামীকালের ইতিহাসই এটা প্রমাণ করবে যে, ইখওয়ানুল মোসলেমুন সঠিক পথের অনুসারী ছিলো-না এই দিনের শাসকগোষ্ঠী?'

সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারের সাথে সাথেই শুরু হলো দলীয় নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ৬৫ সালের ১১ই অক্টোবরের দৈনিক টেলিগ্রাফের মতে এই গ্রেফতারের সংখ্যা ছিলো ৪০ হাজারের ওপর। এদের মধ্যে ৭ শত ছিলেন মহিলা। গ্রেফতারের পর এই বিপুলসংখ্যক নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। এদের অধিকাংশের ওপরই নাসেরকে হত্যা ও তার হুকুমতকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

বৈরুতের একটি পত্রিকা সে সময়ে এ ধরনের এমন একটি খবর প্রকাশ করেছে, যা শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারবে এদের ষড়যন্ত্র ছিলো কতো হীন, কতো স্থূল!

একটি হাস্যস্পদ ঘটনা

এক গোয়েন্দা পুলিশের পকেটে ইখওয়ানুল মোসলেমুনের সদস্য হওয়ার ফরম রেখে তাকে জামাল নাসেরের জনসভায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। সভার কাজ শুরু হলে সে ব্যক্তি নাসেরকে লক্ষ্য করে পরপর ১২ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে, কিন্তু একটি গুলীও নাসেরের শরীরের কোথায়ও লাগে না। যে ব্যক্তিটি গুলী ছুঁড়েছে সে কিন্তু পালাবারও চেষ্টা করছে না। একদল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নাসেরের সামনে নিয়ে যায়। নেতা বললো তার পকেট তল্লাশী করে দেখো, ইখওয়ানের কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না। সাথে সাথেই পুলিশের লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ

স্যার, এই যে দেখুন, ইখওয়ানের সদস্যভুক্তির ফরম তার পকেটে। তাকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলতে শুরু করে, হ্যাঁ, আমি ইখওয়ানের লোক, ইখওয়ানীরাই আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে গুলী করার জন্যে।

নেতাকে আর পায় কে? সে তো এই অজুহাতটির খোঁজেই ছিলো। গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানীদের বিচারের জন্যে গঠন করা হলো স্পেশাল সামরিক আদালত। বিচারক, বাদী-বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকিল–এরা সবাই প্রেসিডেন্টের নিয়োজিত। তারপরও তাদের রায় কার্যকর করার জন্যে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর প্রয়োজন হতো। অনুমোদনের নামে তা তার নির্দেশ হিসাবে কাজ করতো।

বিচারের নমুনা

সাইয়েদ কুতুবের বিচার শুরু হলো। বাদী পক্ষ সমর্থনের জন্যে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর বন্ধুদের কোনো কৌসুলী নিয়োগের অধিকার ও সুযোগ দেয়া হলো না। দেশের শাসনতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী সুদান ও মরক্কোর আইনজীবীরা মিসরের আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারলেও তাদের সে সুবিধা দেয়া হলো না। সাইয়েদ কুতুব ও তার সাথীদের মামলা পরিচালনার জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুদান, মরক্কো ও আরো দু-একটি আরব দেশের কয়েকজন আইনজীবী কায়রো এসেছিলেন। তাদের সবাইকে কায়রোর বিমানবন্দর থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। দু একজন আইনজীবীকে আদালত কক্ষ থেকে গলা ধাক্কা দিয়েও বের করে দেয়া হয়।

ফরাসী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি উইলিয়াম থরপও চেয়েছিলেন মামলার কাজে কায়রো আসতে, কিন্তু অনুমতি পাননি। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-ও এ ব্যাপারে তাদের চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তারা প্রথমত মামলা পরিচালনার জন্যে একজন আইনজীবী পাঠাতে চেয়েছে, নাসের অনুমতি দেয়নি। তারপর তারা বিচার কক্ষে তাদের একজন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চেয়েও সফল হয়নি।

১৯৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই প্রতিষ্ঠান তার এক প্রতিবাদলিপিতে লিখেছে, শুধু তাদেরই নয়, মিসরীয় স্বৈরশাসক গোটা বিচারকক্ষে কোনো বিদেশী নাগরিক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি এমনকি কোনো সাধারণ মানুষকেও ঢুকতে দেয়নি। আদালতের কোনো বিবরণী যেন সরকারের অথারাইজেশন ছাড়া সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না পারে তার জন্যে তারা একটি কুখ্যাত সেন্সরশীপ এ্যাক্ট চালু করে রাখে।

প্রথম ঘোষণা দেয়া হলো সমগ্র বিচারের অনুষ্ঠানটি জাতীয় প্রচার মাধ্যম সরাসরি প্রচার করা হবে, কিন্তু অভিযুক্ত নেতারা যখন অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের ওপর কারা কর্তৃপক্ষ যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন, তখন সম্পূর্ণ বিনা নোটিশেই সম্প্রচারের গোটা কর্মসূচী বাতিল করে দেয়া হলো।

এই হচ্ছে মিসরীয় সামরিক আদালতে বিচারের নমুনা–যার মাধ্যমে তাদের এতো বড়ো দন্ড দেয়া হয়েছে। বিচারালয়ে বিচারের নামে যে প্রহসন চালানো হয়েছে ১৯৬৬ সালের ১৩ই এপ্রিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণী কায়রোর আধা-সরকারী দৈনিক আল আহরাম পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে।

এতে দেখানো হয়েছে, আদালতে অভিযুক্তরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের নিজেদের কোনো কৌসুলী নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। এর মাঝেও সাইয়েদ কুতুব কিছু বলতে চাইতেন, কিন্তু তাকে কিছুই বলতে দেয়া হতো না।

এমনিভাবে সভ্য সমাজে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একদিন আদালত তার রায়ে বললো, 'হ্যাঁ তোমাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তোমরা সবাই মিসরের নেতা জামাল নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছো। তোমরা এ দেশের ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছো, তাই তোমাদের সবার নামে ফাঁসির আদেশ শোনানো হলো।'

এ ছিলো ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে এ ঘটনা দেখলো।

বিচারের নামে এ অবিচার দেখে মানবতা সেদিন আর্তনাদ করে উঠলো। কিন্তু কে কার কথা! শোনে গোটা নাসের চক্র যেন এদের ফাঁসির দৃশ্য দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো।

কিছু পেছনের ঘটনা

বাদশাহ ফারুকের সময়ের কথা।

১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিমী দুনিয়া বিশেষ করে বৃটিশদের ইশারায় সর্বপ্রথম ইখওয়ানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ইখওয়ানকে বে-আইনী ঘোষণা করার নীলনকশা আঁকা হয় কিন্তু লন্ডনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশরা ওয়াদা করেছিলো, যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন বৃটিশরা স্বাধীনতার প্রশ্নে টালবাহানা শুরু করলো তখন ইখওয়ান এর বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলে। অল্প দিনের মধ্যেই ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে গেলো। সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫ লাখের ওপর। সমর্থক ও কর্মীর সংখা ছিলো আরো বহুগুণ। ইখওয়ানের এ বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা দেখেই দেশকে যারা বিদেশী প্রভুদের হাতে বিক্রী করে দিতে চাইলো সে গোষ্ঠী এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অতপর লম্পট বাদশাহর লম্পটি উযিরে আযমকে কে বা কারা গুলী করলে এই দোষ চাপানো হলো ইখওয়ানের ঘাড়ে। শুরু হলো ইখওয়ানীদের ওপর চরম নির্যাতনের পালা।

এর কিছুকাল পরে একদিন আলোচনার অজুহাতে ষড়যন্ত্রমূলক এক বৈঠকের আয়োজন করলো কুচক্রীরা। রাস্তার মধ্যেই সরকারী খুনীদের হাতে শহীদ হলেন শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ইখওয়ানের মোর্শেদে আম (কেন্দ্রীয় নেতা) শহীদ হাসানুল বান্না। দিনটি ছিলো ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে রক্তপাতহীন এক সামরিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলেন কর্নেল নজীব। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক অফিসারদের এক তালিকা প্রণয়ন করলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সামরিক অফিসাররা ছিলো দীর্ঘদিন থেকে রাজা ফারুকের সব কয়টি কুকর্মের অংশীদার। এই দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মা অফিসারদের শীর্ষভাগে যার নাম ছিলো, সেই হলো জামাল আবদুন নাসের। কিভাবে যেন নাসের কর্নেল নজীবের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার খবর জেনে গেলো এবং তার কুকীর্তির সাথীদের নিয়ে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কর্নেল নজীবকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাতারাতি মিসরের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চাবিকাঠি

নিজের হাতে নিয়ে নিলো। ক্ষমতায় বসেই নাসের তার সামনে প্রধান বাধা হিসেবে দেখতে পেলো ইখওয়ানুল মোসলেমুনকে।

ইতিমধ্যে সুয়েজ খাল নিয়ে ইংরেজদের সাথে নাসের এক চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কমিটি একে মিসরের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। এই সময় সাইয়েদ কুতুবের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল মাজেল্লাতুল ইখওয়ান' পত্রিকা এই চুক্তিকে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করায় জামাল নাসের পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এবার নাসের তার পশ্চিমী প্রভুদের খুশী করার জন্যে বন্য জন্তুর ন্যায় ইখওয়ানের নিরীহ নেতা ও কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই মিসর হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি ও ইখওয়ানের প্রবীণ নেতা শহীদ আবদুল কাদের আওদাসহ ৫ জনকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয়।

আসামীর কাঠগড়ায় বিচারক

১৯৫০ সালে বাদশাহ ফারুক যখন ইখওয়ানীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুমনামা জারি করলো তখন ইখওয়ানের পক্ষ থেকে দেশের উচ্চ আদালতে এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারক আবদুল কাদের আওদা ছিলেন সেই আদালতেরই জজ। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইখওয়ানের পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তি শুনে মাননীয় বিচারক ইখওয়ানের পক্ষেই মামলার রায় দিলেন। মামলার কাগজপত্র পড়তে পড়তে এক সময় তিনিই নিজেই ইখওয়ানের ভক্ত হয়ে গেলেন।

পরে যখন সরকার এই রায়কে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলো, তখন জজ আবদুল কাদের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে উচ্চ আদালতে ইখওয়ানের পক্ষে উকীল হিসেবে মামলা পরিচালনা করেন এবং তিনি জয়লাভও করেন। এবার আর তার ইখওয়ানের সাথে সাংগঠনিকভাবে একাত্ম হতে বাধা রইলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি দলের কেন্দ্রীয় সহকারী নেতা (নায়েবে মোর্শেদে আম) নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

যেদিন নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ ও পরে বিচার বিভাগীয় নাটকের মাধ্যমে ফাঁসির আদেশ শুনানো হলো সেদিন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার কাছে এটা কোনো বিষয়ই নয় যে আমি কোথায় মরতে যাচ্ছি এবং কিভাবে যালেমরা আমার মৃত্যুদন্ড দেবে। আমি তো এতেই সন্তুষ্ট যে আমি আল্লাহ তায়ালার একজন অনুগত বান্দা হিসেবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি।'

শহীদ সাইয়েদ কুতুবকেও যেদিন দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হলো তখন তিনিও যালেমের মতিগতি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকেও এবার শাহাদাতের দরজায় পা দিতে হবে, তাই তিনিও একই ভাষায় বলেছিলেন, 'আমি আমার মৃত্যুর জন্যে দুঃখিত নই, এতে আমার কোনো আক্ষেপও নেই বরং আমি তো সন্তুষ্ট যে, তাঁর পথেই আমার প্রাণ যাচ্ছে।'

ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গোটা পরিবার

তার ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুবকে (যিনি বহু মূল্যবান ইসলামী সাহিত্যের লেখক) এতো অত্যাচার করা হয় যে, তার চোখে মুখে তাকালে তাকে চিনতে কষ্ট হতো। তার আপন দু'বোন হামিদা কুতুবকে দশ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং আমিনা কুতুবকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘরে নযরবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে শহীদ কুতুবের ভাগিনা মাত্র ২৫ বছর বয়সের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার রাফাত বকর আশ শাফেয়ীকে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বাধ্য করা হচ্ছিলো আদালতে দাঁড়িয়ে মামার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে। কিন্তু এই মর্দে মোজাহেদ রাযি হননি বিধায় তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা এতো বাড়িয়ে দেয়া হয় যে, তিনি কারার চার দেয়ালের ভেতরই শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের মর্যাদা দানকারী সে অমর পুস্তক

আদালতের নাটকীয় প্রহসনে যে বই-এর ওপর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছে তা হচ্ছে সাইয়েদ কুতুবের সেই বিখ্যাত বই 'মায়ালেম ফিত তারীক'। (পথের মাইল ফলক) মোট ১৩টি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বই-এর ৪টি অধ্যায়ই উদ্ধৃত করা হয়েছে শহীদের খ্যাতনামা তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' থেকে। কোনো অলস ও দুর্বল মনের মানুষকে ইসলামের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তোলার ব্যাপারে এই বইয়ের সত্যিই কোনো জুড়ি নেই। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বহু ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

তার রচিত গ্রন্থের তালিকা অনেক বড়ো

শহীদ সাইয়েদ কুতুব সাহিত্য সংস্কৃতির ময়দানে ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্যে বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। তার রচনাবলীর মধ্যে 'ফী যিলালিল কোরআন' নিসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মূল্যবান তাফসীর লিখে তিনি ইতিহাসের পাতায় সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে একাধিক উপন্যাস রয়েছে, বেশ কয়টি জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যও রয়েছে। তেফলে মিনাল ক্বারিয়া (গ্রামের ছেলে), মদীনাতুল মাসহুর (যাদু নগরী), মাশাহেদুল কেয়ামাহ ফিল কোরআন (কোরআনে পেশ করা কেয়ামতের দৃশ্যসমূহ), আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন, (কোরআনে শিল্পগত ছবি), আল আদালাতুল এজতেমায়ীয়াতু ফিল ইসলাম (ইসলামে সামাজিক সুবিচার), মা'রেকাতুল ইসলাম ওয়ার রেসমালিয়াহ (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব) আস সালামুল আলামে ওয়াল ইসলাম (ইসলাম ও বিশ্বশান্তি), দেরাসাতুল ইসলামিয়াহ (ইসলামী রচনাবলী), আন নাকদুল আদাবে-উসূলুহ ও মানাহেজুহ (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি), আন নাকদু লে কেতাবে মুসতাকবেলেস সাকাফাহ (ভবিষ্যতের সংস্কৃতি শীর্ষক একটি পুস্তকের সমালোচনা), কেতাবুন ও শাখছিয়াতুন (গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব), নাহজু মুজতামেয়ুল ইসলামী (ইসলামী সমাজের দৃশ্য) আমরিকা আল লাতি রা'আইতু, (আমার দেখা আমেরিকা), আল আতইয়াফুল আরবা (চারজনের চিন্তাধারা)।

সর্বশেষে রয়েছে তাঁর সেই মহা বিপ্লবের গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক' (পথ চলার নির্দেশনাসমূহ)। এই গ্রন্থের মাঝেই শহীদ কুতুব দেশ, জাতি নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসনলমানকে আহ্বান জানিয়েছেন নিজেদের ঘাড় থেকে জাহেলিয়াতের সব ধরনের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে আল কোরআনের ঝান্ডা হাতে নিয়ে যালেমদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। সমস্ত যালেম মোনাফেক শাসকদের উৎখাত করে তার স্থলে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন কায়েমের জেহাদে শরীক হতে তাদের ডাক দিয়েছেন। (এই বইতে সাইয়েদ কুতুব যে ভূমিকা লিখেছেন, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' নামে আমরা তা এখানে পেশ করেছি)

কোন্ পরিবারে এ সোনার মানুষ

মায়ের নাম ফাতেমা হোসাইন ওসমান, পিতার নাম হাজী ইব্রাহীম কুতুব। তার নিজের সম্মানিত নাম সাইয়েদ, কুতুব বংশীয় উপাধি। ১৯০৬ সালে মিসরের উসউত জেলার প্রাচীন পল্লী-মুশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদার আমলে এই বংশের লোকেরা আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিসরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দুস্থানের অধিবাসী, অবশ্য এব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রমাণ আমাদের নযরে পড়েনি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৫ জন। মিসরের মাটিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গোটা

পরিবারটাই ছিলো এক ইস্পাত কঠিন ঘাঁটি। তার ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুব নিজেও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বোন হামিদা ও আমিনা দু'জনই যালেমদের কারাগারে বহু অত্যাচার সয়ে এক সময় খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন।

শৈশবেই মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন গ্রামের মাকতাবে। পরে পিতার সান্নিধ্যে চলে আসেন কায়রো শহরের উপকণ্ঠে–হুলওয়ান নামক স্থানে। সেখানে তিনি তাজহিযিয়াত দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে সেখানকার পড়া শেষ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মাদ্রাসা দারুল উলুম কায়রো থেকে বিএ ডিগ্রী হাসিল করে আপন যোগ্যতার বলে সেখানেই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

কিছুকাল পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে নিয়োগপত্র পান। একপর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে তাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। দু'বছর ধরে আধুনিক পৃথিবীর পাপের দেশে বাস করার সময় তিনি সচক্ষে দেখলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধস নেমেছে। এই সর্বগ্রাসী ধস রুখতে হলে মানবজাতিকে পুনরায় আল্লাহ তায়ালার কেতাবের দিকে ফিরে না এসে কোনো উপায় নেই, এই পরিপক্ক ঈমান নিয়েই তিনি ১৯৪৫ সালে শহীদ হাসানুল বান্নার জেহাদী কাফেলা ইখওয়ানুল মোসলেমুনে যোগদান করেন।

নিজের যোগ্যতা ও অসামান্য প্রতিভার বলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সাইয়েদ ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ। সাহিত্য সংস্কৃতি তথা জ্ঞানের জগতে বিপ্লব সৃষ্টির ওপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন। জ্ঞানের জগতে পা দিয়ে তিনি লিখতে শুরু করলেন 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মতো এক অমূল্য তাফসীর গ্রন্থ। এর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে তিনি ডাক দিলেন, জাহেলিয়াতের বাধা-বিপত্তির বাঁধ ভেঙ্গে এসো আমরা সবাই আশ্রয় নেই 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা কোরআনের সুনিবিড় ছায়াতলে।

মানব জাতির গোটা ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, এই ডাক যিনিই দিয়েছেন তাকেই যালেমরা হয় কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছে, না হয় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইতিহাসের এ অমোঘ ভাগ্য থেকে কেউই মাহরুম হয়নি, কিন্তু যালেমরা কখনোই মযলুম মোজাহেদদের মনোবল ভাংতে পারেনি। এই দীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া যাবে না যেখানে সংগ্রামী নবী রসূল, সাহাবী ও তাদের অনুসারীরা যালেমদের কাছে ক্ষমার আবেদন জানিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের এই ধারায় শহীদ কুতুব ছিলেন এক দুর্লভ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী।

১৯৫৫ সালে যখন আদালতের প্রহসন করে তাকে নাসের সরকার ১৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলো তখন তিনি দন্ডাদেশ শুনে শুধু মন্তব্য করলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন (অবশ্যই আমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে)। পরে নাসের সরকার তার কাছে এক অদ্ভূত প্রস্তাব পেশ করে বললো, তিনি যদি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে তার দন্ডাদেশ লঘু করে দেয়া হবে। সাইয়েদ কুতুব এ হাস্যকর প্রস্তাব শুনে মন্তব্য করলেন, 'যালেমের পক্ষ থেকে এই ধরনের হীন প্রস্তাবে আমি ঘৃণা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি 'ক্ষমা' শব্দটি আমাকে নাসেরের ফাঁসির কাষ্ঠ থেকেও বাঁচাতে পারে তবু আমার জীবন থাকতে আমি যালেমের কাছে ক্ষমা চাইবো না। আমি আমার মালিকের দরবারে এমনভাবে হাযির হতে চাই, যেখানে আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকবো এবং তিনিও আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।' (রচনাঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ)

আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

একান্ত শৈশব থেকেই আমি আমার মায়ের কাছে কোরআন পড়তে শুরু করি। কোরআনের বিষয়সমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের কিছুই তখন আমি বুঝতাম না। আমার জ্ঞানের পরিধিই বা তখন কতটুকু ছিলো যে, কোরআনের মহান ও জটিল বিষয়গুলো আমার বুঝে আসবে! কিন্তু মর্মোদ্ধার করতে না পারলেও কেন যেন শৈশবেই আমি এর একটা প্রভাব নিজের মনে অনুভব করতাম। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় এর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু কিছু কাল্পনিক দৃশ্য আমার সহজ ও সরল মনে অংকিত হয়ে যেতো, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিতান্ত মামুলী ব্যাপার বলে মনে হলেও এগুলো আমার অন্তরে কোরআনের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। আমি অনেকক্ষণ ধরে এসব কাল্পনিক চিত্রে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে ডুবে থাকতাম।

এ ধরনের একটি সহজ ও সরল দৃশ্য যা আমার অন্তরে সেদিন অংকিত হয়েছিলো তা ছিলো নিচের আয়াতটি সম্পর্কিত। আয়াতটি পড়ার সময় প্রায়ই আমার মনে একটি কল্পনার দৃশ্য ভেসে উঠতো। 'মানুষের ভেতর এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে একান্ত প্রান্তসীমায় বসে। যখন সে কোনো কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখতে পায় তখন সে এবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে, আবার যখন সে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন সে এবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন ধরনের মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' (সূরা আল হজ্ব ১১০)

এ আয়াত পড়ার পর আমার মনে এর যে কাল্পনিক চিত্র অংকিত হয়েছে তা আজ যদি আমি কারো কাছে বলি তাহলে সম্ভবত তা তার মনে হাসির উদ্রেক করবে।

সে দৃশ্যটি ছিলো এমন যে, আমি এক গ্রামে বাস করি। এই গ্রামের পাশেই একটি মাঠ, সে মাঠের একপাশে একটি উঁচু টিলা। আমি কল্পনার রাজ্যে দেখতাম আর এই টিলাটিকে মনে করতাম এই বুঝি একজন মানুষ, যিনি ঝুলে থাকা একটি ঘরের একেবারে কিনারায় অবস্থান করছেন অথবা স্থানের সীমাবদ্ধতার কারণে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন, কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। একেবারে প্রান্ত সীমায় থাকার কারণে প্রতিটি নড়াচড়ার সময় তিনি কাঁপছেন, মনে হয় এই বুঝি পড়ে যাবেন। আমি যেনো তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি। তার প্রতিটি নড়াচড়াকে একান্ত আগ্রহ ভরে অবলোকন করছি। তার দিকে তাকিয়ে তার অবস্থার একটি কাল্পনিক চিত্র এমনি করে নিজের মনে এঁকে যাই। যখনই কোরআনের এ আয়াতটি পড়তাম তখন আমার মনে এই কল্পনার চিত্রটি অংকিত হয়ে যেতো।

'হে নবী, তাদের সবাইকে তুমি সেই হতভাগ্য ব্যক্তির কাহিনী পড়ে শোনাও, যে ব্যক্তিকে আমি আমার কোরআনের আয়াত ও এর নিদর্শনসমূহ দান করেছি, সে এগুলো থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর এক সময় তাকে শয়তান পেয়ে বসলো এবং সে শয়তানের আনুগত্য করে গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। অথচ আমি যদি চাইতাম তাহলে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে

তাকে উঁচু মর্যাদাও দান করতে পারতাম। কিন্তু তার অবস্থা ছিলো ভিন্নতর। সে মাটি আঁকড়েই থাকলো এবং নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করলো। তার উদাহরণ হচ্ছে একটি কুকুরের মতো, তার ওপর তুমি কোনো বোঝা উঠিয়ে দিলে সে নিজের জিহ্বা বের করে দেয়, আবার তাকে ছেড়ে দিলেও সে একইভাবে জিভ বের করে রাখে।' (সূরা আল আরা'ফ ১৭৬)

আমি এ আয়াতের বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্যের কিছুই তখন বুঝতাম না। কিন্তু এ আয়াত পড়ার সময় আমার মনে একটি চিত্র অংকিত হতো এবং তা ছিলো এমন এক ব্যক্তির যার মুখ খোলা, জিহ্বা ঝুলছে, আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, কেন সে এমন করে। আমি তার কাছে যাবার সাহস করতাম না। এছাড়াও অন্যান্য আয়াত পড়ার সময় আমার ক্ষুদ্র মনে এ ধরনের কিছু কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা হতো। আর এই কাল্পনিক চিত্রগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে আমার খুব ভালো লাগতো। এ কারণেই আমার মন কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে ব্যস্ত থাকতো। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ার সময় কোরআনেরই আভ্যন্তরীণ ময়দানে আমি আমার কল্পনার দৃশ্যসমূহ খুঁজে বেড়াতাম। বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে এ কাল্পনিক ও স্বপ্নময় সুন্দর চিন্তা-ভাবনা অংকনের দিনগুলো সব অতিবাহিত হয়ে গেলো।

এরপর এলো এমন এক সময় যখন আমি জ্ঞানার্জনের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে কোরআন বুঝার চেষ্টা করলাম। শিক্ষকদের মুখে কোরআনের তাফসীর শুনলাম। কিন্তু কেন যেন এই পড়ায় এবং শোনায় আমি আমার ছেলেবেলার সে আনন্দটুকু আর খুঁজে পেলাম না। আফসোস! কোরআনে সৌন্দর্যের সেসব চিহ্নসমূহ যেনো সব একে একে মিটে গেলো। আনন্দ ও উৎসাহ থেকে কোরআন যেনো খালি হয়ে গেলো; কিন্তু কেন! আমার কি হলো! একি তাহলে দুই ধরনের কোরআন? একি আমার সেই শৈশবের সহজ সাবলীল মিষ্টিমধুর আনন্দ যোগানোর কোরআন কিংবা এই যৌবনের কোরআন যা জটিল, প্যাঁচানো এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেকটা খাপছাড়া!

ভাবলাম, সম্ভবত তাফসীরের ধরন ও স্টাইলের অনুকরণের ফলেই আমার মনে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমি তাফসীরের সাহায্য বদলে স্বয়ং কোরআনকে কোরআন দিয়েই বুঝার চেষ্টা করলাম। কিছুদিন পরই আমি আমার সেই প্রিয় ও প্রাণস্পর্শী কোরআনের সন্ধান আবার পেয়ে গেলাম। কোরআনের সাথে উৎসাহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করার সেই আনন্দদায়ক দৃশ্যসমূহের আমি সন্ধান পেয়ে গেলাম। তবে আগের এসব দৃশ্যকে এখন আর সরল সহজ মনে হয় না। কারণ এখন আমার বোধশক্তিতে পরিবর্তন এসেছে, এখন আমি এসব আয়াতের মর্মোদ্ধার করতে পারছি এবং আমি এও বুঝতে পারছি, এগুলো হচ্ছে মূলত মানুষের জীবনের কিছু বাস্তব ঘটনার উদাহরণ, যাকে এভাবে পেশ করা হয়েছে, এর সব কয়টির প্রভাব ও আকর্ষণই এখানে স্থায়ী ও অনড়। আল হামদুলিল্লাহ! আমি আবার কোরআনকে পেয়ে গেলাম।

এবার আমি ভাবলাম এখানে এই নতুন পাওয়া জ্ঞানের নমুনা হিসেবে কয়েকটা আলোচনা লোকদের সামনে পেশ করি। অতপর ১৯৩৯ সালে 'আল মোকতাতাফ' ম্যাগাজিনে আমি 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। এতে আমি কোরআন থেকে কয়েকটি সঠিক ঘটনা সম্বলিত চিত্র আঁকতে চেষ্টা করলাম, তার শিল্পগত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা পেশ

করলাম। পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরাতের এমন বর্ণনাও পেশ করলাম যা শব্দের আবরণে দারুন বিচিত্র দৃশ্য অংকন করে রেখেছে। প্রকৃত পক্ষে কোনো আলোকচিত্র শিল্পীর পক্ষেও এর সঠিক অংকন সম্ভব নয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, এই প্রবন্ধগুলো তো একটি গোটা পুস্তকের আলোচ্যসূচী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

আরো কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। কোরআনের সে সব দৃশ্য আমার মনে আস্তে আস্তে তৈরী হতে থাকলো। আমি এর সর্বত্র শিল্পের অলৌকিকত্বের সন্ধান পেতে থাকলাম। আর এসব কিছু যখন আমি গভীরভাবে দেখতাম তখন আমার মনে এই ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে যেতো যে, আমি নিজেই এ কাজটার দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং এ কাজটাকে সুসম্পন্ন করি, যতদূর সম্ভব এর পরিধিকে বিস্তৃত করে দেই। প্রায়ই আমি তখন কোরআন অধ্যয়নে নিমজ্জিত থাকতাম এবং ক্রমেই এর থেকে অমূল্য দৃশ্যসমূহ বের করতে চাইতাম। যতোই দিন এগুতে থাকে ততোই আমার অন্তরে এই বিষয়ের ওপর কিছু একটা করার এরাদা পরিপক্ব হতে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে সময় সময় এমন কিছু বাধা বিপত্তি এসে সামনে দাঁড়াতো যে এই পরিকল্পনা আমার কাছে অন্তরের একটা আক্ষেপ ও মানসিক উৎসাহ হয়েই থেকে যেতো। অতপর পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেলো। পুনরায় 'আল মোকতাতাফ' ম্যাগাজিনে এ সিরিজের প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করার আমার সুযোগ হলো। আমি যখন এ আলোচনা শুরু করলাম তখন আমার প্রথম কাজ ছিলো কোরআন থেকে এর শৈল্পিক চিত্রসমূহকে একত্র করা এবং তা পাঠকদের কাছে পেশ করা। তাছাড়া এ মহাগ্রন্থের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা পেশ করা বিশেষ করে এর সর্বত্র যে নিপুণ শিল্পকলার সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তাকে তুলে ধরা। আলোচ্য নিবন্ধে কোরআনের অন্যান্য আলোচনা ও উদ্দেশ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না বরং আমি যা চেয়েছি তা ছিলো এর খাঁটি শিল্পগত দিকগুলো তুলে ধরা।

কিন্তু এবার আমি কি দেখলাম! আমি যেনো এক নতুন সত্যের সন্ধান পেলাম যা আমার সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমি দেখলাম কোরআনে উপস্থাপিত উদাহরণসমূহ তার অন্যান্য বর্ণনা ও অংশ থেকে আলাদা কিছু নয়। এর আলাদা কোনো অবস্থানও নেই বরং কোরআনের বর্ণনাভংগিটাই হচ্ছে এর সাহিত্যিক দৃশ্য ও চিত্রের নিপুণ অংকন। এ হচ্ছে এমন এক রচনাশৈলী যাকে শরীয়াতের হুকুম আহকাম বর্ণনা করার বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যার জন্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমার সামনে কোরআনের কতিপয় সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও তার নিদর্শনসমূহ একত্রিত ও সংকলিত করার বিষয়টাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো না, বরং কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতির নতুন পথ উদ্ভাবন করাও আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ ছিলো এক অসীম নেয়ামত যা তিনি আমাকে দান করলেন। অতএব এক নতুন পদ্ধতিতে এই বইয়ের বিষয়সমূহের বিন্যাস শুরু হলো। এই বইতে যা কিছু আছে তা উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভংগিরই বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআন ব্যাখ্যার পদ্ধতির বৈশিষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করাই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই তুলনামূলক পর্যালোচনা আমি যখন শেষ করলাম তখন আমি অনুভব করলাম, কোরআন এক নতুন রূপে আমার মনে অবতীর্ণ হলো। আমি এমনভাবে কোরআনকে পেলাম যেমন করে ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। কোরআন আমার অন্তরে এক নতুন সৌন্দর্যের আকার ধারণ করে নিলো–অবশ্য আগেও তা আমার অন্তরে এমনি সৌন্দর্যমন্ডিতই ছিলো, তবে তা ছিলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। আজ তা আমার সামনে একটি সাজানো ও গোছানো পুস্তক আকারে উপস্থিত, যা একটি বিশেষ মযবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এমন একটি বুনিয়াদ যাতে এক আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব মিল রয়েছে, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো অনুধাবন করতে পারিনি, যার স্বপ্নও আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। সম্ভবত অন্য কোনো কল্পনা দিয়ে তা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। কোরআনের এসব দৃশ্য ও চিত্রসমূহের উপস্থাপন করতে গিয়ে আমার মানসিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-অনুভূতির যথাযথ দাবী আদায় করার ব্যাপারে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে তওফিক দান করেন তাহলে এটাই হবে এই পুস্তকের পূর্ণাংগ সাফল্যের মাপকাঠি।

আমার প্রিয় মা, আমার আজো মনে আছে গ্রামে তখন রমযানের মাস। আমাদের ঘরে ক্বারী সাহেবরা সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কোরআনের তেলাওয়াত করতেন। তখন গভীর ভালোবাসার সাথে তুমি পর্দার পেছন থেকে কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে। আমি তোমার পাশে বসে যখন দুষ্টুমি করে চীৎকার দিতাম যেমনটি করে এ বয়সের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা–তখন তুমি ইশারা ইংগিতে আমাকে চুপ থাকতে বলতে। এ সত্তেও তোমার সাথে কোরআন শোনার মাহফিলে আমি শরিক হতাম। আমি যদিও কোরআনের মর্ম অনুধাবনে তখন ছিলাম নিতান্ত অজ্ঞ, কিন্তু আমার অন্তর ছিলো কোরআনের ভাষা ও এর অলৌকিক বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ। এরপর যখন তোমার হাতে আমি বড় হতে থাকলাম তখন তুমি আমাকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলে। তোমার বাসনা ছিলো আমার বক্ষকে যেন আল্লাহ তায়ালা কোরআনের জন্যে খুলে দেন এবং আমি যেন কোরআন শরীফ মুখস্থ করতে পারি। আমি যেন সুন্দর সুললিত কণ্ঠে তোমার সামনে বসে সারাক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি। অতপর একদিন আমি কোরআন শরীফ মুখস্থ করে নিলাম। এভাবে তোমার আকাঙ্খার একটা অংশ পূর্ণ হয়ে গেলো।

প্রিয় মা আমার, আজ তোমার সেই কচি ও নিষ্পাপ শিশু, তোমারই কলিজার টুকরা শিশু তোমারই শিক্ষা ও অনুশীলনের এই ফলশ্রুতিটুকু তোমারই খেদমতে পেশ করছে। বর্ণনার সৌন্দর্য বিন্যাসে যদিও তাতে ত্রুটি আছে কিন্তু ব্যাখ্যাগত সৌন্দর্যের নেয়ামত থেকে তা কোনো অবস্থায়ই বঞ্চিত নয়।

(সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে। তরজমঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী)

কোরআনের উপস্থাপিত

আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

গোটা মানবজাতি আজ একটি অতলান্ত খাদের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কালের বহুমূখী ধ্বংসলীলা আজ তাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে বলেই যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, বরং এ অবস্থাটা হচ্ছে ভয়াবহ রোগের একটা লক্ষণ মাত্র। আসল রোগ কিন্তু এটা নয়। মানবজাতি আজ যে কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের সার্বিক উন্নয়ন ও সত্যিকার অগ্রগতির জন্য জীবনের জন্য যে মূল্যবোধ প্রয়োজন, তা হারিয়ে ফেলেছে। আজ পাশ্চাত্য জগতের বুদ্ধিজীবীদের কাছেও তাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা একথা অনুভব করছে যে, মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার উপযোগী জীবনের কোনো মূল্যবোধ তাদের কাছেও বর্তমান নেই। তারা জানে যে, তাদের নিজেদের বিবেককে পরিতুষ্ট করা ও তার স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার মত কোন মূলধনও তাদের কাছে নেই।

পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র নিষ্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে প্রাচ্যের চিন্তাধারা, মতবাদ গ্রহণ করতে। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাদের কিছু কিছু দেশ এখনো সমাজতন্ত্রের নামে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। ওদিকে প্রাচ্য জোটেরও একই দশা। তাদের সমাজ বিধান, বিশেষ করে মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদ শুরুতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলো, কিন্তু চিন্তা থেকে নেমে যখন তা বাস্তব ভূমিতে পা রেখেছে তখনই মার্কসীয় মতবাদ পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। একথা বলা আজ মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমান দুনিয়ায় কেন একটি দেশও সত্যিকার মার্কসবাদ কায়েম হয়নি। কেননা, এ মতবাদ সার্বিকভাবে মানুষের জন্মগত স্বভাব ও তার মৌলিক প্রয়োজনের পরিপন্থী। মার্কসীয় আদর্শ শুধুমাত্র অধপতিত অথবা দীর্ঘকাল যাবত একনায়কত্বের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট নিষ্প্রাণ সমাজেই সাময়িকভাবে প্রসার লাভ করতে পারে। যদিও দেখা গেছে, সে ধরনের সমাজেও এই বস্তুবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান দানে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ এই বস্তুবাদী অর্থনীতিই হচ্ছে মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তি। কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর গুরু রাশিয়াই আজ ভয়াবহ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন। জারের শাসনামলে যে রাশিয়া উদ্বৃতি খাদ্য উৎপাদন করতো, সে দেশই আজ তার সংরক্ষিত স্বর্ণের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সমবায় খামারভিত্তিক চাষাবাদই এ ব্যর্থতার কারণ। অন্য কথায় বলা যায় মানব স্বভাবের বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা কায়েমের ফলেই মার্কসীয় মতবাদ আজ এ নির্মম ব্যর্থতার সম্মুখীন।*

* স্মরণ রাখা প্রয়োজন প্রবন্ধটি প্রায় ৫০ বছর আগের লেখা।

মানবজাতির আজ নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ ক্ষয়িষ্ণু। এর কারণ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বস্তুতান্ত্রিক অবস্থা অথবা আর্থিক ও সামরিক শক্তির দুর্বলতা নয়, এর কারণ আরো গভীরে। পাশ্চাত্য জগত মানবজাতির নেতৃত্বের আসন থেকে এ জন্যে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে যে, জীবনীশক্তি সঞ্চারকারী যেসব মৌলিক গুণাবলী তাকে একদিন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলো, সেসব গুণ আজ তার কাছে অবশিষ্ট নেই।

অনাগত দিনের নতুন নেতৃত্বকে ইউরোপের যাবতীয় সৃজনশীল প্রতিভার অবদানগুলোকে সংরক্ষণ করে তার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটাতে হবে, সাথে সাথে মানব জাতির সামনে এমন মহান আদর্শ ও মূল্যবোধ পেশ করতে হবে, যা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

ভবিষ্যতের নেতৃত্বকে মানবজাতির সামনে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও বাস্তব জীবন বিধানও পেশ করতে হবে, যা মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই উল্লেখিত মূল্যবোধ ও জীবন বিধান দান করতে সক্ষম।

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানের প্রতাপও এখন শেষ হয়ে এসেছে। ষোড়শ শতকে যে রেনেসাঁ আন্দোলন সূচনা হয়েছিলো, আঠারো ও উনিশ শতকে এসে যে বিজ্ঞান বিজয়ের উঁচু শিখরে পৌছে গেছে বলে দাবী করছিলো–আজ তা নিষ্প্রভ হয়ে পুনরুজ্জীবন শক্তি মনে হয় হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক যুগে যেসব জাতীয়তাবাদী ও উগ্র স্বদেশিকতাবাদী মতবাদ জন্ম নিয়েছে এবং এগুলোকে ভিত্তি করে যেসব আন্দোলন ও জীবনযাত্রার প্রণালী গড়ে উঠেছে, সবগুলোই আজ বলতে গেলে নির্জীব হয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে বলতে হয়, মানুষের তৈরী সকল জীবন বিধানই আজ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এ নাযুক ও বিভ্রান্তিকর ও অস্বস্থিকর পরিস্থিতিতে মুসলমানদের নিজ দায়িত্ব পালনের সময় এসেছে। জেনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কখনো সৃষ্টিজগতকে তার বস্তুসত্তার আবিষ্কারে বাধা দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময়ই মানবজাতিকে সৎপথ দেখানোর দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছেন।

এ দায়িত্ব পালনকে কয়েকটি শর্তাধীনে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এটাকেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন,

'তোমার মালিক যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি দুনিয়ার বুকে আমার খলীফা পাঠাতে চাই। (সূরা আল বাকারা ৩০)

'আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' (সূরা আয যারিয়াত ৫৬)

এ তো হচ্ছে খেলাফাত ও বন্দেগীর কথা। কিন্তু এর সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মোমেন বান্দাদের ওপর যে দায়িত্ব পালনের ভার দিয়েছেন, তা পূরণ করার সময় আজ এসে গেছে এবং তা হচ্ছে,

এভাবে তোমাদের আমি এক মধ্যবর্তী উম্মত হিসেবে পয়দা করেছি যেন তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল (স.) তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন।' (সূরা আল বাকারা ১৪৩)

'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যেই তোমাদের উত্থান। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং নিজেরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান ১১০)

ইসলাম কখনো সমাজ ও জাতির বুকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তার এ ভূমিকা পালন করতে পারে না। কেননা মানুষ নিছক প্রশংসা শুনে কোনো মতবাদ গ্রহণ করতে রাযী হয় না। তারা বাস্তবে রূপায়িত ব্যবস্থাকেই সহজে বিচার করতে পারে এবং তাকেই পেতে চায়। এ দৃষ্টিভংগী থেকে বলা যায় যে, বিগত কয়েক শতক যাবত মুসলিম জাতি তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে তারা আল্লাহ তায়ালার দুনিয়ায় এমন একটি ভূখণ্ড দেখাতে সক্ষম হবে না যেখানে ইসলাম তার পূর্ণ সত্তায় বিরাজমান রয়েছে। আজকের মুসলমানদেরকে দেখলে একথা বিশ্বাসই হয় না যে, তাদের পূর্ব পুরুষেরা সত্যি সত্যিই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হবে এমন একদল লোকের নাম, যাদের চলন বলন, ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন ও মূল্যবোধ সবকিছুই ইসলামী উৎস থেকে গৃহীত হবে। যে মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিধান পৃথিবীর ওপর থেকে অপসারিত হয়েছে, সে মুহূর্ত থেকেই নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ মুসলিম দলটি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বলতে গেলে বিলীনই হয়ে গেছে।

ইসলামকে পুনরায় মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিম জাতিকে আগে তার আসল রূপ পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুসলিম জগত শত শত বছর ধরে মানব রচিত রীতিনীতির আবর্জনায় চাপা পড়ে রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার সাথে যেসব ভ্রান্ত আইন-কানুন ও আচার-আচরণের দূরতম সম্পর্কও নেই, সেগুলোর গুরুভারেই আজ মুসলমানরা নিষ্পিষ্ট। তবু তারা নিজেদের এলাকাকে ইসলামী জগত মুসলিম দেশ আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

আমি জানি, নিজেদের সঠিক পুনর্গঠন ও মানবজাতির নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা, এ দু'টো কাজের মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমান জাতির অস্তিত্ব দৃশ্যমান জগত থেকে বিলুপ্ত প্রায়। মানবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব অনেক আগে থেকেই বৈরী আদর্শ, ইসলাম বিরোধী অমুসলিম জাতিগুলোর করায়ত্ত হয়ে আছে।

একথা সত্য যে মুসলমানদের এই দীর্ঘ অনুপুস্থিতিতে ইউরোপীয় প্রতিভা বিজ্ঞান-সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও বস্তুতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করেছে এবং এর ফলে মানুষের সৃষ্টি শক্তি ও বস্তুগত সুবিধার উপকরণ নির্মাণ কৌশল অনেক উপরে উঠে গেছে। এসব চমৎকার আবিষ্কারের উপকরণ ইত্যাদি দোষক্রটির প্রতি ইশারা করা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে ইসলামী জগত যখন এসব সৃজনশীল প্রতিভা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, তখন পাশ্চাত্য দেশীয় যান্ত্রিক উপকরণ আবিষ্কারকদের সমালোচনা করা তার পক্ষে আরও বেশী কঠিন।

কিন্তু এসব বিশাল বাধা-বিপত্তি থাকা সত্তেও আজ ইসলামী বিপ্লব অপরিহার্য। ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্বনেতৃত্বের আসন পুনরুদ্ধারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে এটা সবার জানা। তবু ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্যে সময় নষ্ট না করে এখনি কাজ শুরু করা দরকার।

যদি সঠিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আমরা এ কাজ শুরু করতে চাই, তাহলে মুসলিম উম্মতের ওপর আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে কোন্ কোন্ গুণাবলী আগে ভাগেই অর্জন করা দরকার, তা আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে। সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে গিয়ে যেন হোঁচট খেতে না হয় সে জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী আমাদের অর্জন করা দরকার।

আজকের প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মত মানবজাতির সামনে বস্তুতান্ত্রিক আবিষ্কারের যোগ্যতা অথবা সম্ভাবনাময় প্রতিভা প্রদর্শনে অক্ষম এটা ঠিক। বর্তমান দুনিয়ার মানুষ মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাকে নেতৃত্বের আসন দান করবে, এ অবস্থায় তার এরূপ আশা বাতুলতা মাত্র। এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সৃজনশীল মস্তিষ্ক এতো দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে যে, পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতায় ইউরোপকে পরাজিত করে যান্ত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। তাই আমাদেরকে এখন কিছু ভিন্ন জাতের গুণাবলী অর্জন করতে হবে যা তাদের কাছে পাওয়া যায় না।

তাই বলে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির বিষয়টিকে আমরা মোটেই অবহেলা করবো না। এ পার্থিব সুখ-সুবিধার প্রতিও আমাদের যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ শুধু মানবজাতির নেতৃত্ব প্রদানের জন্যেই যে বৈষয়িক উন্নতি জরুরী তাই নয়, নিজেদের এবং ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেও এটা অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালার খলীফার মর্যাদা দিয়েছে এবং খলীফার দায়িত্ব পালন ও আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করাকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালার খলীফা হিসেবে দুনিয়ার উন্নতি সাধন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মানবজাতির নেতৃত্বদানের জন্য আমাদের তাই আজ বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পেশ করতে হবে, আর এ অতিরিক্ত জিনিসটি হচ্ছে মানব জীবন সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। এ বিধান আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সকল অবদান সংরক্ষণ করবে। এ অতিরিক্ত জিনিসটি মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের আরাম-আয়েশের যে চমৎকার উদ্যোগ আয়োজন করেছে, তার মান বজায় রাখবে।

আধুনিক জীবন যাত্রার উৎসমূলের দিকে লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, গোটা বিশ্বই আজ জাহেলিয়াতের পংকিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সুখ-সুবিধার সকল আধুনিক উপায় উপকরণ ও চমৎকার উদ্ভাবনী প্রতিভার পাশাপাশি নিরেট অজ্ঞতাও এখন সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণই এই জাহেলিয়াতের প্রমাণ। এর ফলে আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্ধারিত সার্বভৌমত্ব মানুষের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক মানুষ সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই– এ জাহেলিয়াত প্রাচীন ও প্রাথমিক যুগের মত আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি অস্বীকার করে না, বরং জীবনের ভাল-মন্দের মান নির্ণয়, সমষ্টিগত জীবনের জন্যে আইন প্রণয়ন, জীবন বিধান রচনা করার অধিকার দাবীর মাধ্যমেই তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আলোচ্য বিষয়গুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা মানেই একজন মানুষের আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে তার সৃষ্টির ওপর যুলুম ও নির্যাতন।

কম্যুনিষ্ট সমাজে মানবতার প্রতি চরম লাঞ্ছনা প্রদর্শন করা হয় এবং পুঁজিবাদী সমাজে অর্থলোভ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দরুন দুর্বল জাতিগুলোর প্রতি নির্মম শোষণ নিষ্পেষণ করা হয়। মূলত আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং মানুষের আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মর্যাদা অস্বীকার করার এ হচ্ছে অনিবার্য পরিণতি।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন বিধান যেখানে সব দিক থেকে মানুষের নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে। কেননা অন্যান্য জীবন বিধানের অধীনে কোনো না কোনো প্রকারে মানুষ মানুষেরই দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানেই মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালারই বিধি-নিষেধ মোতাবেক শুধু তাঁরই বন্দেগী করতে সমর্থ হয়।

এখান থেকেই ইসলামের যাত্রাপথ অন্যান্য জীবন বিধান থেকে পৃথক হয়ে যায়। জীবন সম্পর্কে এ নতুন দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে রচিত ও বাস্তব জীবনের উপযোগী এই জীবন বিধানই আমরা অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে মানব সমাজের সামনে আজ তুলে ধরতে পারি। বর্তমান মানব সমাজ ইসলামের এ মৌলবাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এটা পাশ্চাত্যের আবিষ্কারক প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রতিভাধর ব্যক্তিদের চিন্তাপ্রসূত জীবন দর্শন নয়।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা যে জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, তা সকল দিক থেকেই পূর্ণাংগ। বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের এ বৈশিষ্ট আজও অজ্ঞাত। এর চেয়ে উত্তম বা এর সমকক্ষ কোনো জীবন বিধান পেশ করতে তারা মোটেই সক্ষম নয়।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিশেষ কোনো এলাকায় ইসলাম বাস্তবে রূপায়িত না হলে এ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য কোনোদিনই উপলব্ধি করা যায় না। তাই এ ব্যবস্থার অধীনে একটি সমাজ গড়ে দুনিয়ার সামনে তার নমুনা পেশ করা আজ সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই কোনো একটি মুসলিম দেশে ইসলামী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জরুরী। মূলত ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবনকামী এমন একটি দলই বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করবে।

এই ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব? এর জবাব হচ্ছে, এ জন্যে একটি অগ্রগামী দলকে নিজেদের গন্তব্যস্থল ঠিক করে জাহেলিয়াতের বিশ্বগ্রাসী অকূল সাগর পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথে এ দলের সৈনিকরা সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের ছোঁয়া থেকে নিজেদের যথাসম্ভব হেফাযত করে চলবে।

এ অগ্রগামী দলকে অবশ্যই তাদের যাত্রা শুরু করার সময় এর সঠিক স্থান, পথের দিশা, এর অলিগলি, চলার পথের সকল বিপদ-আপদ এবং দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের উদ্দেশ্য জেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়ার আজ জাহেলিয়াত কোথায় কি পরিমাণ শেকড় বিস্তার করেছে তা ভালো করে জানতে হবে। চলার পথে কখন কার সাথে কি পরিমাণ সহযোগিতা করতে হবে আবার কখন তাদের তা বন্ধ করতে হবে, ভালো করে তা জানতে হবে। কোন্ কোন্ গুণাবলী ও বৈশিষ্টে তাদের সজ্জিত হতে হবে তাও নিশ্চিত হতে হবে। পরিবেষ্টনকারী জাহেলিয়াতের কি কি

বৈশিষ্ট রয়েছে, জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের সাথে কোন্ ভাষায় কোন ভংগীতে আলাপ করতে হবে; কোন্ কোন্ বিষয় এ আলোচ্যসূচীতে স্থানলাভ করবে এবং কিভাবে কোথা থেকে এর জন্যে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এসব বিষয়েই পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ঈমানের শক্তির উৎস হচ্ছে কোরআনের মৌলিক শিক্ষা। যে কোরআনের শিক্ষা ও বাণী থেকে স্বর্ণ যুগে ইসলামের পতাকাবাহীদের মনে আলোর মশাল জ্বলে উঠেছিলো, তাই হবে আমাদের পাথেয়। এ পাথেয়কে সম্বল করেই অতীতে আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মানব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মূলত এ বিপ্লবের অগ্রনায়কদের উদ্দেশ্যেই আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি এবং এতে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থাও পেশ করার চেষ্টা করেছি।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' শীর্ষক আমার লেখা তাফসীর গ্রন্থের চারটি অধ্যায়কে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার উদ্দেশ্যে দু'চার জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে এ গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়েছে।

এই বইর ভূমিকা এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলো আমি বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলাম, পবিত্র কোরআনের উপস্থাপিত জীবন দর্শন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার সময় আমি যে সুগভীর সত্য উপলব্ধি করেছি, তাই আমি এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমার এ চিন্তাগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে এলোপাতাড়ি এবং পরস্পর যোগসূত্রবিহীন মনে হতে পারে, তবে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, আমার এ চিন্তাগুলো আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমার এ লেখাগুলো মূলত এক ধারাবাহিক রচনার কয়েকটা কিস্তি মাত্র। ভবিষ্যতে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে আমি এ বিষয়ে আরও কিছু লেখা প্রস্তুত করবো ।

আল্লাহ তায়ালার রহমতই এ পথে আমার প্রধান সম্বল।

(আলোচ্য প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফীত্ তারীক'-এর ভূমিকা। অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী।
রে এই গ্রন্থের জন্যেই যালেমরা তাকে ফাঁসীর কাষ্টে ঝুলিয়েছিলো)

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের ভূমিকা

কোরআনের ছায়াতলে

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমার জীবনের কতিপয় পবিত্র দিবারাত্রি, যা কোরআনের অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়েছে–

'কোরআনের ছায়াতলে' জীবন অতিবাহিত করা, তার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার এই শেষ কেতাব অনুধাবনের চেষ্টায় লেগে থাকা এমন মহামূল্যবান সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার অনুধাবন শুধু তিনিই করতে পারেন, যিনি তার সময়গুলোকে কোরআন বোঝার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন এবং কোরআনের পথে চলে নিজের জীবনকে পুত ও পবিত্র করে নিতে পেরেছেন।'

আমি আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি আমাকে এই মহান কাজের তওফীক দান করেছেন। আমি এই কোরআন অধ্যয়নে নিজের সময় ব্যয় করে এমন একটি মূল্যবান সম্পদ হাসিল করতে পেরেছি, যার মূল্য ও মর্যাদার কোনো ধারণা ও পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মতো অধম ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালার এ ছিলো এক বিরাট অনুগ্রহ। আমি যখন কোরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি তখন তিনি আমার জন্যে রহমতের সব কয়টি দরজাই খুলে দিয়েছেন এবং আমাকে কোরআনের 'রূহের' এতো নিকটবর্তী করে দিয়েছেন, মনে হয় যেন কোরআন নিজেই বুঝি আমার ওপর তার সত্যসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছে।

কোরআনুল কারীম অধ্যয়নের সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমি মর্ত্যলোক থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছি, আর এই ওপর থেকে আমি নিচের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আর অবলোকন করছি জাহেলিয়াত যেন এক প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার ওপর ছেয়ে আছে। আর এই জাহেলিয়াতে মাতোয়ারা মানুষগুলো যেন নিজ নিজ অন্ধকার আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে আছে এবং এমন এক গভীর খাদের ভেতর চাপা পড়ে আছে যে, তাদের কর্ণকুহরে এই আসমানী ডাক পৌঁছুতে পারছে না। সমগ্র মানবতা যেন পাগলের ন্যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে জাহেলিয়াতে ডুবে আছে এবং জাহেলিয়াতের কর্মতৎপরতায় তারা সবাই আনন্দে আত্মহারা, যেমন এক শিশু তার খেলনাসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এই দৃশ্য থেকে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, কোরআনের উপস্থাপিত পূর্ণাংগ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন জীবনাদর্শকে দেখেও মানবতা কেন জাহেলিয়াতের এই দুর্গন্ধময় স্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে? এই অধপতনের দিকে তারা কেন নিমজ্জিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের আবেষ্টনীতে তারা কেন ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে কোরআন তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে, জীবনের উচ্চতর স্থানের দিকে বারবার ডাক দিচ্ছে, চীৎকার দিয়ে তাদের ডাকছে, 'এসো, হে মানুষরা। আমি তোমাদের অন্ধকারের অতল থেকে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসি।'

কোরআন অধ্যয়নকালে আমি একথা অনুধাবন করেছি যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন কাঠামো ও জীবন বিধান নির্ধারণ করেছেন তার সাথে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট-এই কায়েনাতের একটা গভীর মিল রয়েছে এবং এর সর্বত্র একটা সামঞ্জস্য বিরাজ করছে।

অতপর এটা আমি অনুধাবন করেছি যে, মানবতার বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে সামঞ্জশীল এই প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা, অপর কথায় এই নীতিমালার সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো। মূলত শয়তান মানব জাতিকে এমন এক জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে যেখানে 'আফসোস' ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার জন্যে বাকী থাকেনি। কোরআন অধ্যয়নের সময় আমি এ কথাটা খুব ভাল করে জেনে নিয়েছি যে, এই বিশ্বজগতের ব্যাপকতা অসীম এবং অদৃশ্যমান বিশ্ব এই দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক।

মানবীয় জীবন এই বৈষয়িক দুনিয়ার রাস্তা ধরে আখেরাতের অসীম ব্যাপকতার দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যু কোনো শুরুর শেষ নয়-বরং তা হচ্ছে এক অন্তিম যাত্রার সূচনা মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতের দীর্ঘ দূরত্বের ওপর বিস্তৃত হয়ে আছে মানুষের এই জীবন। এই জীবনে মানুষ যা কিছুই অর্জন করুক না কেন, শুধু সেটুকুই নয়-আরো অনেক কিছুই তার জন্যে রয়েছে। কোনো মানুষ এই দুনিয়ায় স্বীয় কর্মকান্ডের দন্ড থেকে বাঁচতে পারলেও ওখানে তার মুক্তি নেই। কারণ সেখানে কোনো যুলুম নেই, কিছুর অভাব নেই, কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। এই দুনিয়ায় একজন মোমেনের জীবন বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর সাথেই সামঞ্জস্যশীল। মোমেন ব্যক্তি নিজেও আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবিষ্ট এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিও আল্লাহ তায়ালার হুকুমের দিকে নিবিষ্ট, তাঁর হুকুমের সামনে সেজদারত।

'আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যতো কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়-সবকিছুই তাঁর সামনে মাথানত করছে এবং তাঁরই আশ্রয়তলে সবাই সকাল সন্ধ্যা অবনত মস্তকে নিমগ্ন আছে।' (সূরা আর রা'দ-১৫)

'এই সাত আসমান ও যমীনে এবং তার মধ্যে যতো সৃষ্ট জীব রয়েছে সবাই তাঁর গুণ গায়। এই সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে এমন একটি বস্তুও নেই, যা প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ আদায় করছে না।' (সূরা বনি ইসরাঈল-৪৪)

আমি কোরআন অধ্যয়নকালে একথা অনুধাবন করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন এক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, যার সাথে তারা ইতিপূর্বে কখনো পরিচিত হতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাতে 'রূহ' দান করে জীবন দিয়েছেন।

'যখন আমি তাকে (মানব আকৃতিতে) ঠিক করে নেবো এবং তাতে আমার 'রূহ' দান করবো তখন তোমরা তার সামনে সেজদাবনত হয়ে পড়বে।' (সূরা আল হেজর-২৯)

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন।

'যখন তোমার মালিক বললেন, আমি যমীনের বুকে আমার একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি এবং যা কিছুই এই বিশ্বজগতে রয়েছে তার সবটুকুকেই আমি তোমার অধীনস্থ করে রেখেছি।' (সূরা আল বাকারা-৩০)

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানব জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং নিজস্ব রূহ দিয়ে তার মধ্যে জীবন দান করেছেন তাই এই আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাসই মানব জাতিকে একত্রিত করে রাখার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে মোমেনের দেশ, মোমেনের জাতি ও মোমেনের খান্দান। এই কারণেই এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মোমেন যে কোনো সময়ই একই প্লাটফরমে একত্রিত হতে পারে। মানুষ কোনো জন্তু-জানোয়ারের দল নয় যে, তাদের এক স্থানে একত্রিত করার জন্যে ঘাস কিংবা চারণভূমির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ, জাতি ও তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের স্থান তো সত্যিকার অর্থে মানবতার আসন থেকে অনেক অনেক নিচে।

ইতিহাসের প্রতি স্তরে মোমেনদের খান্দান ছিলো একটাই। সর্বাবস্থায় সে ঈমানী কাফেলায় শামিল থাকবে। যে কাফেলার সর্দার ছিলেন- নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ), মূসা (আ.), ঈসা (আ.), ও মোহাম্মদ (স.)।

'এই যে তোমাদের দল, মূলত তা একই দল এবং আমিই তোমাদের মালিক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।' (সূরা আল মোমেনুন- ৫৩)

যখন থেকে মানুষ এই যমীনে পা রেখেছে তখন থেকেই-ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে, যুগের প্রতিটি বিবর্তনে ঈমানদারদের একটা কাফেলা এখানে সতত মওজুদ ছিলো, আর ঈমানদারের এই কাফেলাকে ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অধ্যায়ে একই ধরনের অবস্থা, একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাদের সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে। গোমরাহীর বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই আল্লাহদ্রোহিতাকে উচ্ছেদ কাজে তৎপর ছিলেন। তারা সর্বদাই অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। এই কাফেলা কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে হামেশা এগিয়ে গেছে, সব সময়ই তারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কুফর ও ইসলামের প্রতিটি রণক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

'এবং যারা কাফের, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী ছিলো, তারা তাদের নবীদের বললো, আমরা হয় তোমাদের এই জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের দলে শামিল হতে হবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন যে, আমি যালেমদের ধ্বংস করে দেবো এবং অতপর এই যমীনের ওপর তোমাদের আমি 'আবাদ' করাবো। একথা তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কেয়ামতের দিন আমার সামনে দাঁড়ানোকে এবং আমার আযাবকে ভয় করে।' (সূরা ইবরাহীম- ১৩, ১৪)

কোরআন অধ্যয়নের বিভিন্ন স্তরে আমার অন্তরে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি কোনো ঘটনাচক্র নয় এবং এমনি এমনি তা সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহ তায়ালা একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই তা তৈরী করেছেন।

'আমি প্রতিটি জিনিসকে সঠিক পরিমাপের ভিত্তিতে বানিয়েছি।' (সূরা আল ক্বামার- ৪৯)

'এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসকে তৈরী করেছেন এবং অতপর তার একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।' (সূরা আল ফোরকান- ২)

কিন্তু এসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার হেকমতসমূহ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়নি।

'এতে ব্যথিত হবার কিছু নেই যে, তোমরা কোনো জিনিসকে হয়তো পছন্দ করছো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন নেসা- ১৯)

'এতেও আশ্চর্যন্বিত হবার কিছু নেই যে, কোনো বিষয় তোমাদের ভালো লাগে না, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাতে তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রেখেছেন, আবার অন্য একটি জিনিস যা তোমাদের ভালো লাগে অথচ তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন এবং তোমরা কিছুই জানো না। (সূরা আল বাকারা- ২১৬)

উপায়-উপকরণের ওপর কখনো ফলাফল নির্ভর করে, আবার কখনো করেও না। উপকরণ কখনো কার্যকর হয়, আবার কখনো তা ব্যর্থও হয়ে যায়, আর উপায়-উপকরণ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে।

'তোমার তো জানা নেই, হয়তো আল্লাহ তায়ালা অতপর এর কোনো রাস্তা বের করে দেবেন।' (সূরা আত্ তালাক-১০)

'তোমরা কিছুই আশা করতে পারো না-হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালার যা মঞ্জুর আছে তা ছাড়া।' (সূরা আত্ তাকওয়ীর ২৯)

মোমেন ব্যক্তি উপায়-উপকরণ এ জন্যেই ব্যবহার করে যে তাকে তা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে, এসব কিছুর কাংখিত ফলাফল আল্লাহ তায়ালার হাতেই। মোমেন তাঁর সমস্ত মনোনিবেশ আল্লাহ তায়ালার প্রতিই নিবদ্ধ রাখে। তাঁর হেকমত, জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতি সে সদা সজাগ থাকে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ওপর তার প্রগাঢ় আস্থা থাকে। এ কারণেই মোমেন ব্যক্তি সব রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে পারে।

'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীল কাজ করতে বলে, (অপর দিকে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন, আল্লাহ তায়ালা বিশাল ব্যাপক ও অনেক প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল বাকারা-২৬৮)

কোরআনের ছায়াতলে আমি গভীর প্রশান্তিময়, নিশ্চিত ও পবিত্র জীবন কাটিয়েছি। আমি প্রতিটি দিগন্তে আল্লাহ তায়ালার লীলা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমি তার বহু ধরনের গুণাবলীর বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি।

'যখন সে তাঁর কাছে দোয়ার হাত ওঠায় তখন, এমন কে আছেন যিনি অস্থির হৃদয়ের আকুতি শ্রবণ করেন, আবার কে এমন আছেন যিনি তাঁর কষ্টসমূহ দূরীভূত করেন।' (সূরা আন নামল ৬২)

'তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর বিপুল ক্ষমতাবান।' (সূরা আল আনয়াম -৬১)

'তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক অবগত।' (সূরা আল আনয়াম-৭৪)

'আল্লাহ তায়ালা নিজ কার্যকলাপের ওপর অসীম ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসূফ-২১)

'জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার মনের মাঝে প্রাচীর হয়ে থাকেন।' (সূরা আল আনফাল-২৪)

'যা তিনি চান তাই তিনি করেন।' (সূরা আল বুরুজ-১৬)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কোনো না কোনো 'পথ' বের করে আনেন এবং তাকে এমন সব স্থান থেকে রেযেক সরবরাহ করেন, যার কোনো ধারণাও সে করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করবে, তিনি নিজেই তার জন্যে যথেষ্ট হবেন এবং তিনি যা করতে চান তা সহজেই সম্পন্ন করে দেন। (সূরা আত্ তালাক ৩)

'এই ভূখন্ডে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীকেই তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ধরে রেখেছেন।' (সূরা হুদ-৫৬)

'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট নন? এবং তাঁকে ছাড়া তারা তোমাদের অন্য লোকদের দিয়ে ভয় দেখায়।' (সূরা আঝ ঝুমার-৩৬)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে অপদস্থ করেন তাকে সম্মান দান করার কেউ নেই।' (সূরা আল হজ্জ্ব-১৮)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।'(সূরা আঝ ঝুমার ২৩)

আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়া জোড়া সবকিছু বানিয়ে একে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখেননি বরং এখানে সর্বদাই প্রতিটি ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার পেছনে আল্লাহ তায়ালার নিজ ইচ্ছা ও এরাদাই কার্যকর থাকে।

মানুষের চলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জীবন বিধান রচনা করেছেন, তা মানবীয় উৎকর্ষের প্রতিটি ধাপে এবং উন্নতির প্রতিটি যুগে সমভাবে উপকারী, মুক্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিশ্চয়তা বিধানকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই জীবন বিধান এমন সব মানুষদের জন্যে যারা এই দুনিয়ায় বসবাস করে, এ কারণেই তাতে তার প্রকৃতি, যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ইসলাম এই ভূখন্ডে মানুষকে এবং তার ক্রিয়াকান্ডকে কখনো হীন করে দেখে না। ব্যক্তিগত, সামষ্টিক কিংবা কোনোক্ষেত্রেই তার গুরুত্বকে খাটো করে তাকে জন্তু-জানোয়ারের স্তরে নামিয়ে দেয় না। আবার তার ওপর তার যোগ্যতা, প্রতিভা ও ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বও চাপিয়ে দেয় না। ইসলামের মতে মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এতো ঠুনকো নয় যে, মনগড়া কতিপয় দর্শন তৈরী করে তাকে পালটে ফেলা যাবে। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীমে' কদম রাখে তখন মূলত সে তার প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার বিধি-নিষেধের ওপর চলতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ তায়ালার পথে সে অগ্রসর হতে থাকে।

তবে ইসলামের এই পথ দীর্ঘ সহজ ও সরল। আল্লাহ তায়ালা এটা চান না যে, মানবীয় প্রকৃতিকে পদদলিত করে তার ওপর আধ্যাত্মিক কর্মের বোঝা চাপিয়ে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধ হোক। মানুষের তৈরী নতুন মতবাদগুলো মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আদর্শের বাস্তবায়ন দেখে নিতে চায়। এতে যদি দুনিয়ায় রক্তের নদী বয়ে যায়, মানুষের সামাজিক জীবন কাঠামো তছনছ হয়ে যায়, কিংবা তার অতীত ইতিহাসের অর্জিত পাওনাগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না।

ইসলাম তো মানুষের প্রকৃতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে মিলে মিশে উন্নতির পথে কদম রাখতে চায়। দরকার মতো তাকে পথ প্রদর্শন করে অগ্রসর হতে চায়। এই প্রকৃতি যখন কল্যাণের দিকে পা বাড়ায় তখন ইসলাম তাকে আশ্রয় দেয়। আবার যখন অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয় তখন এই প্রবণতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম প্রকৃতিকে পদদলিত করে অগ্রসর হতে চায় না বরং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের সাথে প্রয়োজনে তাকে চলার পথ দেখায় এবং তাকে সাথে নিয়েই চলতে চায়। এই উন্নতির শীর্ষে পৌঁছানোর জন্যে এক যুগ, দু'যুগ সময়ও লাগতে পারে, আবার এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্যে বহু শতাব্দীরও প্রয়োজন হতে পারে।

ইসলামের উদাহরণ হচ্ছে একটি ছোট চারা গাছের মতো। একটি ছোট বীজ থেকে যার উদ্ভব, আস্তে আস্তে তা বড়ো হয় আবহাওয়ার বিবর্তনে ঝড়ঝঞ্ঝা ও দমকা হাওয়ার মোকাবেলা করে এক দীর্ঘ সময় পরে তা শক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। এই গাছ যিনি লাগিয়েছেন তিনি অধিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি ভালো করেই জানেন একদিন না একদিন এই চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে তাকে তার আহার পরিবেশন করা হবে এবং আস্তে আস্তে তা বড়ো হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ঝড় তুফানে তা দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর মানুষকে তৈরী করেছেন তাকে পদদলিত করে জোর করে চাপিয়ে দেয়া একটা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলে তার ফলাফল হয়তো তাড়াতাড়িই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু করার আল্লাহ তায়ালার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিয়মনীতিতে কখনো কোনো রদবদল দেখতে পাবে না।' (সূরা আল আহযাব-৬২)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান ও বিশ্বচরাচরের জন্যে যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছেন তার মূল ও একমাত্র বুনিয়াদ হচ্ছে 'হক'। কেননা প্রতিটি জিনিসই আপন অস্তিত্বের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ঋণী এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন 'হক'।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সত্য ও সঠিক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে তারা মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালা মহান, মর্যাদাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।' (সূরা লোকমান-৩০)

'আল্লাহ তায়ালা একে 'হক' ছাড়া আর কিছু দিয়েই তৈরী করেননি।'

'হে পরোয়ারদেগার, তুমি এই সৃষ্টিকূলকে নিরর্থক তৈরী করোনি, তুমি পবিত্র।' (সূরা আলে ইমরান-১৯১)

মোটকথা, এই বিশ্বজগতের মূল কথা হচ্ছে এই 'হক'। যখনি সৃষ্টি এই মৌলিক 'হক' থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তখনই তার মেরুদন্ড ভেংগে পড়বে।

যদি 'হক' তাদের ইচ্ছাসমূহের আনুগত্য করে তাহলে আসমানসমূহ ও যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই কারণেই 'হক'কে ফলে ফুলে সুশোভিত হতে হবে এবং বাতিলকে মিটিয়ে যেতে হবে।

'আমি বরং সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি সত্য তখন মিথ্যার মাথা কেটে ফেলে এবং মিথ্যা মিটে যায়।' (সূরা আল আম্বিয়া-১৮)

'তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেছেন, তারপর তা থেকে নদী-নালাসমূহ নিজেদের পাত্র মোতাবেক পানি গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এরপর এই নদী-নালায় প্লাবন এলো, ফলে পানির উপরিভাগে কিছু ফেনাও সৃষ্টি হলো। অলংকারাদি বানাবার কালে মূল ধাতু আগুনে গলাবার সময়ও একই ধরনের ফেনা তাতে জেগে ওঠে। এই উপমা পেশ করে আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে তোলেন।' (সূরা আর রাদ-১৭)

(নদীনালা ও গলিত ধাতুর বেলায় যা সত্য) তেমনি যা ফেনা হয়ে উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তাই শুধু যমীনে অবশিষ্ট থেকে যায়।

'তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামসমূহের কি ধরনের উপমা পেশ করেছেন। তা যেন একটি মূল্যবান ও পবিত্র বৃক্ষ, যার ভিত্তি অত্যন্ত মযবুত ও শাখা প্রশাখা আসমানসমূহে বিস্তৃত। নিজ মালিকের আদেশে তা সর্বদাই ফলমূল সরবরাহ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে উদাহরণ পেশ করেন। যেন তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অপবিত্র কথাসমূহের উদাহরণ হচ্ছে একটি বৃক্ষের মতো যাকে যমীনের উপরিভাগ থেকে উপড়ে ফেলা হয়। যমীনের ওপর তার কোনোই স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সঠিক ও পরিশুদ্ধ কথাসমূহের দ্বারা দুনিয়ার জীবনেও তাদের দৃঢ়ভাবে রাখেন এবং আখেরাতের জীবনেও তাদের তিনি সেভাবেই রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা না ইনসাফ লোকদের পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন। (সূরা ইবরাহীম ৩৪-৩৭)

মোটকথা, ইসলামী জীবনাদর্শ মানুষকে যেমনি প্রশান্তি, স্থিরতা ও সত্যনিষ্ঠ আস্থা প্রদান করে তা অন্য কোনো জীবনাদর্শের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমি কোরআন অধ্যয়ন কালে এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছি এবং এ বিষয়ের ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দুনিয়ার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, মানবতা কোনোরকম শান্তি পেতেই পারে না, তার ভাগ্যে কোনোরকম মানসিক শান্তিই জুটতে পারে না, কোনো ব্যক্তিই উচ্চতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পেতে পারে না, সর্বোপরি মানব জাতি কখনো বিশ্বচরাচরের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও আসমানী নীতিমালা ও বিধি-নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না-যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষ আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত না হবে। আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থাকে মানুষ সর্বাংশে গ্রহণ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাব ও তাঁর রসূল (স.)-এর সুন্নতের কাছ থেকে পথের দিশা নেবে, এই পন্থা ছাড়া আর সবকিছুই এক একটা ভাংগন-বিপর্যয়, অপবিত্রতা তথা জাহেলিয়াত।

'অতপর যদি এরা তোমার কথা না মেনে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, এরা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্বই করে বেড়ায়। তার চেয়ে গোমরাহ্ ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মনোবৃত্তির আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যালেম লোকদের পথ দেখান না।' (সূরা আল কাসাস-৫০)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাবকে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী বানানো এমন কোনো কথা নয় যে, মন চাইলো তা মানলাম আবার মনে চাইলো-না বলে তা উপেক্ষা করলাম বরং এর ওপরই ঈমানের সমগ্র ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত।

'কোনো মোমেন পুরুষ কিংবা নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন, তা গ্রহণ না করে তাতে নিজেদের কোনোরকম অধিকার খাটাবে।' (সূরা আল আহযাব-৩৬)

'অতপর আমি তোমাদের দ্বীনের সঠিক পথে বসিয়ে দিয়েছি, তোমরা এই পথই অনুসরণ করো। অজ্ঞ ও জাহেল ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর চলো না। এরা সেদিন আল্লাহ তায়ালার সামনে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। যালেমরা একে অন্যের বন্ধুই হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই শুধু পরহেযগারদের একমাত্র বন্ধু।' (সূরা আল জাসিয়া-১৮-১৯)

এ ব্যাপারটা খুব সামান্য ও সহজ কিছু নয়, গোটা মানবজাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী জীবন পদ্ধতির মাঝেই মানুষের সব ধরনের দুঃখ মুসীবত ও জ্বালা– যন্ত্রণার সমাধান পেশ করেন।

'আমি কোরআনের মাধ্যমে সেসব কিছু নাযিল করি যা মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৩)

'এই কোরআন সে রাস্তাই দেখায় যা সবচেয়ে সহজ।' (সূরা বনি ইসরাইল-৯০)

আজ মানব জাতির দুর্ভাগ্য ও বদনসীবীর মূল কারণ হচ্ছে, তারা আজ তাদের জীবনের সব কার্যকলাপ বিশ্ব স্রষ্টার দিকে ধাবিত হয় না। যতোদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট না হবে ততোদিন পর্যন্ত তারা এভাবেই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে এবং এভাবেই তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হতে থাকবে। ইসলামকে উপেক্ষা করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা, মানব জাতির ইতিহাসের এমন ভয়াবহতম দুর্ঘটনা, যা গোটা মানব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

ইসলাম এমন এক সময় এসেছে যখন সমগ্র মানবজাতি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছিলো। গোটা জনপদ দুর্নীতি ও কদাচারে ভরে উঠেছিলো, পাপে সমগ্র দুনিয়া ছেয়ে গিয়েছিলো। এমন সময় ইসলাম এসে মানুষদের এক নতুন জীবন দান করলো। সর্বোপরি মানুষকে পেশ করলো আল্লাহর আখেরী কেতাব আল কোরআন–যা মানুষকে তার জীবন ও চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক মূল্যবোধের শিক্ষা দিলো।

জীবন ধারণের এই নতুন পদ্ধতিকে সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে সে দেখিয়ে দিলো। যখন এই নতুন ব্যবস্থা তার সঠিকরূপ নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাতে এমন ধরনের পবিত্রতা, এমন ধরনে সহজ সরলতা, এমন ধরনের জ্ঞানের ব্যাপকতা, এমন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সাম স্যতার বিকাশ ঘটলো, যা সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেখানো তো দূরের কথা–মানুষের জ্ঞান প্রতিভা এমন কিছুর কল্পনাও করতে পারেনি।

অতপর মানুষের দুর্ভাগ্য তাকে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো। জাহেলিয়াত বারবার তার লেবাস বদল করে মানুষের ওপর সওয়ার হয়ে পড়লো। তাই ধোঁকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত এই নব্য জাহেলিয়াতের লোকেরা বললো, 'বৈষয়িক উন্নতি ও ইসলাম' এর যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। কারণ, এদের উভয়ের রাস্তা নাকি আলাদা ও পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা এতো বড়ো ধোঁকা যে, তার তুলনা সম্ভবত মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাস্তব কথা হচ্ছে, ইসলাম বৈষয়িক আবিস্কার ও উদ্ভাবনার শত্রু নয়, বরং ইসলাম

মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং তাকে পূর্ণাংগ পথ প্রদর্শন করেছে। ইসলাম তো মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছে। এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত গুপ্ত শক্তিসমূহকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করে এদের তাঁর অনুগত বানিয়ে দিয়েছে। অবশ্য একটাই শর্ত তাতে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীম' অনুযায়ী কাটাতে হবে, আর তার জীবনের সমগ্র কর্মসূচী আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত হেদায়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যদি এমন হয় তাহলে মানুষের প্রতিটি কাজই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর এবাদাতের শামিল।

সমাজে এমন কিছু সরল প্রকৃতির লোক আছে যাদের নিয়তে কোনো খুঁত না থাকলেও তাদের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব থাকে। এরা মনে করেন মানুষের ঈমানী মূল্যবোধ আলাদা বস্তু এবং তাদের বৈষয়িক উন্নতি উৎকর্ষ ও প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি আলাদা বস্তু। 'প্রাকৃতিক নিয়মনীতি আমাদের ওপর সব সময়ই তার প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রভাব সৃষ্টিতে ঈমান থাকা না থাকায় তেমন কোনো তারতম্য সৃষ্টি হয় না'–এমন মনে করা মোটেই ঠিক নয়। এরা আল্লাহর বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের দু'টি বিভাগকে আলাদা আলাদা ভেবে নিয়েছে। মূলত ব্যাপারটা তা নয়, প্রাকৃতিক বিধি-বিধান যেমনি আল্লাহর আইনমালার অংশ তেমনি ঈমানী মূল্যবোধও তাঁর কানুনের একটি অংশ। এই উভয়বিধ আইনের ফলাফল পরস্পর সম্পৃক্ত ও একক। এটাই হচ্ছে সঠিক ধারণা। আল্লাহ তায়ালা একথাই কোরআনে পেশ করেছেন,

'যদি আহলে কেতাবের লোকেরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগার হতো, তাহলে আমি তাদের গুনাহ-খাতা মিটিয়ে দিতাম এবং তাদের জান্নাতের সুন্দরতম বাগানসমূহে প্রবেশ করিয়ে দিতাম। যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের ওপর নাযিল করা অন্যান্য কেতাবের ওপর তারা ঈমান আনতো তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর করুণা এভাবে বর্ষিত হতো যেন তারা ওপর থেকেও খেতে পারতো আবার নিচ থেকেও ভোগ করতে পারতো।' (সূরা আল মায়েদা- ৬৫-৬৬)

'আমি অতপর তাদের বললাম, আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তিনি মহান ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর থেকে পানি বর্ষণ করবেন এবং সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের তিনি বিভিন্ন ধরনের বাগান দান করবেন, সেখানে আবার তোমাদের জন্যে ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করবেন।' (সূরা নূহ)

'আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির ওপর অর্পিত নেয়ামতকে কখনো বদলে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।' (সূরা আর রা'দ –১১)

আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর এবাদাত ও তাঁর যমীনে তাঁরই আইনের প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর নীতিমালার চূড়ান্ত পূর্ণতার নাম। এরই এক অংশের নাম ইচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি। এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যে, মানুষ ঈমানী মূল্যবোধের কোনো পারোয়া না করে শুধু প্রাকৃতিক আইনেরই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তাতে সফলকামও হয়ে যায়। ঈমানী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করার বাহ্যিক পরিণাম তেমন একটা দেখা যায় না। যদিও শুরুর দিকে এই পরিণামের বহিপ্রকাশ অনুভূত হয় না কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগে কিংবা কোনো পর্যায়ে এসে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা যাবেই।

ইসলামী সমাজ তখনি উন্নতির শিখরে উপনীত হতে পেরেছে যখন মুসলমানরা একই সময় ইসলামী মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলীতে নিজেদের সাজাতে পেরেছে, যতোই এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব বিস্তৃত হতে থাকলো ততোই তাদের অধপতন বাড়তে লাগলো, আর যখন তারা এই উভয়টাকেই ভুলে গেলো তখন তারা অধপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে গেলো।

ইসলামী সমাজের পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতার কথা চিন্তা করা যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে, এমন একটি পাখীর ন্যায় যার একটি পাখা কেটে দেয়া হয়েছে। একটি পাখার ওপর ভিত্তি করেই সে এখন শূন্যে ঝুলে আছে, ঠিক এভাবেই আজ আধুনিক সভ্যতা যে পরিমাণ বৈষয়িক উন্নতি অর্জন করতে পারলো সেই পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হলো। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত না হবে ততেক্ষণ পর্যন্ত তারা এই ধ্বংস থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাবে না।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে আইন নির্ধারণ করেছেন তা সেই সামগ্রিক আইনেরই অংশ বিশেষ যা তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য বানিয়েছেন। এই শরীয়তের অনুসরণই মানব প্রকৃতিকে গোটা বিশ্বের নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে দেয়, আর এই শরীয়ত তথা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমানের উপস্থিতি এবং একটি ইসলামী সমাজের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। এর সাথে সাথে 'শরীয়াতে এলাহীর' পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যে জরুরী হলো তাকওয়া, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার সাথে কাজ চালিয়ে রাখা। এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী ও ইসলামী মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে। এই দু'টো বিষয়ই আল্লাহর অমোঘ বিধানের অধীন, যার ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়ার নিয়ম নীতি চলছে।

মানুষ যেহেতু নিজেও বিশ্বজগতের এক অংশ তাই তার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, তার কাজ ও ইচ্ছা, তার নেকী ও ঈমান, তার এবাদাত এবং নিষ্ঠা এর সব কিছুই এই বিশ্ব চরাচরের একটা 'হ্যাঁ' বোধক জবাব মাত্র। এর সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপক ও সাধারণ নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার জন্ম হয়। এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েই সে ফলাফল সৃষ্টি করে, আর মানুষের জীবন যখন এই নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তা থেকে দূরে সরে পড়ে তখনি তাতে বিশৃঙ্খলা ও পেরেশানি দেখা দিতে শুরু করে। জীবনের কাঠামো ভেংগে পড়ে এবং দুর্ভাগ্য ও বদনসীবির ছায়া তাদের ওপর আস্তে আস্তে বড়ো ও বিস্তৃত হতে থাকে।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে যখন এই নেয়ামত দান করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষরা নিজেদের মনের অবস্থা পরিবর্তন না করে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিবর্তন করেন না।' (সূরা আল আনফাল-৫৩)

মোটকথা, মানুষের বোধশক্তি ও তার কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর নিয়ম নীতির অধীনে পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের এক গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সম্পর্ককে সে ব্যক্তিই বিনষ্ট করতে পারে, সে-ই এই সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, সে-ই এই নিয়মনীতি ও মানুষের মাঝে ক্ষতির কারণ হতে পারে-যে ব্যক্তি মানবতার দুশমন, যে ব্যক্তি হেদায়াতকে উপেক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাচ্ছে। সর্বোপরি এইভাবে ঘুরে বেড়ানোই মূলত যার ভাগ্যের লিখন হয়ে গেছে। আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া পর্যন্ত সে এভাবেই ঠোকর খেতে থাকবে।

আমি যখন আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো 'কোরআনের ছায়াতলে' অতিবাহিত করছিলাম তখন এই কয়টি চিন্তা ও ভাবনা আমার মনে বারবার দানা বেঁধে উঠেছে। এই কথাগুলোকেই আমি 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর ভূমিকাস্বরূপ এখানে পেশ করলাম। হতে পারে এই কথাগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কারো জন্যে হেদায়াতের উৎস বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না।'

সূরা আল ফাতেহা

আয়াত ৭ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

রুকু ১

১. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক, ৩. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান, ৪. তিনি বিচার দিনের মালিক। ৫. (হে মালিক,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। ৬. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও, ৭. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের (পথ) নয়, যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তাফসীর

সাত আয়াত বিশিষ্ট এই ছোট সূরাটিকে প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে তেলাওয়াত করেন। যদি এর সাথে কিছু সুন্নত ও নফল পড়া হয় তাহলে এই সংখ্যা অবশ্য আরো বেশী হবে। এই সূরা তেলাওয়াত করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। কেননা সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উবাদা বিন সামেতের বর্ণনা রয়েছে, 'সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত ছাড়া নামায শুদ্ধ নয়।'

এই সূরায় ইসলামী আকিদা ও ধ্যান ধারণার মৌলিক অংশগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামী আকিদার মাধ্যমে লালিত চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রাস্তাসমূহকে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই সূরার তেলাওয়াত প্রতিটি রাকায়াতেই জরুরী এবং এই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এই সূরার তেলাওয়াত ছাড়া নামায কেন শুদ্ধ হয় না।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলছেন এটি সূরা ফাতেহার অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলছেন সামগ্রিকভাবে এটি কোরআন শরীফের এমনি একটি আয়াত,

প্রতিটি সূরাই এ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এটি সূরা ফাতেহারই অন্তর্ভুক্ত। একে নিয়েই সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা ৭-এ দাঁড়ায়, কেননা কোরআনে পাকের এরশাদ,

'আমি অবশ্যই তোমাকে বার বার পঠিত (আয়াত) থেকে সাত (আয়াত) বিশিষ্ট একটি সূরা ও মহান গ্রন্থ কোরআন দান করেছি'। এ দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সূরা ফাতেহাকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নামে সব কাজ শুরু করা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিষ্টাচারের এমন একটি মৌলিক ভিত, যার শিক্ষা নবী করিম (সা.) তাঁর প্রথম ওহীতে (ইকরা বিসমে রাব্বেকা) প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর নামে শুরু করার বিষয়টি ইসলামের সেই মহান চিন্তা বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহই প্রথম, আল্লাহই শেষ। তিনিই যাহের তিনিই বাতেন। তাঁর নামেই সব কাজে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর নাম দিয়েই সব কাজ শুরু করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে হবে তার নামেই। প্রতিটি নড়াচড়াতে তাঁর নামই হবে মোমেনের একান্ত সাথী।'

'আর রাহমান' এবং 'আর রাহীম' এই দু'টি শব্দই এমন দু'টি ব্যাপক বিশেষণের নাম যা রহমতের সবক'টি অর্থের ওপর প্রযোজ্য এবং এর সব ক'টি অবস্থাই এতে শামিল হয়ে আছে। অবশ্য এই দুটি বিশেষণে এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, 'রাহমান' শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট। অপর দিকে 'রাহীম' কোনো মানুষের ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়। আল্লাহর নামে শুরু করা যেমনি ইসলামী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিমূল তেমনি রাহমান ও রাহীমের মাঝে রহমতের সব ক'টি অর্থ ও এর সবক'টি অবস্থাকে শামিল করে নেয়াও ইসলামী ঐক্যের একটি মৌলিক নীতি। এ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাহর মধ্যকার এই সম্পর্কটি নির্ণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায়ই দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং বান্দাহ প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর দয়ার ভিখারী। আল্লাহ তায়ালাই যখন 'রহমান রাহীম' তখন মানুষের জন্যে এটা জরুরী যে, সদা সে তাঁর প্রশংসায় মগ্ন থাকবে এবং এ সত্যের সে প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে,

'আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন'।

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বচরাচরের মালিক এবং তিনিই এই বিশ্ব নিখিলের প্রতিপালক।

আল্লাহর প্রশংসা এমনি এক জীবনদায়ীনী অনুভূতি, যার শুধু স্মরণটুকুই মোমেনের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকে। কেননা স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বটুকু তাঁর অনুগ্রহেরই একটি দান মাত্র। এরপর প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ঝরতে থাকে তা জমা হতে থাকে এবং তা সমগ্র সৃষ্টিকুল বিশেষ করে মানুষকে ছেয়ে ফেলে। এ কারণেই ইসলামী শিক্ষার একে একটি মূলনীতি হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সবকিছুর শুরুর প্রশংসা তাঁর সবকিছুর শেষ প্রশংসাও তাঁর।

'তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা, সব কিছুর আগে এবং সব কিছুর পরেও।'

আল্লাহ তায়ালার এইসব বহুবিধ নেয়ামতর সত্তেও যখন কোনো বান্দা বলে 'আল হামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য) তখন তার নামে এমন একটি নেকী লিখে দেয়া হয়, যা হয় অন্যান্য নেকীর তুলনায় অনেক বেশী ওযনের। সুনানে ইবনে মাজায় হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনা, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, এক বান্দা বললো, 'হে রব! সকল প্রশংসা

তোমার, যতোটুকু প্রশংসা তোমার রাজাধিরাজ সত্তার জন্যে শোভা পায় তার সবটুকুই। এ কথা কয়টি শুনে ফেরেশতারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো, কিভাবে একে লিপিবদ্ধ করা যায়? অবশেষে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করলো, তোমার এক বান্দাহ এমনভাবে তোমার তারিফ করলো আমরা বুঝতে পাচ্ছি না কিভাবে একে লিপিবদ্ধ করবো। আল্লাহ তায়ালা এর ব্যাখ্যা চাইলেন, (অথচ তিনি ভালো করেই জানেন বান্দাহ কি বলেছে) আমার বান্দাহ কী বলেছে? ফেরেশতারা বললো, তোমার বান্দাহ বলেছে, 'হে রব সকল প্রশংসা তোমার, যতোটুকু প্রশংসা তোমার রাজাধিরাজ সত্তার পক্ষে উপযোগী।' আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'আমার বান্দাহ যেভাবে বলেছে সেভাবেই লিখে দাও। যেদিন আমার সাথে তার দেখা হবে, সেদিন আমি নিজেই তাকে এর প্রতিদান দেবো।'

'রাব্বুল আলামীন' শব্দ ক'টি ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করছে এবং এটা বলছে যে, প্রতিপালনের যাবতীয় স্বীকৃতি ও ঘোষণা একক ও সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং এটার স্বীকৃতি ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরবী ভাষায় 'রব' বলতে এমন এক ক্ষমতাসম্পন্ন মালিককে বুঝায় যিনি তাঁর অধীনস্থ প্রতিটি জিনিসকে নিজেই লালন পালন করেন এর যাবতীয় দেখাশোনা ও তদারকী করা থেকে তার সংশোধন, পরিমার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের সব ধরণের ব্যবস্থা পাকাপাকি বন্দোবস্ত তিনিই করেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিকুলের এবং বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুর স্বয়ং স্রষ্টা ও মালিক, তিনি যেহেতু একাই সমগ্র জাহানকে সৃষ্টি করেন, লালন করেন, সার্বিক পরিচালনা করেন, তাই তিনিই হচ্ছেন 'রাব্বুল আলামীন'– সৃষ্টিকুলের রব। তিনি সমগ্র কায়েনাতের প্রতিপালকও। এই হচ্ছে সেই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আল্লাহ তাবারকা তায়ালার 'রবুবিয়াতের' এই স্বীকৃতি ও ঘোষণাই হচ্ছে তাওহীদ, যার দিকে ইসলাম আমাদের আহ্বান জানায় এবং এই ঘোষণা সেসব ধোঁকা ও প্রতারণার যাবতীয় মিথ্যা জাল ছিন্ন করে দেয় যা এই মৌলিক সত্যটি আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর মালিকানাকে অকাট্যভাবে না মানার কারণে সৃষ্টি হয়। সে সব ধোঁকা ও প্রতারণা হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে, এই বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টাকে স্বীকার করার সাথে সাথে আবার বাতিল ও মিথ্যা মাবুদদের পূজাও করতে থাকে। এমনিভাবে ইসলামের আগমনকালে যেসব জাহেলিয়াত এই যমীনকে ছেয়ে রেখেছিলো তা এই বিশ্বাসই পোষণ করতো যে, তাদের এসব ছোট ছোট মাবুদ এক বড়ো মাবুদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই মিথ্যা ধারণা ও বিশ্বাসের দিকে ইশারা করার জন্যে কোরআন আরববাসীদের এই কথাটি উদ্ধৃত করেছে, 'আমরা তো মূর্তিগুলোর এ কারণেই পূজা করে থাকি যেন ওরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।' আরো বলছে, 'তারা তো তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর বদলে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।'

সামগ্রিক ও এই একান্ত 'রবুবিয়াত' চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য ও আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে একমুখী আস্থা আনয়ন করে যাতে করে গোটা সৃষ্টিকূল একই মাবুদের দিকে নিবিষ্ট হতে পারে তার একচ্ছত্র মালিকানার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়ে নিজ মস্তক থেকে অগণিত মাবুদের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং এভাবে গোটা সৃষ্টিকুলের মন-মস্তিষ্ক আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ 'রবুবিয়াত' তার দেখাশোনা ও তদারকিতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এটা এমন ধরনের বিশ্বাস নয় যা গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল পেশ

করেছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে 'মহাপ্রভু সবকিছুকে সৃষ্টি করে এখন আলাদা হয়ে গেছেন কেননা তাঁর পক্ষে তার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের দিকে লক্ষ্য দেয়া মর্যাদার পরিপন্থী ব্যাপার। এখন তিনি শুধু নিজস্ব সত্তার ব্যাপারেই ভাবছেন।'

এটা হচ্ছে এরিস্টটলের বিশ্বাস, অনেকের মতেই তিনি ছিলেন নাকি একজন বড়ো দার্শনিক। তার এ জ্ঞান তপস্যাটুকু বলতে গেলে সর্বযুগের সবকয়টি জাহেলিয়াতেই বিদ্যমান ছিলো।

যখন ইসলাম এলো, সারা দুনিয়া তখন মিথ্যা আকিদা বিশ্বাস, বাতিল ধ্যান ধারণা, পচে যাওয়া চিন্তাধারা ও অন্ধ পৌরাণিক বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিলো। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে কোন্টা ভুল কোন্টা নির্ভুল, কোন্টা হক কোন্টা বাতিল এর মধ্যে কোনো পার্থক্যকারীই ছিলো না। সঠিক দ্বীন এবং মিথ্যা ধ্যান-ধারণার পার্থক্যটুকু শেষ হয়ে গিয়েছিলো। দর্শন ও পৌরাণিক বিষয় একে অপরের সাথে মিশে গিয়েছিলো, আর এই সমস্ত ভারি বোঝার নিচে পড়ে মানুষ অনিশ্চিত অবস্থায় অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছিলো।

মানুষ এই অনিশ্চিত সর্বগ্রাসী অন্ধকারে এ জন্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে, তার সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে সে বিশ্বাস তার বিনষ্ট হয়ে গেছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনে মাবুদের ব্যাপারে তার ধারণা বিশ্বাস পরিষ্কার না হবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এক অটল বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে না দাঁড়াবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার মন মগযের পক্ষে সৃষ্টি জগত, স্বয়ং তার নিজস্ব অস্তিত্ব এবং স্বকীয় জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে শান্তি ও স্থায়িত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। যতোদিন পর্যন্ত মানুষ আকিদা বিশ্বাসের এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিন্তা বিশ্বাসে পৌরাণিক ক্রিয়াকান্ডের জটিলতার বোঝা অনুভব করতে পারবে না তার কাছে স্থায়িত্ব ও শান্তির প্রয়োজনীয়তাটুকু কোনোদিনই অনুভূত হবে না, যে স্থায়িত্ব ও শান্তি একমাত্র কোরআনের চিন্তাধারাকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়নের ফলেই হাসিল করা সম্ভব।

এই কারণেই ইসলাম সর্বাগ্রে এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে যে, মানুষের চিন্তাধারা যাবতীয় অন্ধ ও বাতিল বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত হতে হবে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী ও তাঁর সাথে সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যাপারে সকল ধারণা হবে পরিষ্কার এবং অকাট্য যেন মানুষের মন মগয শান্তি ও স্থিরতা পেতে সক্ষম হয়।

এ কারণেই ইসলাম এমন এক পূতপবিত্র একনিষ্ঠ ও পূর্ণাংগ তাওহীদের আদেশ দিয়েছে, যার মধ্যে সামান্যতম কোনো শেরেকের সন্দেহও অবশিষ্ট থাকবে না। যা মানুষের মনমগযে শান্তি ও নিরাপত্তা দেবে, মানবীয় সত্তায় তা ভালোভাবেই নিজের স্থান করে নেবে এবং তা সেখানে ভালোভাবে অংকিত হয়ে যাবে।

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী ও তাঁর 'রবুবিয়াতের' ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছে। কেননা ইসলাম-পূর্ব আকিদা দর্শনে আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে বহুবিধ জটিলতা এবং বাতিল চিন্তাধারা ও পৌরাণিক বিষয়সমূহের বহু দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, যা মানুষের মনমগযকে নাপাক বিষয়সমূহে ডুবিয়ে দিয়ে তার চিন্তা ও কর্মধারাকে খারাপ করে রেখেছিলো। যদি চিন্তা-বিশ্বাস ও পৌরাণিক নীতিসমূহের সব ক'টি খারাপ জিনিসকে মানুষের সামনে দেখিয়ে না দেয়া যায়, যা ইসলাম আগমনের পূর্বে মানুষের জন্যে একটি বিরাট বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছিলো এবং যদি সেসব অন্ধকার ও অমানিশাকে গভীরভাবে না দেখে যার মধ্যে মানবতা ধুকে

ধুকে ঠোকর খাচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীকে কোনোক্রমেই প্রকাশ করা যাবে না। এছাড়া এ জন্যে ইসলামের ক্রমাগত ও একনিষ্ঠ সাধনা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের ইসলামের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা এবং মানুষের মন মগজের সব কয়টি পদস্খলনকে দেখিয়ে দেবার ব্যাপারে ইসলামের প্রচেষ্টাসমূহের প্রয়োজনীয়তা কোনোক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। হ্যাঁ, যদি জাহেলিয়াতের খারাপ দিকগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুভব করা যায়, তাহলে ইসলামের চিন্তার, বিপ্লবের সঠিক নকশাটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবে–যা ইসলাম মানুষদের বহু মাবুদ, অগণিত দেবদেবী, পচা দুর্গন্ধময় চিন্তাধারা, পৌরাণিক কেসসা কাহিনীর আনুগত্য ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে শুধু একই মালিকের রহমতের ছায়া তাদের দান করেছে।

'আর রাহমানির রাহীম' অসীম দয়াবান, অনেক দয়ালু, এই গুণাবলী যা রহমতের সবক'টি অর্থ ও দয়ার সবক'টি অবস্থার সমষ্টি, দ্বিতীয়বার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াতরূপে পেশ করা হয়েছে। যেন এই গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ও সৃষ্টিকর্তার পুরোপুরি একটি গুণ পরিষ্কার হওয়ার গুরুত্ব প্রদান করা যায়। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে স্থায়ী সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন সম্পর্ক যা, রহমত ও অনুগ্রহের, যা প্রশংসা ও তারিফের যোগ্য। এমন সম্পর্ক যা প্রশান্তি ও ভালোবাসার ওপর স্থাপিত, কেননা অশেষ দয়া ও রহমতের প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে 'হামদ' (আল্লাহর প্রশংসা করা)।

ইসলামের মাবুদ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, যেমন গ্রীক পুরাণে দেবতা তাদের বান্দাদের ধমক দেয় এবং প্রতিশোধমূলক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে।

'তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক।'

এই বাক্যটি আখেরাত বিশ্বাসের সেই মহান আকিদার কথা বলে দেয়। কেননা আখেরাত বিশ্বাস মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল নির্ণয় করে। 'মালিক' পূর্ণ বিজয় ও মালিকানার অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'ইয়াওমেদ্দীন' মানে প্রতিদানের দিন।

ইসলামের আগমনের পূর্বে এমন বহু লোক ছিলো যারা এক মাবুদের ওপর বিশ্বাস করতো এবং তিনি যে সমগ্র কায়েনাতের স্রষ্টা তাও তারা মানতো, কিন্তু তারা প্রতিদানের দিবসে বিশ্বাস করতো না। তাই কোরআন এদের ব্যাপারে বলছে, 'যদি তুমি এদের জিজ্ঞেস করো যে আসমান যমীন কে বানিয়েছেন, তাহলে তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছেন।'

কোরআন এদের ব্যাপারে আরো বলছে, 'তারা এ ব্যাপারটিতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকেই একজন লোক এসেছে, যে তাদের ভয় দেখাচ্ছে। অতএব কাফেররা বলছে, এতো ভারি অন্যায়ের কথা। যখন আমরা মরে যাবো মাটি হয়ে যাবো তখন আমরা আবার জীবিত হয়ে যাবো কিভাবে?'

'প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী আকিদার এমন একটি মৌলিক বিশ্বাস যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আখেরাতের জগত পর্যন্ত বুলন্দ হয়ে যায়। তখন সে আর শুধু বৈষয়িক দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহের গোলাম হয়েই বসে থাকে না, বরং সে নিজে এ প্রয়োজনসমূহের ওপর বিজয় লাভে সমর্থ হয় এবং এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে নিজের চেষ্টা সাধনার বিনিময় ও ফলাফলের চিন্তায় লেগে থাকার বদলে আল্লাহ তায়ালার ওপর পুরোপুরি ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের যেখানেই চাইবেন তার কর্মের ফলাফল দান করবেন। আর এই

বিশ্বাস একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং দুনিয়াবী পরিমাপক যন্ত্র ও চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মহান আসমানী মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, যা সত্যিকার অর্থে একটি মহা মর্যাদার ব্যাপার।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিদান দিবসের ওপর মানুষের বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ ও অটুট না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত না হবে যে দুনিয়াবী প্রতিফলের ওপর প্রতিদান কার্য সমাপ্ত হয়ে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি এ কথাটি জেনে না নেবে যে, এই বৈষয়িক দুনিয়া ছাড়াও আরেকটি জীবন আছে যার জন্যে তার চেষ্টা সংগ্রাম করা দরকার এবং তাকে সত্য ও কল্যাণের জন্যে ত্যাগ ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে যেন আখেরাতের কল্যাণ সে লাভ করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতা আল্লাহ তায়ালা প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকিমের' পথে ধাবিত হতে পারে না।

আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী আর আখেরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে দু'টি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাদের চিন্তাধারা, তাদের চরিত্র, তাদের কর্মধারা, তাদের জীবন প্রণালীতে কোনো অবস্থায়ই কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদের উভয়ের মাঝে দুনিয়াতেও কোনো সামঞ্জস্য নেই ও আখেরাতে এদের প্রতিদান একই ধরনের হবে না।

'আমরা তোমারই এবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

এটি এক বিশ্বাসের অংশ যা এই সূরায় বর্ণিত আগের অংশসমূহের অপরিহার্য পরিণাম। এই বাক্যটি দুনিয়ার সব ধরনের গোলামী থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মানুষের সার্বিক এবাদাতের রাস্তাসমূহকে আলাদা আলাদা করে মানবতার পরিপূর্ণ আযাদীর ঘোষণা দেয় যে, আজ মানুষ আর কারো অধীন নয়। অন্ধ বিশ্বাস থেকে সে স্বাধীন, পচা দুর্গন্ধময় ব্যবস্থাপনার বন্দীদশা থেকে স্বাধীন, আজ সে স্বাধীন যাবতীয় তথাকথিত সামাজিক নিয়মনীতির বন্ধন থেকে। এখন সে শুধু আল্লাহরই গোলামী করে এবং শুধু আল্লাহরই সাহায্য চায়। এখন আর মানবতাকে মানুষের তৈরী বিধি-বিধান, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষদের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। এখন মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের পূজা করারও কোনো দরকার নেই।

এ পর্যায়ে মানবীয় এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ব্যাপারে একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। মানবীয় শক্তিসমূহ দু'ধরনের,

১। হেদায়াতপ্রাপ্ত শক্তি—যা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তারই নির্দেশিত পথে চলে। এই শক্তির সাথে একজন মোমেন সহযোগিতা করে সংশোধন ও কল্যাণের যাবতীয় কাজে তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে।

২। পথভ্রষ্ট শক্তি—যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে না, না তার প্রদর্শিত পথে চলে। এই শক্তির বিরুদ্ধে একজন মুসলমান মোকাবেলা করে এবং তার সাথে সংগ্রাম করে। মুসলমান কখনো পথভ্রষ্ট শক্তির আধিক্য ও প্রভাব দেখে ভয় পায় না। কারণ সে জানে প্রতিটি শক্তির উৎস ও মূল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব সত্ত্বা। যখনি কোনো শক্তি তার মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দূরে সরে যায়, তখন আস্তে আস্তে তার শক্তি সামর্থ হারিয়ে ফেলে। যেমন একটি আলোকোজ্জ্বল গ্রহ থেকে তার বড়ো একটি টুকরো আলাদা হয় তাহলে আস্তে আস্তে তার আলো ও শক্তি নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়িই তা ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু যদি তা সামান্যতমও মূল উৎসের সাথে জড়িত থাকে তাহলে তার মধ্যে শক্তি ও উত্তপ্ততা অবশিষ্ট থাকে, শক্তির আলোও বাকী থাকে।

এই ক্ষুদ্রতম দলটির বিজয়ের কারণ একটিই যে, এটা তার উৎসমূলের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ থেকেই সে শক্তি অর্জন করে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতির ভিত্তি হচ্ছে একে মেনে নেয়া ও আপন করে নেয়া। ভয় এবং দুশমনী করে নয়, কেননা মানবীয় শক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উভয়টিই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের অনুগত। উভয়বিধ শক্তির নড়াচড়া ও গতিবিধির লক্ষ্যকে অভিন্ন এবং একে অপরের পরিপূরক হতে হবে। মুসলমানদের বিশ্বাস তাকে একথা বলে দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা সৌর মন্ডলের যাবতীয় শক্তিসমূহকে তার সাহায্যকারী ও সহায়তাদানকারী করে বানিয়েছেন। এই সাহায্য পাবার মূলনীতি হচ্ছে মানুষ এই শক্তিসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সহযোগিতার পাশাপাশি সে আল্লাহ তায়ালার দিকেও নিবিষ্ট হবে। যদি কখনো এসব জাগতিক শক্তিসমূহের কোনো কিছুকে দিয়ে মানুষের কিছু পরিমাণ কষ্টও হয়ে থাকে তাহলে তা এ জন্যে হয়েছে যে, মানুষ এ পর্যায়ে পর্যাপ্ত চিন্তা-ভাবনা করে এর প্রাকৃতিক বিধানের তথ্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাচীন জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকার এই পশ্চিমী সভ্যতা জাগতিক শক্তিসমূহের ব্যবহারকে এই ভূমন্ডলের ওপর বিজয় ধরে নিয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি স্বয়ং আরেকটি জাহেলিয়াতের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে, যা আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অনেক দূরে এবং সৃষ্টি জগতের চেয়েও অনেক দূরে। তবে হ্যাঁ, মুসলমানের আল্লাহ তায়ালার সাথেও সম্পর্ক আছে এবং সৃষ্টি জগতের এই মূলতত্ত্বটিও অনুধাবন করে যে, সমগ্র পৃথিবীই আল্লাহর তসবীহ করে। সে মুসলমান এইটুকু বিশ্বাস রাখে যে এই সৃষ্টি–সৃষ্টি জগতের ওপর বিজয় লাভ করা ছাড়াও একটি সম্পর্ক আছে এবং তা হচ্ছে এই যে আল্লাহ তায়ালাই সমগ্র শক্তির স্রষ্টা এবং আল্লাহ তায়ালা এসব শক্তিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্যে পয়দা করেছেন, আর তা হচ্ছে একই লক্ষ্যের অধীনে থেকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে।

যাবতীয় জাগতিক শক্তিসমূহকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অধীন করে দিয়েছেন এবং তার জন্যে এই সৃষ্টি জগতের ভেদ রহস্যের পরিচিতি প্রাকৃতিক নিয়মনীতি ও সব ধরনের জ্ঞানকে সহজ ও সরল করে দিয়েছেন। মানুষের উচিত যখনি সে এই বিশ্ব চরাচরের কোনো নতুন রহস্য উদঘাটন করতে পারে তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই এসব শক্তিকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে এগুলো নিজে জয় করে আনেনি।

এ দুনিয়ার জাগতিক শক্তিসমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের অনুভূতি অন্ধ বিশ্বাসের সাথে আটকানো থাকে না। না এ পর্যায়ে তার মনে কোনো ভীতিকর প্রভাব জমিয়ে রাখে। সে তো শুধু আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁরই এবাদাত করে আর শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। এই জাগতিক শক্তিসমূহ যেহেতু আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি তাই সে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তার রহস্য উদঘাটন করে তার থেকে জ্ঞান হাসিল করে এবং তার সাথে একটা বন্ধুত্ব ও মায়ার বাধন সৃষ্টি করে।

আল্লাহর নবী কতো সুন্দরভাবে এই মূল্যবান কথাটি বলেছেন। একদিন তিনি ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে আর আমরা এই পাহাড়কে ভালোবাসি।' এই কথাটি দ্বারা আল্লাহর নবী ও প্রাকৃতিক সৃষ্টিরাজির এক মহান নিদর্শনের মাঝে ভালোবাসা ও মমত্ববোধের সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে যায়।

ইসলামী আদর্শের এই উপরোক্ত মৌলিক নিয়মগুলো আলোচনা এবং এটুকু প্রমাণ করে দেয়ার পর যে এবাদাতের প্রতিটি স্তরে এবং অটল অনড় থাকার প্রতিটি পর্যায়ে শুধু আল্লাহর দিকেই নিবিষ্ট হতে হবে। কোরআন এর ব্যবহারিক সামঞ্জস্যের পথ ধরে এবং সূরা ফাতেহার উদ্দেশ্যের কথা খেয়াল রেখে এবার তাকে দোয়ার দিকে ধাবিত করে।

'তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও,'

হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের সোজা রাস্তা চিনিয়ে দাও। হে আল্লাহ, এ পথ চিনিয়ে দেয়ার পর তাতে অটল থাকারও শক্তি দাও। কেননা পথ চেনা এবং সে পথে টিকে থাকা এ দু'টোই আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত ও রহমতের ফলশ্রুতি মাত্র। এ ব্যাপারে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হওয়া এই বিশ্বাসেরই অপরিহার্য পরিণাম যে, আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী এবং তিনিই মদদগার।

'সেরাতুল মোস্তাকিম' সঠিক পথের দিশাই সেই মহান নেয়ামত যা পাওয়ার জন্যে মোমেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। সেরাতুল মোস্তাকিমের দিকে পথনির্দেশই দুনিয়া আখেরাতের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধানকারী জিনিস। কেননা সঠিক পথের হেদায়াত হচ্ছে সঠিক অর্থে মানবীয় প্রকৃতির সেই আল্লাহর অভীষ্টের দিকে ধাবিত হওয়া, যা মানুষ ও এই সৃষ্টি জগতের প্রতিটি চলন বলনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে এককভাবে নিবিষ্ট রাখা।

'আমাদের সেসব লোকদের রাস্তা দেখাও-যাদের ওপর তুমি তোমার অনুগ্রহ নাযিল করেছো। ওদের পথে নয়, যারা রাস্তাঘাট চেনার পরও তা থেকে সরে যাওয়ার অপরাধে তাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছে। তাদের রাস্তায়ও নয়, যারা নীতিগতভাবেই কখনো সঠিক পথ পায়নি। শুধু সেসব হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের রাস্তা, যারা সঠিক পথ পেয়েছে এবং এর ওপর চলা অব্যাহত রেখেছে।'

সূরা ফাতেহা যা নামাযে বারবার পড়া হয় এবং যা না পড়লে নামায শুদ্ধ হয় না, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্তেও ইসলামী ধ্যান-ধারণা, আকিদা বিশ্বাসের মৌলিক নীতিগুলো এতে বলে দেয়া হয়েছে। এই বিশ্বাসের ফলে যে বোধোদয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাকেও এখানে খুলে বলা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দাহর মাঝে বন্টন করে নিয়েছি, অর্ধেক আমার অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দাহর এটুকু অধিকার আছে যে, তার যা ইচ্ছা চাইবে। যখন আমার বান্দাহ বলে 'আল হামদু লিল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। যখন বলে 'আর রাহমানির রাহীম' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করলো। যখন বান্দাহ বলে 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম বর্ণনা করলো। যখন বলে 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটি হচ্ছে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। এখন আমার বান্দাহর অধিকার রয়েছে সে যা ইচ্ছে তা চাইবে এবং যখন আমার বান্দাহ বলে 'এহদিনাস সেরাতাল মোস্তাকীম, সেরাতাল্লাযিনা আনয়ামতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম, ওয়ালাদ্দাললীন' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটি আমার বান্দার জন্যে, তার যা ইচ্ছা তাই সে চাইতে পারে।'

এই হাদীস থেকে একথার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, দিনে রাতে কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে পড়ার জন্যে কেন এই সূরাটিকে বাছাই করা হয়েছে এবং কেনই বা একথা বলা হয়েছে যে, যখনি নামাযে দাঁড়াও এই সূরাটি বারবার পড়ো।

সূরা আল বাকারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হিজরতের অব্যবহিত পর যে কয়টি সূরা নাযিল হয়, সূরা 'আল বাকারা' তার অন্যতম। এটি সমগ্র কোরআনের দীর্ঘতম সূরা। সবচাইতে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, এ সূরার আয়াতগুলো সব ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি এবং এ সূরাটি শেষ না হতেই অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ নাযিল হতে শুরু করে। এ সূরার কোনো কোনো আয়াত ও অন্যান্য মাদানী সূরার কোন কোন আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সন্ধান করতে গেলে জানা যায় যে, মদীনায় অবতীর্ণ দীর্ঘ সূরাগুলোর সব কয়টির বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্য। এ সূরাগুলোর সকল আয়াত একত্রে এবং ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি। সাধারণত একটি সূরার প্রাথমিক কিছু আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার বাকী আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার আগেই পরবর্তী সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়াকেই মাপকাঠি বলে ধরা হয়-পুরো সূরা নাযিল হওয়াকে নয়। আলোচ্য সূরায় সূদ সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো রয়েছে তা নাযিল হয়েছে কোরআন নাযিলের শেষ পর্যায়ে। পক্ষান্তরে একই সূরার প্রথমাংশ হচ্ছে মদীনায় নাযিল হওয়া অংশের সূচনাকালের।

পরে আলাদা ওহীর মাধ্যমে এই বিক্ষিপ্ত আয়াতগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরায় একত্রিত করা হয় এবং তাদের ধারা বিন্যাস করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে তিরমিযী শরীফে একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওসমান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি 'আনফালের' মত ছোট সূরা ও 'তাওবার' মত বড় সূরাকে পরপর সাজালেন এবং উভয়ের মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখলেন না! উপরন্তু সূরা আনফালকে বড় বড় সাতটা সূরার মধ্যে স্থান দিলেন, এটা কিভাবে করলেন? হযরত ওসমান (রা.) বললেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সময় সময় এক সাথে একাধিক সূরা নাযিল হতো। এভাবে যখন কোন আয়াত নাযিল হতো তখন তিনি একজন লিখতে জানা লোককে ডেকে বলতেন, অমুক আয়াতটা অমুক অমুক বিষয়ে যে সূরায় আলোচিত হয়েছে তাতে সন্নিবেশিত করো। সূরা 'আনফাল' মদীনার জীবনের প্রথম দিকে এবং 'তওবা' শেষের দিকে নাযিল হয়। উভয়ের আলোচ্য বিষয় ছিলো অনেকটা একই রকমের। আমার মনে হয়েছিলো 'আনফাল' বুঝি 'তওবার'ই অংশ। কিন্তু রসূল (স.) 'আনফাল' তওবার' অংশ কিনা তা না বলেই এন্তেকাল করেন। এ জন্যে আমি উভয় সূরাকে পর পর বিন্যস্ত করেছি। কেবল 'বিসমিল্লাহ' লিখিনি এবং সূরাটি সাতটি বড় সূরার মধ্যে শামিল করেছি।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক সূরায় আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সন্নিবেশ স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমেই সম্পন্ন হতো। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কল্যাণমূলক কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সবচেয়ে তৎপর। বিশেষত রমযানে যখন তিনি জিবরাইলের সাথে মিলিত হতেন তখনই তিনি কল্যাণের কাজে সবচেয়ে বেশী তৎপর ও সক্রিয় হয়ে উঠতেন। রমযানে প্রতি রাত্রেই জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রমযান মাসের শেষ পর্যন্তই এই প্রক্রিয়া চলতো। এই সময় রসূল তাঁর সামনে কোরআন পেশ করতেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এই সময় তিনি ও জিবরাইল পরস্পরে কোরআনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি কল্যাণধর্মী কাজে 'চলন্ত বাতাসের মত' সক্রিয় হয়ে উঠতেন। বস্তুত, এটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জিবরাঈল রসূলকে সমগ্র কোরআন পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা উভয়ে আয়াতগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত ও সুবিন্যস্ত থাকা অবস্থায় কোরআন পড়েছেন।

এ জন্যেই যে ব্যক্তি কোরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন করে অর্থাৎ কোরআনকে নিবিষ্টচিত্তে নিয়মিত অধ্যয়ন করে ও তার শিক্ষার প্রভাব আপন জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে সে কোরআনের প্রতিটি সূরার মধ্যে এক একটা অনন্য বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে থাকে। সে অনুভব করে যেন প্রত্যেকটা সূরার একটা সজীব ও প্রাণবন্ত সত্তা রয়েছে যা হৃদয়ের লালন ও বিকাশে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন করে থাকে একজন যথার্থ জীবন্ত ও সুপরিচিত ব্যক্তির প্রাণবন্ত সত্তা। সে আরো লক্ষ্য করে যে, প্রত্যেকটা সূরার এক অথবা একাধিক আলোচ্য বিষয় রয়েছে যা একটা সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেকটা সূরার এক একটা বিশেষ পটভূমি রয়েছে। সূরায় আলোচিত সব ক'টি বিষয় সেই পটভূমির আওতাধীন থাকে। অতপর কতিপয় সুনির্দিষ্ট দিক থেকে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এক একটা ছন্দগত সুর ব্যঞ্জনাও প্রত্যেক সূরায় লক্ষ্যণীয়। বক্তব্যধারার পটভূমিতে তা যখন ভিন্ন খাতে মোড় নেয় তখন বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো বক্তব্য উপলক্ষ্যেই তার পরিবর্তন ঘটেছে। কোরআনের সকল সূরারই এ এক সাধারণ বৈশিষ্ট। দীর্ঘ সূরাগুলোর কোনোটাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি–সূরা বাকারাতেও নয়।

সূরা বাকারায় বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় এসব কয়টি আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টো প্রধান ধারা এই কেন্দ্রীয় বিষয়ের জন্যে গভীরভাবে সন্নিবেশিত ও সম্মিলিত হয়েছে। এই দু'টো প্রধান ধারার একটা হলো মদীনায় অবস্থিত ও প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের বিরূপ দৃষ্টিভংগী, তার প্রতি তাদের বিরূপ সমালোচনা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ। সেই সাথে ইহুদী ও বর্ণচোরা মুসলমান তথা মোনাফেকদের মধ্যে এবং ইহুদী ও মোশরেকদের মধ্যে বিরাজমান সুগভীর ও গাঁটছড়াও এ ধারার আওতাভুক্ত। আলোচনার দ্বিতীয় ধারাটা ইসলামী সংগঠনের আবির্ভাবের সূচনাকালীন অবস্থা এবং মোমেনদেরকে পৃথিবীতে ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এর আগেই সূরা বাকারায় এ দায়িত্ব পালনে বনী ইসরাঈল তথা ইহুদী-খৃস্টান জাতিদ্বয়ের ব্যর্থতা, এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে দেয়া অংগীকার ভংগ এবং আদি ও আসল তাওহীদের নিশানবাহী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত ও যথার্থ বংশধর হওয়ার গৌরব ও অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যে সব ভ্রান্ত কার্যকলাপের জন্যে বনী ইসরাঈল এত বড় গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলো থেকে সংযত ও নিবৃত থাকার জন্যে মুসলিম জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। এ দু'টো প্রধান ধারার সমন্বয়ে ও সংযোগেই গঠিত হয়েছে সূরা বাকারার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। এই কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে আবর্তন করেই সূরার অন্য সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। আগামীতে এসব বিষয়ের পূর্ণাংগ পর্যালোচনা করার সময় কথাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সূরা বাকারার উক্ত কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সাথে তার আলোচ্য বিষয়গুলো এবং মদীনার প্রথম ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইসলামী সংগঠনের জীবনধারা ও তার বাধা-বিপত্তিগুলো যে কতো গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও কেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমি এ বাধাগুলোর ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কেননা শুরুতে এ বাধা-বিপত্তিগুলো মোকাবেলা করার পথনির্দেশ হিসেবেই এই সূরায় আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। এই সংগে এ কথাও জানা দরকার যে, চিরদিনই ইসলামী আন্দোলনের কাফেলার

এসব বাধা-বিঘ্ন মোকাবেলা করতে হয়েছে। হয়তো সময় সময় তার আকারে-আকৃতিতে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। কিন্তু শত্রু মিত্র উভয়ের পক্ষ থেকে বাধা-বিঘ্ন আসা একটা অবধারিত ও চিরন্তন ব্যাপার। এ জন্যে কোরআনের এসব দিক নির্দেশনা ইসলামী আন্দোলনের শাশ্বত ও চিরন্তন সনদে পরিণত হয়েছে যা প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক প্রকারের সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম। এসব বাধা-বিঘ্নকে কোরআন মুসলিম জাতির পথের দিশা হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যা দেখে সে তার দীর্ঘ ও বন্ধুর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ পথে সে যত বিরোধ ও শত্রুতার সম্মুখীন হয়, তার বৈশিষ্ট বিচিত্র হলেও প্রকৃতি অভিন্ন। বস্তুত, কোরআনের প্রতিটি বাণীতে এই যে বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় তা মূলত কোরআনের আলৌকিকত্বেরই আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

মদীনায় হিজরতের কারণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত কোন অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। সে জন্যে তাকে আগে থেকেই দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিলো এবং সে জন্যে উপযুক্ত প্রেক্ষাপটও তৈরী করা হয়েছিলো। হিজরতের ঘটনাটা একটা বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দেখা দিয়েছিলো। ইসলামী আন্দোলনকে যে খাতে প্রবাহিত করার পরিকল্পনা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন, তার জন্যে এটা ছিলো একটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ। রসূলের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক আবু তালেব এবং হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর মক্কার ইসলামী আন্দোলনের প্রতি কোরায়শদের আক্রোশ ও বিদ্বেষমূলক আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এ আচরণ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিলো যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে ইসলামী আন্দোলনের কাজ প্রায় বন্ধই করে দিতে হয়েছিলো। এর একমাত্র কারণ ছিলো কোরায়শদের প্রবল শত্রুতামূলক নীতি এবং যে কোনো উপায়ে এ দাওয়াতের কাজকে প্রতিরোধ করার সংকল্প। এর ফলে বাদবাকী আরবরা ইসলামী আন্দোলনকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর স্বজনদের এ লড়াই কোথায় গিয়ে গড়ায় তা দেখার জন্যে। কোরায়শদের এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো আবু লাহাব, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের মত রসূলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। সে সময়কার আরব সমাজের গোত্রীয় পরিবেশে আত্মীয়তার বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার প্রচার করা আকীদা ও আদর্শকে আমল দিতে আরবদের উৎসাহ বোধ করার কোন কারণ ছিলো না। বিশেষত তাঁর এই আত্মীয়-স্বজনই ছিলো পবিত্র কাবা শরীফের খাদেম ও মোতাওয়াল্লী। বস্তুত, কাবা শরীফের খাদেম ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়াটা তখনকার দিনে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় নেতৃত্বের সার্টিফিকেট বলেও বিবেচিত হতো।

এসব কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের কাজ পরিচালনার জন্যে মক্কা ছাড়া অন্য কোন ঘাঁটির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সে ঘাঁটি হওয়া চাই এমন পর্যায়ের যেখানে তাঁর আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষিত ও নিরাপদ হবে, অবাধ স্বাধীন ও নির্বিঘ্ন কাজের পরিবেশ থাকবে। সেখানে ইসলামী আন্দোলন মক্কার অচলাবস্থা থেকে মুক্ত হবে, দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলতে পারবে এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীরা উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে।

আমার বিবেচনায় এটাই ছিলো হিজরতের প্রথম ও প্রধান কারণ।

ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে মদীনাকে বেছে নেয়ার আগে আরো কয়েক জায়গায় হিজরত করা হয়েছিলো। হিজরত করা হয়েছিলো আবিসিনিয়ায়, সেখানে প্রাথমিক যুগের বিপুলসংখ্যক মুসলমান হিজরত করেন। এই হিজরতকে কেউ কেউ নিছক জান বাঁচানোর হিজরত

বলে আখ্যায়িত করে থাকেন; কিন্তু এ অভিমতের সপক্ষে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নেই। এটা যদি সত্য হতো তাহলে মুসলমানদের ভেতরে যারা সবচেয়ে বেশী দুর্বল, সহায় সম্বলহীন ও প্রতিপত্তিহীন, তারাই কেবল হিজরত করতেন। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার ছিলো এর বিপরীত। সমাজের দুর্বলতম শ্রেণী দাসদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলেন এবং যাদের ওপর সবচেয়ে বেশী নিপীড়ন নির্যাতন চলছিলো তাঁদের কেউ এ হিজরতে অংশগ্রহণ করেননি। বরং ওপর তলার অভিজাত লোকেরাই এই হিজরতে অংশ নেন। অথচ একটা গোত্র প্রধান সমাজে তাঁদের আভিজাত্য তাদেরকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে অনেকাংশেই রেহাই দিতে সক্ষম ছিলো। মোহাজেরদের অধিকাংশই ছিলো কোরায়শ বংশীয়। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু তালেবের পুত্র জাফর। আবু তালেব ও তার সাথে বনু হাশেমের তরুণরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের অত্যচার থেকে রক্ষা করতো। যোবায়ের ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালামা মাখযুমী ও ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)ও ছিলেন আবিসিনিয়ার মোহাজেরদের অন্যতম। কিছু সংখ্যক মহিলাও হিজরত করেছিলেন। তারাও মক্কার অভিজাত পরিবারের সদস্যা ছিলেন, যার জন্যে তাদের কখনো অত্যাচারের শিকার হতে হতো না। সম্ভবত এসব মহিলার হিজরতের পেছনে অন্য কিছু কারণও ছিলো। হয়তো বা কোরায়শদের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। যে সময় কোরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত সন্তানরা নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্যে এবং জাহেলিয়াত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সকল আত্মীয়তার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলো , সে সময় মহিলাদের এ হিজরত গোত্রীয় পরিমন্ডলে সমগ্র কোরায়শ আভিজাত্যকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিচ্ছিলো । বিশেষত হিজরতকারিনীদের মধ্যে যখন সে নতুন আকীদা-বিশ্বাসের ও তার আহ্বায়কের উগ্র বিরুদ্ধবাদী ও জাহেলিয়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার মত মহিলাও ছিলেন। কিন্তু এ ধরনের কারণ থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না। এ সত্তেও আবিসিনিয়ার হিজরত ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একটা স্বাধীন অথবা নিদেনপক্ষে একটা নিরাপদ ঘাঁটি সন্ধানের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষত আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তা যদি এই সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য নাজ্জাশী তার সেই ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সক্ষম হননি শুধুমাত্র প্রজা বিদ্রোহের আশংকায়। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে রসূলের তায়েফ গমনও ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার একটা স্বাধীন অথবা কমপক্ষে একটা নিরাপদ ঘাঁটি সন্ধানের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। তাঁর এই চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। কেননা বনু ছকীফের নেতারা তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। তারা তাদের ভেতরকার নির্বোধ লোকজন ও বালকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়তে বলে দেয়। পাথর মেরে মেরে তারা রসূলুল্লাহর পবিত্র পা দু'খানাকে আহত ও রক্তাক্ত করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা বেগতিক দেখে উৎবা ও শায়বা ইবনে রাবিয়ার ফলের বাগানে আশ্রয় নেন। সেখানে আশ্রয় নেবার পূর্ব পর্যন্ত তারা পাথর ছোঁড়া থেকে ক্ষান্ত হয়নি। সেই সময় তার মুখ দিয়ে এই গভীর মিনতিপূর্ণ দোয়া নির্গত হয়,

'হে আল্লাহ! আমি নিজের দুর্বলতা, কৌশলের অপ্রতুলতা ও মানুষের সামনে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি দুর্বলদের মালিক, তুমি আমারও

মালিক। তুমি কার কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছো? তুমি কি কোনো শত্রুর কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছ যাকে আমার অভিভাবক করে দিয়েছো, অথবা আমাকে আক্রমণকারী কোনো অনাত্মীয়ের কাছে সঁপেছো? আমার ওপর যদি তোমার রাগ না থাকে তাহলে আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করি না। তবে তোমার পক্ষ থেকে সর্বাংগীন সুস্থতা আমার জন্যে শ্রেয়। তোমার স্বীয় জ্যোতিতে সকল অন্ধকার আলোকিত হয় এবং যার বদৌলতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যা সমাধান হয়, সেই জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেনো তুমি আমার ওপর তোমার ক্রোধ ও অভিসম্পাত না পাঠাও। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার শরণাপন্ন থাকবো। বস্তুত, তুমি ক্ষমতা না দিলে কারো কোনো কাজের ক্ষমতা হয় না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আন্দোলনের জন্যে অকল্পনীয়ভাবে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে প্রথম আকাবা ও দ্বিতীয় আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টো ঘটনার সাথে আমাদের আলোচ্য সূরার ভূমিকার বিষয়বস্তু ও মদীনায় ইসলামী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আকাবার শপথের ঘটনা সংক্ষেপে এরূপ, মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় মদীনার খাযরাজ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে তিনি সেই হজ্জে আগমনকারীদের সামনে নিজেকে ও নিজের দাওয়াতকে তুলে ধরেন এবং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার কাজে তিনি তাদের কাছে কিছু সহযোগী ও সমর্থক চান। ইতিপূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মদীনাবাসী ও তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদের কাছে প্রায়ই শুনতো যে, একজন নবী আসার সময় সমাগত প্রায়। ইহুদীরা সেই নবীর দোহাই দিয়ে আরবদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতো। সেই নবী এলে আরবরা যাতে ইহুদীদের কথামত চলে সে জন্যে তাদেরকে অনুরোধ করতো। খাযরাজ প্রতিনিধিদল যখন হযরতের দাওয়াত শুনলো তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো, 'আল্লাহর শপথ! এই সেই নবী যার কথা ইহুদীরা আমাদেরকে বলেছিলো। অতএব, এসো আমরা ইহুদীদের আগেই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করি। এই বলে তারা রসূলের দাওয়াত গ্রহণ করলো। তারপর বললো, আমরা আমাদের গোত্রকে রেখে এসেছি। অথচ পারস্পরিক শত্রুতা ও দাংগা-ফাসাদে আমাদের গোত্রের জুড়ি নেই। আশা করি আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই আপনাকে তাদের সাথে মিলিত করবেন। এরপর যখন তারা নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলো, তাদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। লোকেরা সব শুনে খুশী হলো এবং তারা যে কাজ করে এসেছে তার প্রতি সমর্থন জানালো।

পরবর্তী বছর আওস ও খাযরাজের একটা দল হজ্জ করতে মক্কা গমন করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করলো। রসূল (স.) তাদের সাথে ইসলাম শিক্ষা দিতে পারে এমন একজন লোকও সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

এর পরবর্তী বছর আবার আওস ও খাযরাজের একটা বিরাট প্রতিনিধি দল হজ্জ করতে মক্কায় যায় এবং তারাও তাদেরকে শপথ গ্রহণ করাতে অনুরোধ করে। রসূলের চাচা হযরত আব্বাসের উপস্থিতিতে শপথ অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা নিজেদের জান ও মাল যেভাবে রক্ষা করে তেমনিভাবে রসূলের জানমাল রক্ষা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। এ ঘটনাকে ইতিহাসে আকাবার দ্বিতীয় ও বৃহৎ শপথ অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করা যায়। এ শপথ অনুষ্ঠান সম্পর্কে হাদীসে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কারজীর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ গ্রহণের রাতে বলেন, আপনি শপথ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে যেমন খুশী অংগীকার গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে এ প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার সম্পর্কে এ প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের জানমাল রক্ষার জন্যে যেসব জিনিস প্রতিরোধ করে থাকো, আমার জান মাল রক্ষার জন্যেও সেসব জিনিস প্রতিরোধ করবে। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমরা এই প্রতিজ্ঞা করলে এর বিনিময়ে কি ফল পাবো? রসূল (স.) বললেন, বেহেশ্‌ত, তখনই সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। এ থেকে আমরা পিছু হটবো না কাউকে পিছু হটতেও বলবো না।

এভাবে তারা দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই থেকে মদীনায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। মদীনায় তখন এমন একটা পরিবার রইলো না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি। মক্কার মুসলমানরাও এরপর থেকে নিজেদের আকীদা ও ঈমান ছাড়া অন্য সব কিছু ফেলে মদীনায় যেতে লাগলো। সেখানে তাদের যেসব ভাই আগে থেকে বসবাস করছিলো এবং ঈমান এনেছিলো তাদের কাছ থেকে তারা এমন ত্যাগ, কোরবানী ও সৌভ্রাতৃত্ব লাভ করলো যার নযির মানবতার ইতিহাসে দুর্লভ। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীককে সংগে নিয়ে হিজরত করলেন। সেখানে তিনি তাঁর সেই নিরাপদ স্বাধীন ও শক্তিশালী ঘাঁটিটি পেলেন, যার জন্যে তিনি ইতিপূর্বে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। এ ঘাঁটিতে রসূলের হিজরতের প্রথম দিন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হলো।

মোমেনদের বৈশিষ্ট্য

প্রথম হিজরতকারী ও হিজরতকারীনীদের সাদর অভ্যর্থনাকারী এসব মোমেনদের সমন্বয়ে মুসলমানদের সেই দলটি গঠিত হলো কোরআন বহু জায়গায় উচ্চকণ্ঠে যাদের প্রশংসা করেছে। এখানে আমরা দেখতে পাই সূরা বাকারা ঈমানের এই বৈশিষ্টসমূহের বিবরণ দিয়েই শুরু হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট খাঁটি ও বিশুদ্ধ মোমেনদের পরিচায়ক তা যে সময়ের ও যে স্থানেরই হোক না কেন। কিন্তু এই সূরায় মোমেনদের যে দলটি সে সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলো বিশেষভাবে তাদের বর্ণনাই প্রথমে দেয়া হয়েছে। এরশাদ করা হয়েছে,

'আলিফ লা-ম-মী-ম' এই (মহান) গ্রন্থ (আল কোরআন), এতে (কোনো প্রকারের) সন্দেহ নেই, এই কেতাব (শুধু) তাদের জন্যেই পথ প্রদর্শক, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে, যারা (সে ঈমানের দাবী মোতাবেক) নামায প্রতিষ্ঠা করে, ... এই লোকগুলোই তাদের মালিকের (পক্ষ থেকে আসা) সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সার্থক ও (সকল পর্যায়ে) সফলকাম।' (আয়াত ১-৫)

কাফেরদের প্রসংগ

এর অব্যবহিত পরেই আমরা দেখতে পাই কাফেরদের গুণ বৈশিষ্টের বিবরণ। এগুলো হচ্ছে সাধারণভাবে কুফরির চিরন্তন বৈশিষ্ট। কিন্তু আলোচ্য সূরায় প্রত্যক্ষভাবে সেই কাফেরদেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে, যারা তখন ইসলামী আন্দোলনের মুখোমুখি অবস্থান করছিলো–চাই তারা মক্কায় থাকুক কিংবা মদীনার আশেপাশের কাফেরদের দলে অন্তর্ভুক্ত থাকুক। এদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে,

'আর যারা (এ বিষয়গুলোকে) অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো ....(আসলে এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও) আবরণ পড়ে আছে। এই ধরনের লোকদের জন্যে কষ্টদায়ক এক ভীষণ শাস্তি রয়েছে।' (আয়াত ৬-৭)

মোনাফেকদের প্রসংগ

এমনিভাবে সেখানে মোনাফেক তথা বর্ণচোরা মুসলমানদের একটা দলও ছিলো। যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রসূলকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিলো এবং মদীনায় তখন যে অবস্থা বিরাজমান ছিলো সেই সামগ্রিক পরিস্থিতিই ছিলো মোনাফেকদের উদ্ভবের কারণ। মদীনার সে অবস্থার কথা আগেই বলেছি। মক্কায় সে রকম অবস্থা বিরাজমান ছিলো না। মক্কায় ইসলামের কোন রাষ্ট্র ছিলো না, তেমনি শক্তি সামর্থ্য ও ছিলো না। এমনকি এমন জনবলও ছিলো না যা দেখে মক্কাবাসী ভয় পেয়ে মোমেনদের সামনে ইসলামের সপক্ষে ও তাদের পেছনে বিপক্ষে কথা বলার বর্ণচোরা নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন বোধ করবে। সেখানে ইসলামের অবস্থা ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে ইসলাম ছিলো প্রকাশ্য নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। ইসলামী দাওয়াত সেখানে সরাসরি প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষিত ছিলো। সেখানে যারা ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন তারা আকীদা-বিশ্বাসেও ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান। তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে তারা সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান মনে করতেন এবং তার জন্যে সব রকমের বিপদাপদকে হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। কিন্তু মদীনায় ইসলাম হিসাবে ধরার মত একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। সেই শক্তিকে মেনে নেয়া ও তাকে কিছু না কিছু তোষামোদ করার প্রয়োজন সবারই হতো। বিশেষত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের পর মদীনার বড় বড় গোত্রপতিরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলামী শাসনের প্রশংসা ও তোষামোদ করতে বাধ্য হতো। তাদের আত্মীয় পরিজনরা সবাই যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত প্রভাব প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এবং স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তাদের পরিবার পরিজন যে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে তাদেরও তা গ্রহণের প্রদর্শনী না করে উপায় ছিলো না। এ জাতীয় লোকদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ছিল অন্যতম। মদীনায় ইসলামের পদার্পণ ঘটার পূর্বে তার গোত্র তাকে রাজা বানিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্যে মালা পর্যন্ত তৈরী করে রেখেছিল।

সূরা বাকারার শুরুতে এসব মোনাফেকের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সুদীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই বিবরণের কোন কোন অংশ থেকে বোঝা যায় যে জাহেলী সমাজপতিদের মধ্যে যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, অথচ তারপরও তারা সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার ইচ্ছা পোষণ করতো এবং বলদর্পী সমাজপতিদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেনি, সূরা বাকারার প্রথমাংশের আলোচ্য মোনাফেক গোষ্ঠী মূলত তারাই। সূরার দ্বিতীয় রুকুতে তাদের বিবরণ কিভাবে দেয়া হয়েছে তা লক্ষ্যনীয়,

'মানুষদের মাঝে কিছু (লোক) এমনও আছে, যারা (মুখে ঠিকই) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে) এরা মোটেই ঈমানদার নয়, আল্লাহ তায়ালা যদি একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা সেদিকে ধাবিত হয়, আবার যখন তিনি অন্ধকার করে দেন তখন এরা (একটু) থমকে দাঁড়ায়, অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে সহজেই তাদের শোনার (ক্ষমতা) ও দেখার (ক্ষমতা) চিরতরে ছিনিয়ে নিতে পারতেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।' (আয়াত ৮-২০)

এই 'ব্যাধিগ্রস্ত' মোনাফেকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের সাথে সাথে আনুষংগিকভাবে তাদের একান্ত আপন লোকদের সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সূরার পূর্বাপর প্রসংগ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা থেকে জানা যায় যে তাদের এই আপন লোক বলতে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এই সূরার পরবর্তী অংশে তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ইহুদীদের ভূমিকা কি রকম ছিলো, সে সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

ইহুদীদের ভূমিকা

মদীনায় পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইহুদীরাই প্রথম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর কারণ ছিলো একাধিক।

প্রথমত, মদীনা ছিলো ইহুদীদের একটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রভূমি। আওস ও খাযরাজ নামক নিরক্ষর আরব গোত্রের মধ্যে তারাই ছিলো আসমানী কেতাবে পারদর্শী একমাত্র শিক্ষিত সমাজ। আরব মোশরেকরা সে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর ধর্মের প্রতি কোনোপ্রকার আকর্ষণ ও আগ্রহ প্রকাশ করেনি–সে কথা সত্য। তবে তাদের কাছে একটা ধর্মগ্রন্থ থাকায় তারা তাদেরকে অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করতো। তাছাড়া আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগেই থাকতো বলে ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ সব সময়ই পেতো। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সে সুযোগ পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা ইসলাম নিজের সংগে একটা গ্রন্থও নিয়ে আসে। সে গ্রন্থ আগেকার সমস্ত আসমানী কেতাবকে সমর্থন করে এবং সেসব গ্রন্থের ওপর নিজেকে অগ্রগণ্য বলে ঘোষণা করে। শুধু কি তাই? আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব কলহ লেগে থাকতো এবং যার সূত্র ধরে ইহুদীরা তাদের মধ্যে ধোঁকাবাজী, প্রবঞ্চনা ও নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা চালাতো, ইসলাম সেই দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটায় এবং আওস ও খাযরাজসহ সমগ্র সমাজকে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে। এর ফলে তারা মক্কা থেকে আগত মুসলিম মোহাজেরদের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। এমনকি আজও মোহাজেরদের দৃষ্টিতে তারা আনসার নামে পরিচিত। ইসলাম এসব মানুষকে নিয়ে সেই মুসলিম সমাজ গঠন করে যার ভেতরকার পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সংহতির কোনো তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে আগেও দেখা যায়নি, পরেও কোথায়ও দেখা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত জাতি এবং রেসালাত ও আসমানী কেতাবের একচেটিয়া উত্তরাধিকারী বলে ভাবতো। তাই সর্বশেষ নবী তাদের মধ্যেই আসবে বলে তারা আশা করতো এবং তারা তার প্রতীক্ষায় ছিলো। কিন্তু সেই নবী যখন আরবদের মধ্য থেকে আবির্ভাব হলেন তখন তারা ভাবলো যে, তিনি ইহুদীদেরকে তার রেসালাতের দায়িত্বের বাইরে বলে বিবেচনা করবেন এবং কেবল নিরক্ষর আরবদের মধ্যেই তাঁর প্রচার সীমিত রাখবেন। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটা হলো। রসূল তাদের কাছেই প্রথম আল্লাহর কেতাবকে পেশ করলেন এবং তা মেনে নেয়ার দাওয়াত দিলেন। কেননা মোশরেকদের চেয়ে তারা শেষ নবী সম্পর্কে অধিক ওয়াকেফহাল ছিলো এবং তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যেই সর্বাধিক থাকার কথা ছিলো। এতে তারা মিথ্যা অভিমান ও অন্যায় আভিজাত্যবোধে আক্রান্ত হয়। তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করায় তারা অপমানবোধ করে এবং দাওয়াত পেশ করাকে তারা রসূলের ধৃষ্টতা বলে গন্য করে।

তৃতীয়ত, মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র ঈর্ষায় জর্জরিত ছিলো। এই ঈর্ষার কারণ ছিলো দু'টো। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর ওপর কেতাব নাযিল করেছেন। অথচ তারা এর সত্যতায় নিসন্দেহ ছিলো। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মদীনার আশেপাশে তাঁর দাওয়াত অতি দ্রুত প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।

এ দু'টো কারণ ছাড়াও তাদের ঈর্ষা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বৈরী ও আগ্রাসী মনোভাবের আর একটা কারণ ছিলো। সে কারণটা হলো, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে মদীনার সভ্য সমাজের ওপর যেভাবে জেঁকে বসেছিলো, তাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত না হলে সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ও সমাজে তাদের কোনঠাসা হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করছিলো। ইসলাম গ্রহণ করা অথবা সামাজিক আধিপত্য হাতছাড়া করা এর কোনোটাই তাদের মনোপুত ছিলো না। তাদের কাছে এ দু'টোই ছিলো সমান অপ্রিয়।

বস্তুত, সূরা বাকারায় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইহুদীদের যে শত্রুতামূলক ভূমিকার বিবরণ দেয়া হয়েছে, এগুলোই তার প্রধান কারণ। (সূরা বাকারা ছাড়া তাদের এ ভূমিকার কথা কোরআনের আরো বহু সূরায় আলোচিত হয়েছে) সূরা বাকারায় এ আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। আমি এখানে তাদের সেই ভূমিকা সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি। তারা তাদের নিজ নবী হযরত মূসার সাথে যে আচরণ করেছিলো, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের ব্যাপারে তারা যে অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলো, তাদের কেতাব ও শরিয়তী বিধানের যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ তারা করেছিলো এবং আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকারকে তারা যেভাবে ভংগ করেছিলো, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর মুসলমানদেরকে তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে–

'আর তাদের কাছে তাদের আগে থেকে পাওয়া কেতাবের সমর্থক হয়ে অন্য একখানা কেতাব এমন সময়ে এলো, যার আগে থেকেই তারা কাফেরদের কাছে তার সত্যতা প্রচার করে আসছিলো। এমতাবস্থায় তাদের পূর্ব পরিচিত কেতাব হওয়া সত্তেও তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। এ সব প্রত্যাখ্যানকারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ। .... আর যখন তাদেরকে বলা হলো, আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বললো, আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা আমরা মানি। আর তার পরে নাযিল হওয়া কেতাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, অথচ যে জিনিসটা তাদের কাছে আছে তার সমর্থক হয়ে একজন রসূল এলো, তখন সেই কেতাবপ্রাপ্তদের একদল আল্লাহর কেতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করলো। ভাবখানা এই যে, তারা সে সম্পর্কে অজ্ঞ। আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মোশরেকরা আদৌ কামনা করে না যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণকর জিনিস নাযিল হোক। .... কেতাবপ্রাপ্তদের অনেকেই তোমাদের মোমেন হওয়ার পর ঈর্ষাবশত নিজেদের কাছে সত্য স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া সত্তেও আবার তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ফেলতে চায়।........ তারা বলে, যারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হবে তারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এসব তাদের বৃথা আশা মাত্র।....... ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মের অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার ওপর কিছুতেই খুশী হবে না। ....।

কোরআনের মোজেযা

কোরআনের একটা চিরস্থায়ী মোযেজা এই যে, বনী ইসরাঈলের যে চরিত্র বৈশিষ্টের বিবরণ সে দিয়েছে সেটা তাদের সর্বকালের সকল বংশধরদেরই চিরন্তন চরিত্র বৈশিষ্ট। এটা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেও যেমন ছিলো, ইসলামের পরেও আমাদের এ যুগ পর্যন্ত রয়েছে। এ কারণে কোরআনে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আমলে তাদেরকে ঠিক এমনভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যেন তারা স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর উত্তরসূরী নবীদের আমলেরই লোক। অতীতের

ইসরাঈলী ও সমসাময়িক ইসরাঈলীদেরকে কোরআন একই বংশধর রূপে বিবেচনা করেছে, কেননা সমসাময়িক ইহুদীদের বৈশিষ্ট ও ভূমিকা অবিকল তাদের পূর্ব পুরুষদের মতই, আর ইসলাম ও পার্থিব জগত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগী কালের বিরাট ব্যবধান সত্তেও অভিন্ন। আলোচ্য সূরায় হযরত মূসার সময়কার ইহুদীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে সহসা মদীনার ইহুদীদের এবং এই উভয় বংশধরের মধ্যবর্তী অন্যান্য সময়কার ইহুদীদের প্রসঙ্গ আলোচনায় যে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, তার কারণ এটাই। সে কারণে কোরআনের বক্তব্য ও ভাষণ চিরন্তন ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কার্যত, সে মুসলিম জাতির আজকের নীতি ও তাদের প্রতি ইহুদীদের দৃষ্টিভংগি ও আচরণ নিয়েই বক্তব্য রেখেছে। ইহুদীরা ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আন্দোলনকে আজ যে চোখে দেখছে আগামী কাল যে চোখে দেখবে এবং অতীতে যে চোখে দেখে এসেছে, তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে, এ জন্যে কোরআনের অপরিবর্তনীয় বক্তব্যকে মুসলিম জাতির প্রতি চিরন্তন হুঁশিয়ারী হিসেবে গন্য করতে হবে। সে হুঁশিয়ারী মুসলিম জাতির সেই চিরস্থায়ী শত্রুদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের সাথে এ যুগের মতই চক্রান্ত ও প্রতারণার মাধ্যমে লড়েছে, লড়েছে রকমারি আকার-আকৃতি অথচ অভিন্ন প্রকৃতির যুদ্ধের মাধ্যমে।

মুসলিম উম্মার পুনর্গঠন

ইহুদীদের এই চরিত্র বৈশিষ্ট বর্ণনা এবং মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বলার সাথে সাথে এ সূরায় মুসলমানদেরকে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈল অনেক আগে থেকেই সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং সর্বশেষে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথ রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, হিজরতের অব্যবহিত পর ইসলামী আন্দোলন যে শ্রেণীর মানুষের সম্মুখীন হয়েছিলো, তাদের বর্ণনা দিয়েই সূরা বাকারা শুরু হয়েছে। এ প্রসংগে ইহুদী নেতাদের শয়তানরূপে অভিহিত করে তাদের চরিত্র বৈশিষ্টের বিস্তারিত বিবরণও দেয়া হয়েছে। বস্তুত, মদীনার ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করতে এই জাতী বিভিন্ন ভূমিকায় সক্রিয় থেকেছে। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গোটা ইতিহাস জুড়েই এই শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অতপর সূরা বাকারা তার প্রধান দু'টো আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার গতি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে। এর বক্তব্যের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝেও একটা একক সুর যে ধ্বনিত হয়েছে এবং তাতে করে সূরার একটা বিশিষ্টতা যে ফুটে উঠেছে তা সুস্পষ্ট।

নিষ্ঠাবান মুসলমান (মোত্তাকীন), অবিশ্বাসী (কাফের) এবং কপট ও বর্ণচোরা মুসলমান তথা ছদ্মবেশী কাফের (মোনাফেক), এই তিন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে সূরায় শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা প্রসংগেই কুচক্রী ইহুদী নেতাদের সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয়েছে। এরপরই সমগ্র মানব জাতির কাছে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করা কেতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে। যারা আল্লাহর এই কেতাবের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দিহান তাদেরকে কোরআনের অনুরূপ একটা সূরা রচনা করার জন্যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। অতপর কাফেদেরকে দোযখের হুমকি এবং মোমেনদের বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কাফেরদের আচরণে কোরআন বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কোরআন বলছে–

'তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা প্রথম মৃত ছিলে তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের আবার মৃত্যু দেবেন। (সর্বশেষে) তিনিই আবার

তোমাদের জীবন দান করবেন এবং এভাবে তোমাদের একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এই পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে তৈরী করেছেন। অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সাত আসমান তৈরীর কাজকে সুষম করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।' (আয়াত ২৮-২৯)

এখানে মানব জাতির জন্যে সমগ্র জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করার কথা প্রসংগে প্রথম মানব আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানোর ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে!

এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব জাতির সাথে শয়তানের চিরন্তন বৈরীতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সব শেষে আল্লাহর বিধানকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের শপথ পাঠ সম্পন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও। (নতুন গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পর), অবশ্যই সেখানে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত কিছু) হেদায়াত আসবে। অতপর যে আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো উৎকণ্ঠা (কিংবা) চিন্তারও কারণ থাকবে না। আর (যারা আমার বিধানকে) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (লাগামহীন জীবনযাপন করবে) তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।' (আয়াত ৩৮-৩৯)

এর পরবর্তী অংশে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে এক দীর্ঘ পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কিছু কিছু আভাস ইংগিত দিয়ে এসেছি। সে পর্যালোচনায় হযরত মূসার আমল থেকেই যে সব ভুল ভ্রান্তি, বিকৃতি শঠতা ও কপটতার তারা আশ্রয় নিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেবার সাথে মাঝে মাঝে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের কেতাবের সমর্থক কোরআনকে মেনে নিতে বলা হয়েছে। সমগ্র 'আলিফ লাম' পারা জুড়ে এ পর্যালোচনা পরিব্যাপ্ত। এ পর্যালোচনা থেকেই বনী ইসরাঈল ইসলাম এবং তার রসূল ও কেতাবকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তার একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। এ থেকে জানা যায় যে, তারাই ছিলো ইসলামকে জেনে শুনে অস্বীকারকারী প্রথম দল। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করতো। তা পালন করতো না। তারা আল্লাহর কালামকে বুঝে বিকৃত করতো।

নিজেদেরকে মোমেন বলে যাহির করে তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতো, কিন্তু নিজেরা পরস্পরে দেখা হলেই পরস্পরকে সাবধান করে দিতো যে মহানবীর নবুওতের সত্যতা সম্পর্কে তারা যে তথ্য জানে তা যেন কেউ মুসলমানদেরকে না জানায়। মুসলমানরা কুফরী অবস্থায় ফিরে যাক এটাই তারা কামনা করতো। এ উদ্দেশ্যে তারা ও খৃস্টানরা দাবী করতো যে, আসল ও সঠিক পথের অনুসারী তো হচ্ছে তারাই। আর তাদেরকে বাদ দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন বলে জিবরাঈলের প্রতিও তারা আক্রোশ প্রকাশ করতে কসুর করতো না। মুসলমানদের কোনো কল্যাণ হওয়াই তারা পছন্দ করতো না এবং সব সময় অপেক্ষায় থাকতো যে, কখন তাদের একটা অঘটন ঘটে। মহানবীর ঘোষিত নির্দেশাবলীতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির যে কোনো সুযোগেরই তারা সদ্ব্যবহার করতো, যেমন কেবলা পরিবর্তনের। তারা মোনাফেকদের অনুপ্রেরণা ও কাফেরদের উৎসাহ যোগাতো।

এ কারণেই সূরা বাকারায় তাদের এসব অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা চালানো হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ও তাদের অন্যান্য নবীর প্রতি তাদের সেই ধরনের নীতি ও আচরণের

কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যে আচরণ তাদের সকল বংশধর সকল যুগেই অব্যাহত রেখেছে এবং তাদেরকে এক অবিচ্ছিন্ন বংশধর এবং অপরিবর্তনীয় ও অশোধনীয় চরিত্র ও প্রকৃতির মানব গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই সমালোচনার উপসংহারে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা কখনো ঈমান আনবে এ আশা যেন তারা পোষণ না করে। কেননা স্বভাবগতভাবেই তাদের সে ইচ্ছাশক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সে যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। এখানে তাদের একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার মুখোশ উন্মোচন করে চূড়ান্ত রায় দেয়া হয়েছে। তারাই হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী, তাদের এই দাবী খন্ডন করে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারী হলো তারা যারা তার নীতি ও বিধান মেনে চলে এবং তিনি আল্লাহর সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার শর্ত পালন করে। সূরায় এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, একদিকে যেমন ইহুদীরা ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে ও আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করেছে এবং সেই বিধানের প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর খেলাফত ব্যবস্থা পুনর্বহালের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং অপরদিকে হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুগামীরা এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন ও তার বাস্তবায়নের তৎপর হয়েছেন তখন ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকার হযরত মোহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের ওপরই এসে বর্তেছে। সূরায় এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুগামীদের হাতে খেলাফতের এই উত্তরাধিকার অর্পণ কা'বা শরীফের স্তম্ভ নির্মাণ কালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়ারই ফলশ্রুতি। সে দোয়া হলো।

'(তারা আরো বললো,) হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার অনুগত মুসলিম বান্দা বানাও। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও। (হে মালিক) তুমি আমাদের তোমার এবাদাতের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ দেখিয়ে দাও। (যদি আমরা এতে কোনো ভুলত্রুটি করি, তাহলে) তুমি আমাদের তাওবা কবুল করো, কারণ তুমিই একমাত্র তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। হে আমাদের মালিক; (আমাদের) এই বংশের মধ্যে এদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি এমন একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে। তাদেরকে তোমার কেতাবের জ্ঞান শিক্ষা দেবে, উপরন্তু সে তাদের পরিচ্ছন্ন করে দেবে। (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দোয়া কবুল করো), কারণ তুমিই শক্তিশালী ও পরম কুশলী।' (আয়াত ১২৮-১২৯)

এই পর্যায়ে এসে মহানবী (স.) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠনকে লক্ষ্য করে নতুন নির্দেশাবলী জারী করা শুরু হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বে নিযুক্ত এই সংগঠনটির জীবন যাপনের বুনিয়াদী শিক্ষা দেয়া আরম্ভ হয়েছে এবং সংগঠনের সুনির্দিষ্ট রূপকাঠামো এবং তার চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে।

ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নতুন কেবলা নির্ধারণ ছিলো এই পর্যায়ের প্রথম কাজ। সে কেবলা হচ্ছে পবিত্র কা'বা। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে এই পবিত্র ঘর নির্মাণের ও তাকে শেরেকের নোংরামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট করতে আদেশ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে এই কেবলার দিকে মুখ ফেরানোর আগ্রহ পোষণ করতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না।

এরপর মুসলিম সংগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে সূরা সামনে অগ্রসর হয়েছে। চিন্তা ও এবাদাতের প্রণালী এবং পারস্পরিক আচরণ ও লেন-দেনের পদ্ধতি এর অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। মুসলিম জামায়াতকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তারা মৃত নয়; বরং তারা চিরঞ্জীব। ভীতি সন্ত্রাস, ক্ষুধা-দারিদ্র ও আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির উদ্দেশ্য মোমেনের অকল্যাণ সাধন করা নয়, বরং তাকে পরীক্ষা করা। যারা এ সব আপদ বিপদে ধৈর্য ধারণ করে তারা আল্লাহর অফুরন্ত করুণা, দয়া ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয় এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দেন। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মোমেনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর কাফেরদের অভিভাবক হলো আল্লাহদ্রোহী শক্তি। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এই সূরায় মোমেনদের জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কিছু হালাল হারামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভালো কাজের বাহ্যিক রূপটাই যে মুখ্য নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত রূপটাই যে মুখ্য, সে কথাও এতে বলে দেয়া হয়েছে। অতপর কেসাসের বিধান, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ওসিয়ত বা উইল করা সংক্রান্ত বিধি, রোযা, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও পারিবারিক বিধি, জেহাদের নিয়ম কানুন, সদকা ও সুদ সংক্রান্ত বিধি এবং ধার লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিমালাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে হযরত মূসার পর বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ ও হযরত ইবরাহীমের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। তবে প্রথম পারার পরবর্তী অংশে প্রধানত মুসলিম দলের সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণ, সংগঠনকে ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর বিধান ও পদ্ধতি অনুসারে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, তার অস্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট আদর্শিক ও চিন্তাগত পদ্ধতি নির্ণয় এবং এত বড় গুরুদায়িত্ব বহনের জন্যে যিনি তাকে মনোনীত করেছেন সেই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক দৃঢ় করা ও ঘনিষ্ঠ করার জন্যে প্রস্তুত করাই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সূরাটির সূচনা ও সমাপ্তির সাদৃশ্য

সব শেষে দেখতে পাই সূরার উপসংহারে এর প্রারম্ভিক বিষয়েরই পুনরুক্তি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা ও দর্শন এবং সকল কেতাব, সকল নবী ও অদৃশ্যের প্রতি মুসলিম জাতির ঈমান আনার ও আনুগত্য করার অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর রসূল সেই বিষয়ের ওপরই ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ নাযিল করা হয়েছে, আর যারা রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও সবাই সেই একই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে। এদের সবাই .... (হে মোমেন ব্যক্তিরা এই বলে তোমরা দোয়া করো) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, জীবনে চলার পথে কোথায়ও যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপরও চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার শক্তি সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, আমাদের তুমি মাফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের (একমাত্র) আশ্রয় দাতা বন্ধু, অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।' (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

এভাবে সূরাটির শেষাংশ ও প্রথমাংশের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে। গোটা সূরার সকল আলোচ্য বিষয় মোমেনদের ও ঈমানের দু'টি গুণ বৈশিষ্টের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

১-২৯ আয়াত তথা প্রথম তিন রুকু জুড়ে বিস্তৃত এই অংশ হচ্ছে কোরআনের এই বিশালকায় ও সর্ববৃহৎ সূরার সূচনা পর্ব। ইহুদীরা ছাড়া অন্য যেসব গোত্র মদীনায় ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে ছিলো এ আয়াতগুলোতে আমরা তাদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট দেখতে পাই। ইহুদীদের সম্পর্কে অবশ্য এখানে একটি ক্ষুদ্র ইংগিত দেয়া হয়েছে। বস্তুত এই ইংগিতটুকুই যথেষ্ট। তাদেরকে 'মোনাফেকদের প্ররোচক শয়তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আখ্যার ভেতরে তাদের বহুসংখ্যক নিকৃষ্ট স্বভাবের আভাস দেয়া হয়েছে এবং তাদের আসল ভূমিকার দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। একটু পরেই এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ আসছে।

এই বৈশিষ্টসমূহ চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে কোরআনের বর্ণনাভংগীর বিচিত্র মহিমা ফুটে উঠেছে। শব্দ এখানে রেখা ও বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। বস্তুত শব্দের মাধ্যমেই চিত্র অংকন দ্রুততর হয়ে থাকে। তারপর এসব চিত্র অতি দ্রুত গতিতে সচল হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন জীবনের রংগমালায় তা সদা আলোড়িত। এখানে সূরার শুরুতে অল্প কয়েকটি শব্দে ও বাক্যে তিন ধরনের মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে। এর প্রতিটি শ্রেণী মানব জাতির বিরাট বিরাট গোষ্ঠীর জীবন্ত নমুনাস্বরূপ। এ নমুনা শুধু জীবন্ত নয় বরং আসল ও মৌলিক, যুগে যুগে ও দেশে দেশে তা বারংবার আবির্ভূত হয়ে থাকে। ফলে মানুষ, যে দেশে ও যে যুগেই জন্ম লাভ করুক না কেন, এই তিন শ্রেণীর বাইরে যেতে পারে না। এটাই হচ্ছে কোরআনের মোজেযা।

উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দে ও মুষ্টিমেয় কয়টি আয়াতে এই চিত্র পরিপূর্ণ রূপে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সে চিত্র শুধু যে স্পষ্ট, তাই নয়, বরং জীবনের স্পন্দনেও স্পন্দিত এবং তার বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট। ফলে যত দীর্ঘ ও বিশদ বিবরণ দেয়া হোক না কেন, এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মত এত দ্রুত বোধগম্য, এত সাজানো গোছানো এবং এত শ্রুতিমধুর বর্ণনা আর হয় না।

আয়াতগুলোতে এই তিন ধরনের মানুষের ছবি তুলে ধরার পর সকল মানুষকে প্রথম শ্রেণীর মানুষে পরিণত হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্যের যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও একমাত্র জীবিকা দাতা। তাঁর শরীক ও সমকক্ষ কেউ নেই। আর যারা রসূল (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে এবং তাঁর কাছে কেতাব নাযিল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, তারা পারলে এর কোনো সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে আনুক। আর তা না পারলে সন্দেহ পোষণের জন্য তাদেরকে কঠোর ও ভয়ংকর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অতপর মোমেনদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য যে চিরস্থায়ী সুখের উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর যেসব ইহুদী মোনাফেক কোরআনে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করায় নাক সিটকাতো এবং এই অজুহাতে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া গ্রন্থ কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতো, তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃত করেন, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা সর্ব জগতের দক্ষ পরিচালক, বিশ্ব নিখিলের কোথায় কি আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে একমাত্র মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করে মানুষকে অনুগৃহীত করেছেন এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যে তাকে নিজের খলীফা ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। সেই আল্লাহকে তারা কিভাবে অস্বীকার করে এবং কিভাবে তাঁর অবাধ্য হয়?

সূরা বাকারার প্রথম তিন রুকুর প্রধান প্রধান বক্তব্যের এই হলো সংক্ষিপ্ত সার। এবার আমরা এই সংক্ষিপ্তসারকে একটু বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

সূরা আল বাকারা

আয়াত ২৮৬ রুকু ৪০

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ

يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٧﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ লা-ম-মী-ম। ২. (এই) সেই (মহা) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে (কোনো) সন্দেহ নেই, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, (এই কেতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক, ৩. যারা না দেখে (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাস করে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমারই নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে, ৪. যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে, (ঈমান আনে) তোমার আগে (নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ৫. (সত্যিকার অর্থে) এ লোকগুলোই তাদের মালিকের (দেখানো) সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম, ৬. যারা (এ বিষয়গুলো) অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো, (কার্যত) উভয়টাই (তাদের জন্যে) সমান (কথা), এরা কখনো ঈমান আনবে না। ৭. (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন মগয ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও (এক ধরনের) আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্যে (পরকালের) কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝৮

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَشْعُرُوْنَ ۝৯ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝১০ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ

قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝১১ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا

يَشْعُرُوْنَ ۝১২ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ

اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝১৩ وَاِذَا لَقُوا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝১৪

রুকু ২

৮. মানুষদের মাঝে কিছু (লোক এমনও) আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে) এরা (মোটেই) ঈমানদার নয়। ৯. (মুখে ঈমানের দাবী করে) এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে, (মূলত এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, যদিও (এ ব্যাপারে) তাদের কোনো প্রকারের চৈতন্য নেই। ১০. (আসলে) এদের মনের ভেতর রয়েছে মারাত্মক) ব্যাধি, (প্রতারণার কারণে) অতপর আল্লাহ তায়ালা (এদের সে) ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পীড়াদায়ক আযাব, কেননা, তারা মিথ্যা বলছিলো। ১১. তাদের যখন বলা হয়, তোমরা (এই শান্তিপূর্ণ) যমীনে অশান্তি (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, না, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী। ১২. (অথচ) এরাই হচ্ছে (যমীনে যাবতীয়) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, যদিও তারা (এ ব্যাপারে) কোনো চৈতন্য রাখে না। ১৩. তাদের যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনিভাবে ঈমান আনো, তারা বলে (হে নবী, তুমি কি চাও), আমরাও নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনি? (আসলে) নির্বোধ তো হচ্ছে এরা নিজেরাই, যদিও তারা (এ কথাটা) জানে না! ১৪. (মোনাফেকদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করছিলাম মাত্র!

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٥ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝١٦

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ

بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝١٧ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا

يَرْجِعُوْنَ ۝١٨ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج يَجْعَلُوْنَ

اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ

بِالْكٰفِرِيْنَ ۝١٩ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط كُلَّمَآ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ قلے

وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ط

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٠

১৫. (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তারা তাদের বিদ্রোহে উদ্ভ্রান্তের ন্যায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৬. এরা (জেনে বুঝে) হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, তাদের এ ব্যবসাটা (কিন্তু) মোটেই লাভজনক হয়নি এবং এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়। ১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আগুন জ্বালাতে চাইলো, যখন তা তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের (এমন) অন্ধকারে ফেলে রাখলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পেলো না। ১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, অতএব এসব লোক (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসবে না। ১৯. অথবা (এদের উদাহরণ হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে (আবার) অন্ধকার, মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক, বিদ্যুত গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আংগুল ঢুকিয়ে রাখে (এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের (সকল দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন। ২০. মনে হয় এখনই বিদ্যুত এদের চোখকে নিষ্প্রভ করে দেবে; (এ আতংকজনক অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা যখন এদের জন্যে একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা সেদিকে চলতে থাকে, আবার যখন তিনি তাদের ওপর অন্ধকার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে (সহজেই) তাদের শোনার ও দেখার (ক্ষমতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُوْنَ ۝٢١ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ

السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٢٢ وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا

بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٢٣

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝٢٤ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ

রুকু ৩

২১. হে মানুষ, তোমরা মহান আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) পয়দা করেছেন, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (যাবতীয় সংকট থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে। ২২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর তোমরা জেনে বুঝে (এ সব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করো না। ২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যে কেতাব নাযিল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও– তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরাও (রচনা করে) নিয়ে এসো, এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে তাদেরও (প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্যে) ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও! ২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না করতে পারো (এবং আমি জানি), তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (দোযখের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করে তাদের জন্যেই (এটা) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ২৫. অতপর যারা (এ কেতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের তুমি (হে নবী) সুসংবাদ দাও এমন এক জান্নাতের, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (এ জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۙ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ
بِهِ كَثِيرًا ۙ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ
تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

সেখানে দেয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। ২৬. (সত্য প্রমাণের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে ওপরে যা কিছু আছে তার উদাহরণ দিতেও লজ্জাবোধ করেন না; যারা (আল্লাহর বাণীতে) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা জানে, এ সত্য আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, আর যারা (আগেই) সত্য অস্বীকার করেছে তারা (একে না মানার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে, আল্লাহ তায়ালা এ উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (আসলে) একই ঘটনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা অনেক লোককে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলেও বহু লোককে তিনি (আবার) এ দিয়ে হেদায়াতের পথও দেখান, আর কতিপয় পাপাচারী ব্যক্তি ছাড়া তিনি তা দিয়ে অন্য কাউকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করেন না। ২৭. (এরা হচ্ছে সে সব লোক) যারা আল্লাহর ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তা ভংগ করে, (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক (-এর ভিত) মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি) যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে; এরাই হচ্ছে (আসল) ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮. তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর (সর্বশেষে) তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং (এভাবেই) তোমাদের একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। ২৯. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে তৈরী করেছেন, অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ط قَالُوٓا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَن يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ط قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (৩০) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ أَنْۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ (৩১)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ (৩২) قَالَ يٰٓاٰدَمُ أَنْۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ أَنْۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (৩৩) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ

রুকু ৪

৩০. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক (তাঁর) ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি এমন কাউকে (খলীফা) বানাতে চাও যে (তোমার) যমীনে (বিশৃংখলা ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) তারা রক্তপাত করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। ৩১. আল্লাহ তায়ালা অতপর (তাঁর খলীফা) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো? ৩২. ফেরেশতারা বললো (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো; তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কুশলী। ৩৩. আল্লাহ তায়ালা (এবার) আদমকে বললেন, তুমি তাদের কাছে তাদের নামগুলো বলে দাও, অতএব আদম (আল্লাহর নির্দেশে) তাদের (সামনে) তাদের নামগুলো যখন (সুন্দরভাবে) বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় না দেখা বস্তু জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো আমি তাও ভালোভাবে জানি। ৩৪. আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা (সম্মানের প্রতীক হিসেবে) আদমের জন্যে সাজদা করো, অতপর তারা (আল্লাহর আদেশে) আদমের সামনে সাজদা করলো– শুধু ইবলীস ছাড়া; সে

إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

সাজদা করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো এবং সে না-ফরমানদের দলে শামিল থেকে গেলো। ৩৫. আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এ (নেয়ামত) থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার করো, তোমরা এ গাছটির পাশেও যেও না, তা (না) হলে তোমরা (দুজনই) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। ৩৬. (কিন্তু) শয়তান (শেষ পর্যন্ত) সেখান থেকে তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো, তারা উভয়ে (বেহেশতের) যেখানে ছিলো সেখান থেকে সে তাদের বের করেই ছাড়লো, আর আমি তাদের বললাম, তোমরা একজন আরেক জনের দুশমন হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমাদের (পরবর্তী) বাসস্থান (হবে) পৃথিবী, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্যে জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ থাকবে। ৩৭. অতপর আদম তার মালিকের কাছ থেকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি বড়ো মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। ৩৮. আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে অবশ্যই সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) হেদায়াত আসবে, অতপর যে আমার (সেই) বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো প্রকার উৎকণ্ঠাও করবেনা। ৩৯. আর যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন (করে লাগামহীন জীবন যাপন) করবে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

তাফসীর

আয়াত ১-৩৯

'আলিফ, লাম-মীম,' এই তিনটি হচ্ছে 'হুরুফে মোকাত্তায়াত' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অক্ষরসমূহ এগুলো দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। আর এর পরই আল্লাহর কেতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'এই সেই কেতাব যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ নির্দেশিকা।'

কোরআনের কয়েকটি সূরায় এ ধরনের বিক্ষিপ্ত বর্ণমালার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর ব্যাখ্যা নানাভাবে করা হয়েছে। তন্মধ্যে আমি একটি ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি। সেটি এই যে, এ দ্বারা ইংগিত এ কথাই বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থ এই সব বর্ণমালা দিয়েই লিখিত, যা আরব শ্রোতাদের নাগালের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি এমন এক অলৌকিক গ্রন্থ, যার সমতুল্য কোনো গ্রন্থ এই একই বর্ণমালা দিয়ে তারা রচনা করতে সক্ষম নয়। এই গ্রন্থ তাদেরকে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, যাও এর মত দশটি সূরা বা নিদেন পক্ষে একটি সূরাই রচনা করে আনো। কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জের কেনো জবাব পর্যন্ত দিতে পারেনি।

মানুষের এই অপারগতা শুধু আল্লাহর কেতাবের সমকক্ষ আয়াত বা সূরা রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টিতেই ব্যাপৃত। সকল জিনিসের ক্ষেত্রেই আল্লাহর কারিগরী ও মানুষের কারিগরীতে এই পার্থক্য বিদ্যমান। মাটি যে সব অণু পরমাণু দিয়ে তৈরী, তার গুণাগুণ সবারই জানা। কিন্তু সে অণু পরমাণুগুলো দিয়ে মানুষ একটি খুঁটি, একটি পাত্র একটি দ্রব্য এমনকি একটি ইটও বানাতে সক্ষম হবে না। অথচ অতুলনীয় মৌলিক সৃজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মহান আল্লাহ তায়ালা সেই অণু পরমাণুগুলো থেকেই সৃষ্টি করেন স্পন্দনশীল সচেতন জীবন। এই জীবনই হলো আল্লাহর সেই রহস্যময় সৃষ্টি, যা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তার রহস্য উন্মোচন করাও মানুষের সাধ্যাতীত। কোরআনও ঠিক তদ্রূপ। পরিচিত কতিপয় অক্ষর ও শব্দ। তা থেকে মানুষ রচনা করে কিছু বাক্য ও ছন্দবদ্ধ কবিতা। আর আল্লাহ তায়ালা রচনা করেন কোরআন ও সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী গ্রন্থ। নির্জীব দেহ ও সজীব প্রাণ সৃষ্টিতে যে পার্থক্য, প্রচলিত আরবী বর্ণমালা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোন কিছু রচনা করা আর মানুষ কর্তৃক কোন কিছু রচনা করাও রয়েছে সেই একই পার্থক্য। কল্পনার জীবনে ও আসল জীবনে যে ব্যবধান, এখানেও সেই একই ব্যবধান বিদ্যমান।

আল কোরআন- মোত্তাকীদের পথ নির্দেশিকা

'এই সেই কেতাব, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

কোথা থেকে আসবে সন্দেহ সংশয়? অথচ তাদের জানা চেনা অক্ষর মালা দিয়ে কোরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় তাদের অক্ষমতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই কেতাব সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্দ্ধে এবং সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহরই রচিত কেতাব। এরপর বলা হয়েছে এই কোরআন হলো- 'মোত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশিকা।'

বস্তুত, সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানদাতা হওয়াই এ কেতাবের আসল পরিচয়। এটাই তার স্বভাব ও প্রকৃতি। তবে এটি কার জন্যে? কার জন্যে কোরআন হেদায়াতকারী ও পথ নির্দেশক, কার জন্যেই বা সে আলোক বর্তিকা শুভাকাংখী ও শুভানুধ্যায়ী? এর জবাব এই যে, একমাত্র মোত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য। হৃদয়ে তাকওয়ার উপস্থিতিই মানুষকে এই গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত

হবার যোগ্য বানায়। এই তাকওয়াই তার মনমগযের গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়, অতপর তার অভ্যন্তরে কোরআনের প্রবেশ ও ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেয়। তাকওয়াই হৃদয়কে কোন কিছু গ্রহণের ও সাড়া দেয়ার যোগ্যতা দান করে।

যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়াত তথা সত্যের সন্ধান পেতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই কলুষ মুক্ত নির্মল ও খালেস মনে তা অধ্যয়ন করতে হবে। গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সদা সতর্ক, এমন একটা মন নিয়ে কোরআন পড়তে হবে। তা হলেই কোরআন তার রহস্য উন্মোচন ও তার আলোক বিকিরণের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। এই ভীরু, সতর্ক, সচেতন, সংবেদনশীল এবং উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত হৃদয়কেই কোরআন স্বীয় নূর ও হেদায়াত দ্বারা ভরে দেয়। হযরত ওমর (রা.) একবার হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাকওয়া কী?' হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) জবাব দিলেন, 'আপনি কি কখনো কন্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেনে, হাঁ। হযরত উবাই (রা.) বললেন, কিভাবে চলেছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'কাপড় চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে চলেছি।' হযরত উবাই বললেন, 'ওটাই তো তাকওয়া।'

বস্তুত, বিবেকের সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও সতর্কতা, চেতনা ও অনুভূতির স্বচ্ছতা, অব্যাহত ভীতি, নিরবিচ্ছিন্ন সাবধানতা, জীবন পথের কন্টকসমূহ থেকে আত্মরক্ষার প্রবণতা-এ সবেরই নাম তাকওয়া। জীবন পথের এই কাঁটাগুলো হচ্ছে প্রবৃত্তির কুৎসিত কামনা বাসনা ও প্ররোচনা। অন্যায় লোভ লালসা ও উচ্চাভিলাস, ভয় ভীতি ও শংকা, আশা পূরণে সক্ষম নয় এমন কারো কাছে মিথ্যা আশা পোষণ করা ক্ষতি বা উপকার সাধনে সক্ষম নয় এমন কারো মিথ্যা ভয়ে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি।

এরপর মোত্তাকী বা আল্লাহভীরুদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু মদীনায় যারা ঈমান আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের নয় বরং সর্বকালের সকল নিষ্ঠাবান মোমেনের গুণাবলী এ রকমই হয়ে থাকে।

'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তোমার ওপর ও তোমার পূর্বে নাযিল করা কেতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনে সর্বোপরি আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে।'

মোত্তাকীদের বৈশিষ্ট

মোত্তাকীদের প্রথম গুণটি হলো সক্রিয় ও ইতিবাচক চেতনাগত ঐক্য। এই ঐক্যই তাদের মনে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা, ফরয কাজসমূহ সম্পাদন করা, সকল নবী রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই পরিপূর্ণতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা একমাত্র ইসলামী আকীদা ও এ আকীদায় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট। বস্তুত শেষ নবীর মাধ্যমে আগত যে সর্বশেষ আকীদা ও আদর্শের ওপর সমগ্র মানব জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া কাম্য, যে আকীদা ও আদর্শের সমগ্র মানবজাতির ওপর কর্তৃত্বশীল হওয়া কাংখিত সে আকীদা অবশ্যই এমন হতে হবে যার উপর মানব জাতি স্বীয় আবেগ অনুভূতি ও জীবন পদ্ধতি সহকারে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম, সেই আকীদা ও আদর্শের এরূপ পূর্ণাংগ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতোটা পূর্ণাংগ হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন চেতনা ও কাজ এবং ঈমান ও আমল সবই তার আওতায় এসে যায়।

আমরা মোত্তাকীদের এই প্রথম গুণটির বিশদ বিবরণ দেয়া যখন শুরু করি এবং এই গুণটি থেকে উৎপন্ন এর প্রতিটি পৃথক পৃথক একককে যখন পর্যবেক্ষণ করি, তখন তা সমগ্র মানব জাতির জীবনে কতিপয় মৌলিক মূল্যবোধের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।'

অর্থাৎ যা দেখা যায় না, শোনা যায় না এবং অংগ প্রত্যংগ দ্বারা অনুভব করা যায় না, তার প্রতি ঈমান আনে। ফলে ইন্দ্রিয়ের বাধা তাদের আত্মা এবং যে মহান শক্তি দ্বারা এসব আত্মা ও এই সৃষ্টি জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে তার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অনুরূপভাবে, ইন্দ্রিয়ের বাধা তাদের আত্মা এবং সকল ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি, বস্তু ও তত্ত্বের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

অদৃশ্যে বিশ্বাস এমন একটি জিনিস, যা অর্জন করার পর মানুষ পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে মনুষত্বের স্তরে উন্নীত হয়। এই দুটি স্তরের মাঝে ব্যবধান অনেক। পশু তার পশু-ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করে, তার বাইরে কিছুই উপলব্ধি করে না। পক্ষান্তরে মানুষ এ কথা বোঝে যে, পশু ইন্দ্রিয় বা পশু ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আওতায় যে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিমন্ডল বিরাজ করে, তার তুলনায় সৃষ্টি জগত অনেক বড় ও বিশাল। এটা আসলে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা জগতে একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এ দ্বারা সে গোটা সৃষ্টি জগত, নিজ সত্তার এবং এই বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর প্রকৃত রহস্য উপলব্দি করতে পারে। বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতের অন্তরালে বিরাজমান ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনাকেও সে অনুভব করতে পারে। মানুষের পার্থিব জীবনেও তা সদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যক্তি নিছক নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতাধীন সীমিত পরিসরে জীবন যাপন করে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হতে পারে না, যে স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা পরির্দৃষ্ট বৃহত্তর জগতে অবস্থান করে এবং স্বীয় অন্তরাত্মা দ্বারা গভীরভাবে তার প্রতিধ্বনি ও ইশারা ইংগিত অনুধাবন করে। সে বুঝতে পারে যে, তার এই সীমিত জগতের পরিসর সময় ও স্থানের বিচারে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত ও ব্যাপক। সে এ কথাও বুঝতে পারে যে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের বাইরে সৃষ্টিজগতের চেয়ে বড় এবং তা থেকেই সে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই মহাসত্য হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর সত্তা, যাকে চক্ষু দিয়ে দেখাও যায় না এবং বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সঠিকভাবে উপলব্ধিও করা যায় না।

এই মহান সত্তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার জন্য মানুষের চিন্তা শক্তিকে সৃষ্টি করা হয়নি। তাঁকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই ব্যক্তি মানুষকে দেয়া হয়নি, আর চিন্তাশক্তিকে এ কাজে ব্যয় করে কোনো লাভও নেই। বরঞ্চ এ কাজে ব্যয় করলে চিন্তাশক্তি ছিন্ন ভিন্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তার চিন্তা শক্তিকে এই নিষ্প্রয়োজন কাজে নিয়োজিত করা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বস্তুত মানুষকে যে চিন্তা শক্তি দান করা হয়েছে, তা শুধু পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্যই দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রধানত নিকটতর পার্থিব জীবনের ব্যাপারেই দায়ী। এই নিকটবর্তী বাস্তব জীবনের তত্ত্বাবধান করা তাকে গভীরভাবে ও সর্বাত্মকভাবে পর্যবেক্ষণ করা, তাঁর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা ও উৎপাদন করা এবং পার্থিব জীবনকে উন্নত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করা তার দায়িত্বের আওতাভুক্ত। তবে এ দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে সেই আত্মিক শক্তির সম্মতি ও সমর্থন ক্রমে, যা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বজগত তার স্রষ্টার সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে, আর যে অদৃশ্য জগত তার বিবেকের আওতা বহির্ভূত, সেই অদৃশ্য জগত সংক্রান্ত জ্ঞানের যেটুকু তার অজানা, তা নিয়ে মাথা ঘামানো পরিত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর জীবন ও তার পরিবেশের প্রভাব দ্বারা সীমিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা অপার্থিব ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রজ্ঞা ও খোলা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ছাড়া বুঝার চেষ্টা এবং অদৃশ্য জ্ঞানের যে অংশ বিবেকের আওতা বহির্ভূত, তাকে বুদ্ধি বিবেক

দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রথমত ব্যর্থ, দ্বিতীয়ত, নিরর্থক ও বৃথা প্রয়াস মাত্র। ব্যর্থ এ জন্য যে, এই চেষ্টায় যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়, তাকে এই উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি। আর বৃথা এই জন্য যে, এ ধরনের চেষ্টা মানুষের বোধশক্তির বিনাশ ও অপচয় ঘটায়। কেননা এই বিবেক বা বোধশক্তি এই কাজের জন্য সৃজিত নয়। মানুষের বিবেক যখন এই স্বতসিদ্ধ প্রথম সত্যটি মেনে নেয় যে, সসীম কখনো অসীমকে হৃদয়ংগম করতে পারে না, তখন নিজের যুক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর খাতিরেই তাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় যে, অসীমকে উপলব্ধি করা তার পক্ষে অসম্ভব। সেই সাথে তাকে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, অজানাকে সে জানেনা বা বুঝে না বলে অদৃশ্যের গোপন জগতে সে জিনিসের অস্তিত্বই নেই একথা বলা যায় না। তাই উচিত হলো, অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কে বিবেক বুদ্ধির কাছে নয়, অন্য কোনো হাতিয়ারের কাছে সমর্পণ করতে হবে। এই জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে দৃশ্য অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু যার মুঠোর ভেতরে সেই অসীম জ্ঞান ও অফুরন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী মহান আল্লাহর কাছ থেকে। বিবেকের এই স্বতসিদ্ধ যুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন একমাত্র মোমেনরই কৃতিত্ব এবং মোত্তাকী তথা পরহেযগার লোকদের অন্যতম সদগুণ।

পাশবিকতার স্তর থেকে উর্ধে আরোহণে মানুষের সিঁড়ি হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস। এখান থেকেই মানুষ ও পশুর জীবন পথ আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু অতীতের বস্তুবাদীদের মতো এ যুগের বস্তুবাদীরাও মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চায়। তাদেরকে পশুত্বের জগতে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে ইন্দ্রিয়াতীত জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আর এ না করাটাকেই তারা 'প্রগতি' নামে আখ্যায়িত করে। অথচ এটা হচ্ছে অধোগতি। মহান আল্লাহ তায়ালা আপন মোমেন বান্দাদেরকে এই অধোগতি থেকে রক্ষা করেছেন। তাই 'অদৃশ্যে বিশ্বাস' নামক গুণে তাদেরকে গুণান্বিত ও বৈশিষ্টমন্ডিত করেছেন। আল্লাহর এই নেয়ামতের জন্য আমরা তাঁর শোকরিয়া জানাই। আর অধোগতি তাদের জন্যই নির্ধারিত হোক, যারা অধোপতনই কামনা করে।

'এবং নামায কায়েম করে'

নামাযের মধ্য দিয়ে তারা এই আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্যের বহিপ্রকাশ ঘটায়। এর দ্বারা তারা বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির পূজার উর্ধে ওঠে। অসীম শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিকে মুখ ফেরায় এবং কোনো বান্দার সামনে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নোয়ায়। আর যে ব্যক্তি খালেছ মনে আল্লাহর জন্য সেজদা করে এবং দিবারাত্র এভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সে বুঝতে পারে যে সে স্বয়ং আল্লাহর সাথে অটুট সম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহের চাইতে অনেক উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপৃত হয়। সে স্বয়ং স্রষ্টার সাথে সংযোগ রক্ষা করে বিধায় নিজেকে অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে শক্তিশালী মনে করে আর এসবই হচ্ছে বিবেকের শক্তির উৎস। এগুলো তাকওয়া তথা সংযম ও পরহেযগারীরও উৎস এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এভাবে নামায মোমেনের চিন্তা-চেতনা ও আচরণকে সর্বতোভাবে আল্লাহমুখী বানিয়ে দেয়।

'আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে দান করে'

তারা প্রথমেই স্বীকার করে নেয় যে, তাদের ধন সম্পদ যা কিছু আছে তা তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর সম্পদ, তাদের নিজেদের সৃষ্টি করা সম্পদ নয়। আর এই স্বীকৃতি থেকে সৃষ্টি হয় আল্লাহর দুর্বল ও অভাবী বান্দাদের প্রতি বদান্যতা, আল্লাহর পরিবার হিসাবে আখ্যায়িত গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংহতি ও একাত্মতা এবং মানবীয় সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের চেতনা, আর এই সকল জিনিসের প্রকৃত তাৎপর্য ফুটে ওঠে হিংসাবিদ্বেষ থেকে আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে, আর বদান্যতা ও

দানশীলতা দ্বারা প্রবৃত্তির শুদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়েও এ বিষয়টি ফুটে ওঠে। এই স্বীকৃতি মানব জীবনকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের ময়দানে পরিণত করে, দুর্বল ও অক্ষমকে নিরাপত্তা দান করে এবং নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার পরিবর্তে সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের ময়দানে পরিণত করে, দুর্বল ও অক্ষমকে নিরাপত্তা দান করে এবং নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার পরিবর্তে স্নেহ প্রীতি দয়া ও মমতার পরিবেশে তাদের জীবন যাপন নিশ্চিত করে।

'ইনফাক' তথা দান করা বলতে যাকাত ও সদকাকে বুঝায়। জনকল্যাণে যা কিছুই ব্যয় করা হয়, তার সবই এর আওতাভুক্ত। যাকাত ফরয হবার আগেই সাধারণ দান-সদকার বিধান প্রবর্তিত হয়েছিলো। পরে যাকাত একটা স্বতন্ত্র বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ দান-সদকাও এর পাশাপাশি চালু থাকে। রসূল (স.) বলেছেন, 'মানুষের ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াত যাকাত ফরয হওয়ার আগেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই এই আয়াতে যাবতীয় দান-সদকা অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতে সে কথাই বুঝানো হয়েছে।

'আর যারা তোমার ওপর এবং তোমার পূর্বে নাযিলকরা ওহীর ওপর ঈমান রাখে।'

এটা মুসলিম উম্মাহর যথোপযুক্ত গুণ। মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে মানব জাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল থেকেই আসমানী আকীদা-বিশ্বাস ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারী, ঈমান ও নবুওয়তের ঐতিহ্যবাহী অমূল্য সম্পদের সংরক্ষক এবং কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল যুগের মোমেনদের বিশাল কাফেলার তারা নেতা ও পথ প্রদর্শক। আর এই গুণ বৈশিষ্টের বদৌলতে তারা মানব জাতির বৃহত্তর ঐক্যে বিশ্বাসী, সকল নবীর প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং সমগ্র মানব জাতির একই মাবুদে আস্থাশীল। এ গুণটির অধিকারী হওয়ায় মোমেনদের অন্তরাত্মা বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকে, যতক্ষণ সে সঠিক পথে চলতে থাকে। এই গুণের ধারকরা এ কথা বুঝতে পেরে পরম পরিতৃপ্ত ও আশ্বস্ত থাকে যে, আল্লাহ্ তায়ালা সকল যুগের ও সকল প্রজন্মের মানব জাতির রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। একই ধর্ম ও একই পথ নির্দেশিকা দিয়ে ক্রমাগতভাবে নবী ও রসূলদের প্রেরণের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই চিরন্তন তত্ত্বাবধানের সাক্ষর রেখেছেন। উক্ত গুণ বৈশিষ্টের ধারক বলেহ মুসলিম উম্মাহ্ এমন এক আদর্শে সমুজ্জল, যা যুগ-যুগান্তরের শত আবর্তনেও অটল ও অবিচল থাকে, নিকষ কালো অন্ধকারে দিকদর্শক নক্ষত্র যেমন স্থির নিশ্চল থাকে এবং সঠিক অবস্থাও মূলত তাই।

'আর তারা আখেরাতেও সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।'

এটা হচ্ছে আল্লাহভীরুদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্টটি ইহকালকে পরকালের সাথে যুক্ত করে দেয়। এটি কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে সমন্বিত করে। এ বৈশিষ্টটি মানুষকে এই চেতনা দান করে যে, সে নিরর্থক বৃথা ও নিষ্ফল সৃষ্টি নয়, তাকে তার কর্মফল না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় তার অপেক্ষায় রয়েছে। এই আশ্বাস এই জন্য দেয়া হয়, যেন তার মন প্রশান্তি লাভ করে ও নিশ্চিন্ত হয়, সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর ন্যায় বিচার ও করুণার প্রতি আস্থাশীল হয়।

যারা ইন্দ্রিয়ের সীমিত গন্ডির মধ্যে বসবাস করে এবং যারা বিশাল সৃষ্টি জগতের প্রশস্ত অংগনে অবস্থান করে, আখেরাত বিশ্বাস হচ্ছে উক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সীমারেখা। যারা দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু মনে করে, আর যারা দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষার জায়গা মনে করে এবং সীমিত ও সংকীর্ণ এই পার্থিব জীবনের অপর পারেই প্রকৃত জীবন বিরাজ করছে বলে বিশ্বাস করে উক্ত দুই ধরনের মানুষের মধ্যে এই আখেরাত বিশ্বাসটাই আসলে বিভক্তি রেখা টেনে দেয়।

উল্লেখিত গুণ ও বৈশিষ্ট কয়টির প্রত্যেকটিই মানুষের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এগুলো মোত্তাকী বা সৎ লোকদের গুণ বৈশিষ্ট। এই গুণ বৈশিষ্টগুলোর মাঝে পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিরাজমান। আখেরাত বিশ্বাসই এই গুণ বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ ও সুসমন্বিত ঐক্য গড়ে তোলে। বস্তুত তাকওয়া হলো বিবেকের সচেতনতা, তাকওয়া হলো চেতনার এমন একটি.অবস্থার নাম, যা থেকে চিন্তা ও কর্মের উন্মেষ ঘটে, যার সাহায্যে মনের বিভিন্ন আবেগ ও বাহ্যিক অংগ প্রত্যংগের বিভিন্ন তৎপরতার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে এবং যার সাহায্য পেয়ে মানবাত্মা মানুষের আরো নিকবর্তী ও ঘনিষ্ঠ হয়। ফলে আত্মার সাথে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের আড়াল ঘুচে যায়, দূরত্ব হ্রাস পায় এবং জানা ও অজানা সব এসে এক জায়গায় মিলিত হয়। যখন আত্মা ঘনিষ্ঠ হয় এবং যাহের ও বাতেন (গোপন ও প্রকাশ্য) এর পর্দা অপসৃত হয় তখন গায়েব তথা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আসল গায়েবের সাথে আত্মার সম্মিলন, পরিতৃপ্তি লাভ এবং পর্দা অপসারণের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই দেখা দেয়। তাকওয়া ও গায়েবের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহর মনোনীত পন্থায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসাবে তাঁর এবাদাত করা, আল্লাহর দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্রের প্রতি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে, নিজ সম্পদের একাংশ দান করা, অতীতের সকল মোমেন জাতিসমূহের প্রতি বিবেকের ঔদার্য প্রদর্শন এবং প্রত্যেক নবীর নবুওয়ত ও মোমেনের সাথে আত্মীয়সুলভ সম্পর্কের অনুভূতি ও আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস এসব বৈশিষ্ট মিলিত হয়ে তৎকালীন মদীনার মুসলিম দলের নিখুঁত ছবি তুলে ধরে। সে দলটি ছিলো ইসলামের দিকে প্রথম ধাবিত হওয়া আনসার ও মোহাজেরদের দ্বারা গঠিত। এসব গুণ বৈশিষ্টে সমৃদ্ধ হয়ে সে দলটি হয়ে উঠেছিলো এক অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ দল। এই ঈমানী উপাদানটি তার মধ্যে যথার্থই মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা এই দলের দ্বারা পৃথিবীতে ও সমগ্র মানব জাতির জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত করেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে,

মোত্তাকীদের সফলতা

'তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া তারা সরল সঠিক পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।'

এভাবেই তারা সরল সঠিক পথ পেয়েছে, এভাবেই সফলকাম হয়েছে। হেদায়াত ও সাফল্য লাভের পথ হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত ও নির্দেশিত ঈমানী গুণাবলী অর্জনের পথ।

'আর যারা (এ বিষয়গুলোকে) অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো(কার্যত) উভয়টাই (তাদের জন্যে) সমান, এরা কখনো ঈমান আনবে না। (এভাবে কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন মগয ও শ্রবণ শক্তির ওপর সিল মেরে দিয়েছেন। (আসলে এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও) আবরণ পড়ে আছে। এই ধরনের লোকদের জন্যে কষ্টদায়ক এক ভীষণ শাস্তি রয়েছে।' (আয়াত ৬-৭)

কাফেরদের পরিচয়

দ্বিতীয় যে ছবিটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো কাফেরদের ছবি। সর্বকালের ও সকল দেশের কুফরীর বৈশিষ্ট এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এখানে আমরা মোত্তাকীদের ছবি ও কাফেরদের ছবি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দেখতে পাই। কোরআন যখন নিজেই মোত্তাকীদের জন্য হেদায়াতস্বরূপ, তখন ভীতি প্রদর্শন করা হোক বা না

হোক, কাফেরদের জন্য তা একই রকম নিস্ফল ও বৃথা। কেননা মোত্তাকীদের মন-মগজের জানালাগুলো খোলা আর কাফেরদের তা রুদ্ধ। যে রজ্জু তাদেরকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শক্তিগুলোর সাথে এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যের সাথে সংযুক্ত করে, মোত্তাকীদের ক্ষেত্রে তা বহাল এবং কাফেরদের ক্ষেত্রে তা ছিন্ন।

'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন।'

বস্তুত সিল মেরে বন্ধ করে দেয়ার কারণে হেদায়াতের কোনো ধ্বনি বা কোনো প্রতিধ্বনি তাতে ঢুকতে পারে না।

'আর তাদের চোখের ওপর (পড়ে আছে) পর্দা।'

এ কারণে চোখে কোনো হেদায়াতের আলো প্রতিফলিত হয় না। আসলে হেদায়াত ও ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টাকে স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করার যথোপযুক্ত শাস্তি হিসাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছেন। এ কারণে ভীতি প্রদর্শন করা ও না করা তাদের জন্য সমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বস্তুত হৃদয় ও কানে সিল মারা ও চোখে পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়ার মতো কঠোর কাজটি যখন করা হয়, তখন তার মধ্য দিয়ে একটা জমাট ও অন্ধকারময় ছবি অংকিত হয়ে যায়।

'আর তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।'

আসলে গোয়ার্তুমিতে পরিপূর্ণ কুফরির এটাই স্বাভাবিক পরিণাম। কোনো ভীতি প্রদর্শনেই কাজ হবে না, বরং ভীতি প্রদর্শন করা ও না করা উভয়ই সমান প্রমাণিত হবে এ কথা আল্লাহ তায়ালা তাদের একগুঁয়ে স্বভাবের প্রেক্ষিতে জানতেন। তাই তার পক্ষ থেকে এই চূড়ান্ত শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর আমরা তৃতীয় ছবি বা নমুনার দিকে অগ্রসর হবো। এ ছবিটি প্রথম ছবিটির মতো স্বচ্ছ ও উদার নয় আবার দ্বিতীয়টির মতো বদ্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্নও নয়, এটি বিভিন্ন রূপে অনুভূত হয়, দৃষ্টি শক্তিকে ধোঁকা দেয়, কখনো উধাও হয়ে যায়, আবার কখনো স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। এটা হচ্ছে মোনাফেকদের ছবি,

কিন্তু সত্যিকার অর্থে (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে) এরা মোটেই ঈমানদার নয়, (মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে) এরা আল্লাহ ....বিনিময়ে গোমরাহীর পথকে কিনে নিয়েছে, এই (বেচাকেনার) ব্যবসায় এরা কিন্তু মোটেই লাভ করতে পারেনি–এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়। (আয়াত ৮-১৬)

মোনাফেকদের পরিচয়

এটি ছিলো প্রাথমিকভাবে মদীনার মোনাফেকদের বাস্তব চিত্র। কিন্তু আমরা যদি স্থান ও কালের গন্ডী অতিক্রম করি তাহলে দেখবো সকল যুগের সকল মানব প্রজন্মে এটি একটি বহুল পুনরাবৃত্ত ঘটনা। আমরা মোনাফেকদের এই শ্রেণীটিকে আজো সমাজের উচ্চতর আসনে আসীন দেখতে পাই। সত্যকে নিসংকোচে মেনে নেবার মতো সৎসাহস তাদের নেই, আবার খোলাখুলিভাবে তাকে অস্বীকার করার দুঃসাহসও তাদের নেই। আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে ওপরে তাদের একটা স্থানও চাই। তাই আমি কোরআনের এই জাতীয় বক্তব্যগুলোকে ঐতিহাসিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত মনে করার পক্ষপাতী নই। এগুলোকে আমি যে কোনো প্রজন্মের মোনাফেক শ্রেণীর সাথে এবং সকল যুগের সকল মানুষের স্থায়ী প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করি।

এই শ্রেণীটি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী বলে নিজেদেরকে ঠিকমতোই যাহির করে। কিন্তু আসলে তারা তা নয়, তারা হচ্ছে মোনাফেক। তারা সত্যকে অস্বীকার করা ঠিকমতোই মোমেনদেরকে নয়, বরং আল্লাহকেই ধোঁকা দেয় বা দেবার চেষ্টা করে।

'তারা আল্লাহ তায়ালা ও মোমেনদেরকে ধোকা দেয়।'

এই উক্তিতে এবং অনুরূপ অন্যান্য উক্তিতে আমরা একটা মহাসত্যের সন্ধান পাই। আল্লাহর একটা বিরাট অনুগ্রহেরও সাক্ষাত পাই। এ মহাসত্যটি আসলে শুধু এখানেই নয়, বরং সর্বত্র ও সব সময় কোরআন এটি ব্যক্ত করে থাকে। এ মহাসত্যটি হলো আল্লাহ তায়ালা ও মোমেনদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে আল্লাহ তায়ালা এতো নিকটবর্তী ও এতো ঘনিষ্ঠ আকারে চিত্রিত করেন যে, তাদের অবস্থানকেই তিনি নিজের অবস্থান এবং তাদের পরিস্থিতিকেই নিজের পরিস্থিতি বলে অভিহিত করেন। মোমেনদেরকে তিনি নিজের কাছে টেনে নেন, তাদেরকে তাদের সকল দায় দায়িত্বসহ নিজের কুদরাতি হাতে তুলে নেন, তাদের দুশমনকে তিনি নিজের দুশমনে পরিণত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকে তিনি নিজের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। এটা তার পরম অনুগ্রহ ও মহান সখ্যতা। এই সখ্যতা দ্বারা তিনি মোমেনদের মর্যাদা এত উন্নীত করেন যে, এর ফলে মনে হতে থাকে যে, ঈমান হচ্ছে এ বিশ্বজগতে সবচেয়ে মহীয়ান ও গরীয়ান সত্য। এর ফলে মোমেনের মনে আসে সীমাহীন সান্ত্বনা ও প্রবোধ। কেননা সে দেখতে পায় যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি এতো একাত্মতা প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার সমস্যাকে নিজের সমস্যা, তার যুদ্ধকে নিজের যুদ্ধ এবং তার শত্রুকে নিজের শত্রু-রূপে গ্রহণ করেছেন। তাকে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে স্থান দিয়েছেন। কাজেই বান্দাদের তুচ্ছ ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, প্রতারণা ও যুলুম তার কী ক্ষতি করবে?

বিষয়টি একদিকে যেমন মোমেনদের জন্য প্রবোধ, অপরদিকে তেমিন মোমেনদের প্রতারণা, চক্রান্ত ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করতে ইচ্ছুকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকিও বটে। এ দ্বারা তাদেরকে শাসানো হচ্ছে যে, মোমেনদের ওপর তারা যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, তাতে মোমেনরা একা নয় বরং তাদের সাথে রয়েছেন মহাশক্তিধর, মহা প্রতাপশালী ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজে। আল্লাহর বন্ধুদের সাথে লড়াই করতে হলে তাদেরকে খোদ আল্লাহর সাথে লড়াই করতে হবে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাদেরকে খোদ আল্লাহর শত্রুতা ও প্রতিরোধের ঝুঁকি কাঁধে নিতে হবে।

'যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে।'

যারা একথা বলে 'আল্লাহকে ও মোমেনদেরকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে এবং নিজেদেরকে অতিমাত্রায় চতুর ও ধড়িবাজ ভাবে, তাদের এ ধারণা ও আত্মতৃপ্তি ভাগ্যের একটি পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। আয়াতের শেষাংশে এই পরিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে এই বলে যে,

'তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে প্রতারিত করে না, তবে তারা এটা বুঝতে পারে না।' তারা এত নির্বোধ যে, তারা নিজেদের অজান্তে আসলে নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে, তাদের ধাপ্পাবাজি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ওয়াকফহাল। আর মোমেনদের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা কাঁধে নিয়েছেন। তাই তিনিই তাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু এই নির্বোধরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং সত্য থেকে লুকিয়ে রাখছে। নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে এভাবে যে, এই মোনাফেকী দ্বারা তারা লাভবান হচ্ছে বলে মনে করছে। মোমেনদের সামনে খোলাখুলি কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার বিপদ ও ক্ষতি থেকে তারা রক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু তারা যে সুপ্ত কুফরি এবং প্রকাশিত মোনাফেকী ও ভন্ডামী দ্বারা নিজেদেরকে ধ্বংসের ও নিকৃষ্টতম পরিণতির ঝুঁকির মধ্যে

নিক্ষেপ করছে, সে কথাও অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন জাগে যে, মোনাফেকরা কী কারণে এই ব্যর্থ অপচেষ্টা ও নিষ্ফল প্রতারণায় লিপ্ত হয়? এর জবাব হলো,

'তাদের মনে রয়েছে ব্যাধি।'

অর্থাৎ তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে একটা বিকৃতি রয়েছে। এটাই তাদেরকে সঠিক ও সরল পথ থেকে হটিয়ে দিচ্ছে এবং আল্লাহর পথ থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের সে রোগের আরো বৃদ্ধির আশংকা ও উপযোগিতা সৃষ্টি করছে।

'আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

কেননা রোগ রোগেরই সৃষ্টি করে। যে কোনো বিকৃতি ক্ষুদ্র আকারেই শুরু হয়। অতপর সর্বদিকে তা সম্প্রসারিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টি জগতের সকল আচরণ ও মানসিকতায় এবং সকল জিনিস ও সকল পরিস্থিতির ব্যাপারে এটা আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধি, সুতরাং এই চিরস্থায়ী বিধি অনুসারে তারা একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা আল্লাহ ও মোমেনদেরকে ধোঁকা দেয় ও তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এমন যে কোনো ব্যক্তির এই পরিণতির সম্মুখীন হওয়া অবধারিত।

'তাদের মিথ্যাচারের পরিণামে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

ঈমানের নামে ভন্ডামি ও দ্বিমুখী আচরণে লিপ্ত এই মোনাফেক শ্রেণীরা- বিশেষত তাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় এবং হিজরতের সূচনা যুগে যারা মদীনায় আপন গোত্রে নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলো, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল-তাদের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো তাদের গোয়ার্তুমি, নিজেদের অপকর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার প্রবণতা এবং কোনো জবাবদিহীর আশংকা না থাকায় আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি বোধ করা। তারা শুধু মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত হয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং নির্বুদ্ধিতা ও আহমকী বশত, বড় বড় দাবীও করে,'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে অরাজকতা বিস্তার করো না'

তখন তারা শুধু নিজেদের নির্দোষ দাবী করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং আত্মতৃপ্তিও বোধ করে এবং নিজেদের কৃত অপকর্মের সাফাইও গায়,

'তারা বলে যে, আমরা তো সংস্কারের কাজেই লিপ্ত।'

নিকৃষ্টতম অপকর্ম, অনাচার ও দুর্নীতিতে লিপ্ত থেকেও নিজেদেরকে সংস্কারক বলে দাবী করা মানুষের সংখ্যা কোনো যুগেই কম নয়। এরূপ দাবী করার কারণ এই যে, তাদের ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের মানদন্ড ভিন্নরকমের। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মানদন্ড যখন বিকৃত হয়ে যায়, তখন সকল মানদন্ডই বিকৃত হয়ে যায়। যারা তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর জন্য একাগ্র করে নেয় না, তারা নিজেদের দুষ্কর্মকে আর দুষ্কর্ম মনে করে না। কেন ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়ালখুশীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং কোন আল্লাহর বিধানের অনুগত থাকে না। এ কারণেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে,

'মনে রেখ, তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বোঝে না।'

তাদের আর একটা বৈশিষ্ট হলো, তারা সাধারণ জনগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যাতে কোন না কোনভাবে একটা মর্যাদার আসন পেয়ে যায়-চাই তা জনগণের চোখে একান্তই অসার ও কত্রিম হোক না কেন। এ প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অন্য মানুষরা যেমন ঈমান এনেছে, তেমনি তোমরাও ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরা কি নির্বোধ লোকদের মত ঈমান আনবো? তোমরা শুনে রাখ, আসলে তারাই হচ্ছে নির্বোধ। তবে তারা তা জানেনা।'

এটা সুস্পষ্ট যে, মদীনায় তাদেরকে যে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো, তা ছিলো খালেস, নির্ভেজাল ও নিস্বার্থ ঈমানের দাওয়াত, তা ছিলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করার দাওয়াত, আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাওয়াত, আল্লাহর রসূলের কাছে একবারে খোলা মন নিয়ে হাযির হওয়া এবং তিনি যে নির্দেশ দেবেন তা নিস্বার্থভাবে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়ার দাওয়াত। এ ধরনের নিস্বার্থভাবে ও একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনা একদল মোমেন তখন সেখানে বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলো এবং তাদেরকে দেখিয়েই বলা হচ্ছিল যে, ওদের মত পাক্কা খালেস এবং দৃঢ় ও খোলামেলা ঈমান আনো।

এটাও সুস্পষ্ট যে, রসূল (স.)-এর কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করাটা তাদের মনোপুত ছিলো না। এটাকে তারা দরিদ্র লোকদের উপযোগী এবং তাদের মত মর্যাদাবান লোকদের জন্য অনুপযোগী মনে করতো। এ জন্যই তারা বলতে পেরেছিলো যে, 'আমরা কি নির্বোধ লোকদের মত ঈমান আনবো?' আর এ কারণেই তাদেরকে এই নিষ্ঠুর জবাব ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনতে হয়েছিলো যে, 'শুনে রাখো, ওরাই আসলে নির্বোধ, কিন্তু ওরা তা বোঝে না।'

নির্বোধ কবেই বা নিজেকে নির্বোধ মনে করে? বিভ্রান্ত ব্যক্তি কবেই বা নিজের বিপথগামী হওয়ার কথা বুঝতে পারে?

এরপরই আসছে মোনাফেকদের সর্বশেষ বৈশিষ্টটির বিবরণ। এ বিবরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের কট্টর দুশমন ইহুদীদের সাথে মদীনার মোনাফেকদের যোগসাযশ কত সুদূরপ্রসারী রূপ ধারণ করেছিলো। তারা শুধু যে মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, বোকামি ও বড়াই-এর শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো তা নয়। বরং সেই সাথে নীচতা, হীনতা, শঠতা ও অন্ধকারে গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের অপকর্মেও তারা নিয়োজিত ছিলো। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'এরা যখন মোমেনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে যে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে একটু উপহাসই করছিলাম।'

কোনো কোনো লোক শঠতাকে বাহাদুরী এবং ধোঁকাবাজিকে চালাকি ও দক্ষতা মনে করে, অথচ তা দুর্বলতা ও নীচতা ছাড়া আর কিছু নয়। বাহাদুর ও শক্তিমান লোক কখনো প্রতারক, নীচ, নোংরা, বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী ও ছিদ্রান্বেষণকারী হতে পারে না। মোনাফেকরা মুসলমানদের সামনে নিজের কুফর-প্রীতি প্রকাশ করতে ভয় পেতো এবং তাদের সাথে দেখা হলে মুসলমানসুলভ আচরণ করতো। এ দ্বারা তারা একসাথে দু'টো সুবিধা অর্জন করতো। একদিকে নিজেরা মুসলমানদের রূঢ় ও কঠোর আচরণ থেকে রক্ষা পেত। অপরদিকে এই ভন্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রদর্শনীকে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতো। 'তাদের শয়তানরা' বলতে সম্ভবত ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা মুসলিম সমাজকে খন্ড বিখন্ড করা এবং তাতে কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে এই সব মোনাফেককে কার্যকর হাতিয়ার মনে করতো। অপরদিকে মোনাফেকরা ও ইহুদীদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা ও শক্তির উৎস মনে করতো। তাই এই কুচক্রী ইহুদী শয়তানদের সাথে দেখা হলে এই ভন্ড মুসলমানরা তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করতো যে, আমরা তো আসলে তোমাদেরই লোক এবং তোমাদেরই সাথী। মোমেনদেরকে যে ঈমানদারী হাবভাব দেখাই, ওটাতো ওদের সাথে আমাদের তামাশা ও মসকরা মাত্র। কোরআন তাদের এই জঘন্য কথাবার্তা ও আচরণের বিবরণ দিয়ে পরক্ষণেই তাদেরকে এমন ভয়ংকর হুমকি দেয়, যা পাহাড়কেও যেন চুরমার করে দিতে পারে।

'আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে তামাশা করছেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিচ্ছেন।'

আকাশ ও পৃথিবীর মহাপ্রতাপশালী সত্তা যার সাথে তামাশা করেন তার মত হতভাগা ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আর কে আছে? বস্তুত এটি এমন এক লোমহর্ষক বিষয়, যা নিয়ে ভাবতে গেলে এক অতীব ভীতিপ্রদ ও আতংকজনক দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং এক হৃদয় কাঁপানো বিভীষিকাময় পরিণাম চিত্তপটে জাগরিত হয়।

এ কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লক্ষহীন, উদ্দেশ্যহীন ও নির্দেশনাহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন। শেষ মুহূর্তে আল্লাহর পরাক্রান্ত হাতে ধরা পড়ে যায়। ঠিক যেন একদল হাড় জিরজিরে ইঁদুর খাঁচার ভেতরে লাফালাফি করে এবং খাঁচার মালিক সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ও চেতনা থাকে না। এ হচ্ছে আল্লাহর ভয়াবহ তামাশা। মোমেনদের সাথে কত তাদের তুচ্ছ ও দুর্বল তামাশার মত নয়।

ইতিপূর্বে যে বিষয়টির দিকে ইংগিত দিয়েছি, এখানেও তা প্রতিভাত হচ্ছে। বিষয়টি এই যে, মোমেনদের বিরুদ্ধে তারা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এর ভেতরে নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রিয় মোমেন বান্দাদের জন্য পরিপূর্ণ প্রশান্তি, আর তার অচেতন নিকৃষ্টতম দুশমনদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ হুমকি ও কঠোর শাসানি। তাদেরকে তাদের অন্ধ গোয়ার্তুমিতে লিপ্ত থাকতে কিছুটা সময় দেয়া হয়েছে। আর এই সময় ও অবকাশ দেয়াকেও তারা ভুল বুঝেছে। এর অন্তরালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ংকর পরিণাম। অথচ তারা সে সম্পর্কে সচেতন নয়।

সর্বশেষে তাদের প্রকৃত অবস্থা ও তাদের শোচনীয় পরিণতির চিত্র আঁকা হয়েছে এভাবে, 'এরা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের এ বেচাকেনা মোটেই লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথে পরিচালিতও হয়নি।'

তারা যদি চাইতো, তবে হেদায়াত পেতো। হেদায়াত তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তা তাদের নাগালের মধ্যেই ছিলো। কিন্তু তারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহী খরিদ করেছে। ফলে তা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথও পায়নি।

এখানে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে। সেটি এই যে, এই তৃতীয় চিত্রটি অর্থাৎ মোনাফেকদের বিবরণ প্রথম দুটি চিত্র অর্থাৎ মোমেন ও কাফেরদের বিবরণের চেয়েও দীর্ঘতর। কারণ প্রথম দু'টি চিত্র খানিকটা সরল ও সহজ। প্রথমটি তো একেবারে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সরল অন্তরাত্মা সম্পন্ন মোমেনের। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একেবারেই রুদ্ধ দ্বার ও চূড়ান্ত রকমের উচ্ছৃংখল ও অবাধ্য চরিত্রের মানুষের অর্থাৎ কাফেরের। কিন্তু তৃতীয় চিত্রটি হলো জটিল, বক্র ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের অধিকারী মোনাফেকের। আর এ ধরনের চিত্র অংকনে স্বভাবতই অনেক বেশী রেখা ও অনেক বেশী আঁচড়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের জটিল চরিত্র বর্ণনার জন্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিবরণ আবশ্যক হয়, যাতে তার বহুসংখ্যক গুণ ও বৈশিষ্ট দ্বারা তাকে চেনা যায়।

তা ছাড়া মদীনার মোনাফেকরা মুসলমানদের উত্যক্ত করা, কষ্ট দেয়া, ক্ষতি সাধন ও উৎপীড়নের যে কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলো, তার ব্যাপকতা ও তীব্রতাকেও এই দীর্ঘ বর্ণনা অনেকাংশে ফুটিয়ে তুলেছে। মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে মোনাফেকদের ভন্ডামিপূর্ণ ভূমিকা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র যে কোনো যুগে কী মারাত্মক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তাও উন্মোচন করে। এ

বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এখনে এই গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এসব উদাহরণ তাদের স্বভাব চরিত্র এবং তাদের নিত্য পরিবর্তনশীলতা ও ডিগবাজির তথ্য উদঘাটন করে।

'এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে আগুন জ্বালালো, যখন তার গোটা পরিবেশটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা.....না (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, এসব লোক আর কোনো দিনই সঠিক পথের দিকে ফিরে আসবে না।' (আয়াত ১৭-১৮)

কাফেরদের মত তারা শুরুতে হেদায়াতের পথকে উপেক্ষা করেনি। তাদের কানকে শোনা, চোখকে দেখা ও অন্তরকে উপলব্ধি করা থেকে বিরত রাখেনি। কিন্তু ইসলামকে ভালোভাবে জানা ও বুঝার পর তারা সত্য ও ন্যায়ের পথের চাইতে অন্যায় ও অসত্যের পথকে সচেতনভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আগুন প্রজ্জ্বলিত হোক এটা তারা চেয়েছিলো। কিন্তু যেই আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে তাদের চতুর্পাশকে আলোকিত করলো, অমনি তা দ্বারা উপকৃত হতে তারা অস্বীকার করলো, অথচ এটাই তারা চেয়েছিলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন। কেননা এই আলো তাদের কাংখিত হওয়া সত্তেও তা তারা পরিত্যাগ করেছিলো।

'তিনি তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যেন তারা দেখতে না পায়।'

এটা ছিলো তাদের আলোকে উপেক্ষা করার ফল। যেহেতু চোখ কান ও জিহবার নির্ধারিত কাজ ছিলো শব্দ ও আলোকে গ্রহণ করা এবং হেদায়াত ও আলো দ্বারা উপকৃত হওয়া, কিন্তু তারা তাদের কানকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে 'বধির' সেজেছে, জিহবাকে নিষ্ক্রিয় করে 'বোবা' সেজেছে এবং চোখকে নিষ্ক্রিয় করে 'অন্ধে' পরিণত হয়েছে, তাই তাদের আর সত্যের দিকে, হেদায়াতের দিকে ও আলোর দিকে ফিরে আসার অবকাশ নেই।

আর একটি উদাহরণ তাদের মনের ভীতি, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

'অথবা (এদের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে) আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে আবার অন্ধকার মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের....... ধাবিত হয়, আবার যখন তিনি অন্ধকার করে দেন তখন এরা (একটু) থমকে দাঁড়ায়, অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে সহজেই তাদের শোনার (ক্ষমতা) ও দেখার (ক্ষমতা) চিরতরে ছিনিয়ে নিতে পারতেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান। (আয়াত ১৯-২০)

বস্তুত, এটা একটা বিস্ময়কর দৃশ্য। একটা চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। এতে নিহিত রয়েছে উদ্‌ভ্রান্তি ও গোমরাহী, রয়েছে ভীতি ও আতংক, রয়েছে শংকা ও উদ্বেগ, রয়েছে রকমারি ধ্বনি ও আলো। আকাশ থেকে অবতীর্ণ দুর্যোগ, সেই সাথে মুষলধারে বৃষ্টি।

'অন্ধকার, বিদ্যুত ও বজ্রপাতের মিলিত তান্ডব, যখনই চারপাশ আলোকিত হয় অমনি তার মধ্যে যাত্রা করে, আর অন্ধকার হলেই থমকে দাঁড়ায়।' অর্থাৎ এমনভাবে যাত্রাবিরতি ঘটায় যে, কোথায় যাবে জানেনা, কী করবে বোঝে না। ভয়ে ও আতংকে তারা,

'তাদের কানে আংগুল দিয়ে বজ্রের বিকট শব্দ থেকে মৃত্যুর আশংকায় আত্মরক্ষা করে।'

যে কর্মকান্ড ও কোলাহল গোটা দৃশ্য জুড়ে অবস্থান করছে, মুষলধারে বৃষ্টির দুর্যোগ থেকে শুরু করে অন্ধকার বিদ্যুৎ ও বজ্র, শংকিত দিশেহারা লোকজন ঘুট ঘুটে অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পথ চলা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা মোনাফেকদের উদভ্রান্ত, উদ্বেগাকুল, উত্তেজনাময় ও

দিশেহারা অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলে। মোনাফেকরা এ উদ্বেগ, উত্তেজনা ও অস্থিরতায় ভোগে মোমেনদের সাথে সাক্ষাত ও তাদের শয়তানদের (ইহুদী গোষ্ঠী) সাথে সাক্ষাতের মধ্যবর্তী সময়ে, এক এক সময় এক এক রকম কথা বলার ভেতর দিয়ে, একবার হেদায়াতের আলো চাওয়া এবং পরক্ষণে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকার ও গোমরাহীকে বেছে নেয়ার মধ্য দিয়ে তারা এ অস্থিরতায় ভোগে। এটা একটা বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য, যা একটা মানসিক অবস্থার প্রতীক স্বরূপ। এটা মানসিক অবস্থার চিত্রকে বাস্তব রূপ দান করে। মানসিক অবস্থাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তব অবস্থার আকারে রূপদানে এটা কোরআনের একটা বিস্ময়কর রীতি।

এভাবে উক্ত তিন ধরনের মানুষের চিত্র তুলে ধরার পর পরবর্তী আয়াতে গোটা মানব জাতির প্রতি সম্বোধন ও আদেশ জারী করা হয়েছে যেন তারা পরম সম্মানিত, সরল সঠিক, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, কার্যকর উপকারী, হেদায়াত প্রাপ্ত ও সফলকাম চিত্রটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। এটি হচ্ছে মোত্তাকী ও পরহেযগারদের চিত্র।

'হে মানুষ, তোমরা সেই মহান আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো–তাদের সবাইকে পয়দা করেছেন। (আশা করা যায়, এর ফলে) তোমরা......তিনি নানা প্রকারের ফল মূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। (এই সব কাজে যার কোনো অংশীদার নেই সে) আল্লাহ তায়ালার সাথে কখনো কাউকে শরীক করো না।' (আয়াত ২১-২২)

সমগ্র মানব জাতির প্রতি আহ্বান

এ দুটি আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকারী প্রভুর এবাদাত করে। কেননা সৃষ্টি করা যে প্রভুর একক কৃতিত্ব, এবাদাত ও আনুগত্য লাভ করাও তার একক অধিকার। আর এই এবাদাতের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে, যা তারা অর্জন ও বাস্তবায়ন করুক এই প্রত্যাশা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যটি হলো,

'আশা করা যায়, তোমরা মোত্তাকী বা সংযমী হতে পারবে।'

অর্থাৎ মানুষের যে তিন শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে যে শ্রেণীটি সবচেয়ে পছন্দনীয়, যারা আল্লাহর এবাদাত করে, আল্লাহকে ভয় করে, যারা স্রষ্টাকে প্রভুত্বের ও প্রতিপালনের অধিকার দেয়, একমাত্র স্রষ্টার এবাদাত আনুগত্য ও দাসত্ব করে; সেই শ্রেণীটির মতই তোমরা গড়ে উঠবে। তোমরা হবে সেই মহাপ্রভুর বান্দা যিনি অতীত ও বর্তমানের সকলের মালিক ও মনিব যিনি সকল মানুষের স্রষ্টা, যিনি একাই আকাশ ও পৃথিবী থেকে মানুষের জীবিকা সৃষ্টি ও সরবরাহ করেন। বলা হয়েছে–

'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন।'

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীকে বিছানার মতো আরামদায়ক ও নিরাপদ অবস্থান স্থল বানিয়েছেন। আল্লাহর পেতে দেয়া এই বিছানাটার কথা মানুষ ভুলে যায়। কারণ এটি তাদের চোখে অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। জীবন যাপনের উপকরণ সরবরাহের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে যে সমন্বয় ও সাযুজ্য সৃষ্টি করেছেন, আরাম আয়েশ, বিশ্রাম ও আনন্দের যে উপকরণ তার করায় করে দিয়েছেন, তাকে সে বিস্মৃত হয়। এই সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য যদি সৃষ্টি না করা হতো তাহলে এই গ্রহে এত সহজ ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের কোন সুযোগ থাকতো না। এই গ্রহে জীবনের অপরিহার্য উপকরণগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি উপকরণও যদি অনুপস্থিত থাকতো তাহলে এখানকার পরিবেশ তাদের জীবন যাপনের অনুপযোগী

হয়ে যেত এবং তারা এখানে টিকতে পারতো না। বাতাসের অপরিহার্য উপাদানগুলোর কোনো একটি উপাদানও যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম থাকতো, তাহলে জীবন যাপন সম্ভব হলেও শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াতো।

'আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন।'

অর্থাৎ খুবই মযবুত, টেকসই ও সমন্বিতভাবে বানিয়েছেন। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জীবনের সাথে ও জীবনের স্বাচ্ছন্দের সাথে এই সম্পর্ক অটুট ও গভীর। আকাশ তার উত্তাপ দিয়ে, আলো দিয়ে, তার বুকে বিচরণশীল জ্যোতিষ্কমন্ডলীর আকর্ষণ শক্তি দিয়ে, তাদের পারস্পরিক সমন্বয় দিয়ে এবং পৃথিবীর সাথে তার অন্যান্য সকল সম্পর্ক ও সংযোগ দিয়ে পৃথিবীতে জীবনকে টিকে থাকার ব্যবস্থা ও সাহায্য করে থাকে। সুতরাং মানুষকে যেখানে স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা, জীবিকা দাতার অনুগ্রহ এবং সৃজিত বান্দাদের এবাদাত ও আনুগত্য লাভে মাবুদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেখানে আকাশের এই অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়া মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

'যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফল ও ফসল ফলিয়েছেন।'

আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করা প্রসংগে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও তা দ্বারা ফসল ফলানোর উল্লেখ কোরআনে বহু জায়গায় বহুবার দেখা যায়। আকাশ থেকে বর্ষিত পানি পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবন যাপনের প্রধানতম উপাদান। এই পানি থেকেই ঘটে জীবনের বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রপূর্ণ আবির্ভাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি পানি থেকেই সকল সজীব জিনিস বানিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া) চাই তা পৃথিবীর মাটির সংস্পর্শে সরাসরি উদ্ভিদ উৎপাদনের মাধ্যমেই হোক, অথবা সুপেয় পানির নদী ও হ্রদ বানিয়েই হোক, কিংবা ভূগর্ভের স্তরে পানির প্রবাহ ঘটিয়ে তা থেকে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ করে কূয়া ও প্রস্রবণের মাধ্যমে তা নির্গত করেই হোক, অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই পানিকে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে উত্তোলনের মাধ্যমেই হোক। সর্বাবস্থায় পানিই হচ্ছে মুল।

পৃথিবীতে পানির প্রবাহ, মানব জীবনে তার ভূমিকা, ছোট বড় সব প্রকারের জীবন তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া, এসব মোটেই বিতর্কের বিষয় নয়। এ সবের প্রতি ইংগিত দেয়া এবং স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। সৃষ্টিকর্তা ও জীবিকা দাতা মহান আল্লাহর এবাদাতের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য এটাই যথেষ্ট। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে ইসলামী দর্শনের মূলনীতিসমূহের দু'টো মূলনীতি স্পষ্টভাবে জানা যায়। একটি হলো, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মাত্র একজন এবং তিনি একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

'যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।'

কথাটা এই তত্ত্বটিকেই ফুটিয়ে তুলছে। আর দ্বিতীয়টি হলো, বিশ্বনিখিলের ঐক্য ও অখন্ডতা তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও সাযুজ্য জীবন ও মানুষের সাথে তার সাম্য। 'যিনি পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফল ও ফসল উৎপন্ন করেছেন।' মহাবিশ্বের অংশ এই পৃথিবী মানুষের জন্য পেতে দেয়া বিছানাস্বরূপ তার আকাশ সুশৃংখলভাবে নির্মিত, তা থেকে পানি বর্ষণ করে এবং সেই পানি দিয়ে মানুষের জীবিকাস্বরূপ ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়। আর সমস্ত কর্মকান্ডের কৃতিত্ব একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর।

'অতএব সব কিছু জেনে শুনে তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিওনা।'

অর্থাৎ তোমরা জানো যে, তিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এসব কাজে তার কোনো সাহায্যকারী বা বিরোধিতাকারী শরীক ছিলো না। এসব কিছু জানার পরও কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা বিকল্প মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অশোভন কাজ।

তাওহীদের আকীদাকে নির্ভেজাল ও খালেস আকীদায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে কোরআন যেসব বাতিল উপাস্যের কবল থেকে মুক্ত হবার প্রবল তাকীদ দিয়ে থাকে, সেগুলো পৌত্তলিকদের উপাসনার মতো প্রথাগত দেব-দেবী ও মূর্তি নাও হতে পারে। অন্য কোনো গোপন আকারের বিকল্প মাবুদও হতে পারে, যাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তির কাছে কোনো না কোনভাবে আশা পোষণ করা তাকে কোন না কোনো প্রকারে ভয় করা অথবা সে কেনো ক্ষতি বা উপকার সাধন করতে পারে বলে কোনোভাবে বিশ্বাস করা বিচিত্র কিছু নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে আল্লাহর বিকল্প ও সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা এত গোপনীয় ধরনের শেরক যে, তা রাতের অন্ধকারে কোনো কালো বস্তুর ওপর দিয়ে পিপড়ের চলাফেরার চেয়েও গোপনীয়। যেমন সে বলতে পারে, 'আল্লাহর কসম এবং তোমার ও আমার জীবনের কসম', অথবা, 'এই কুকুরটা না থাকলে গত রাতে আমাদের বাড়ীতে চোর আসতো, 'বাড়ীতে হাঁস না থাকলে চোর আসতো অথবা 'আল্লাহ তায়ালা যা চান এবং তুমি যা চাও' অথবা 'আল্লাহ এবং অমুক যদি না থাকতো' এসবই শেরকের পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে বলেছিলো 'আল্লাহ তায়ালা ও আপনি যেমন চান।' রসূল (স.) তৎক্ষণাত বললেন, 'তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললে?'

মুসলিম উম্মাহর মহান পূর্ব পুরুষরা এভাবেই গোপনীয় শেরক ও আল্লাহর সমকক্ষ হিসাবে গৃহীত সত্ত্বা বা শক্তিগুলোর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাদের সেই সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা আমাদের কাছ থেকে আজ কোথায় হারিয়ে গেলো এবং তাওহীদের সেই সুমহান তত্ত্ব থেকে আমরা কত দূরে আছি তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ইহুদীরা রসূল (স.)-এর রেসালাতের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতো। আর মোনাফেকরাও সন্দেহ পোষণ করতো। ইতিপূর্বে মক্কায় মোশরেকরাও এ ব্যাপারে নিজেরা যেমন সংশয়াপন্ন ছিলো , তেমনি অন্যদেরকেও সন্দিহান করে তোলার চেষ্টা করতো। এখানে এই সকল শ্রেণীর সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি কোরআন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেননা শুরুতে সম্বোধনটি ছিলো গোটা মানব জাতির প্রতি। এই চ্যালেঞ্জটি দেয়া হয়েছে সত্যাসত্য নিরূপণের একটি বাস্তব ও সর্ববাদী সম্মত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

'আমি আমার বান্দার ওপর যে কেতাব নাযিল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও-এই কেতাবের সূরার মতো একটি সূরা (তোমরাও) রচনা করে নিয়ে এসো! এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে তাদের ডাকো (এবং প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করো,) যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও! কিন্তু তোমরা যদি তা না করতে পারো-(আর এটা নিশ্চিত যে), তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা দোযখের সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার

ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর, আল্লাহ তায়ালাকে যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে এই আযাব নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।' (আয়াত ২৩-২৪)

এই চ্যালেঞ্জটি এমন একটি আকর্ষণীয় ভাষায় শুরু হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। এই চ্যালেঞ্জের সূচনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে তার দাস ও বান্দা হিসাবে পরিচিত করে 'তাঁর এই দাস সুলভ বৈশিষ্টকে' উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমরা যদি আমার বান্দার ওপর যা কিছু নাযিল করেছি তা নিয়ে সন্দেহে লিপ্ত ....,

তাঁকে আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দা হিসাবে বর্ণনা করার কয়েকরকম তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, এ দ্বারা রসূল (স.)-কে সম্মানিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী বলে দেখানো হয়েছে। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দা বা গোলাম হওয়াটা যে কোনো মানুষের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার ব্যাপার। দ্বিতীয় এ দ্বারা দাসত্ব বা গোলামীর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহর সমকক্ষ বা বিকল্প হবার দাবীদার সকলকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ওহী লাভের উপযোগী এই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়াকেও আল্লাহর বান্দার বৈশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বান্দা বা গোলাম বলে আখ্যায়িত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জের আভাস সূরার শুরুতেই দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই গোটা কোরআন সেসব আরবী বর্ণমালা দিয়েই লেখা, যা তাদের কাছেও রয়েছে। এই গ্রন্থ যে আসমান থেকে নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের সন্দেহ থাকলে তাদের উচিত এ ধরনের একটি সূরা রচনা করে এনে হাযির করা। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ থেকে থাকলে তাদেরকেও ডেকে আনা উচিত। আল্লাহ তায়ালা তো বান্দার নবুওতের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এ চ্যালেঞ্জ শুধু রসূল (স.)-এর জীবিত কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার পরেও বহাল রয়েছে। আজও এই চ্যালেঞ্জ অক্ষুণ্ন। এটি একটি অকাট্য ও তর্কাতীত প্রমাণ। বস্তুত, মানুষের কথাবার্তা ও রচনার ভাষা থেকে কোরআনের ভাষার মান স্পষ্টভাবে অকাট্যভাবে ভিন্ন রকমের। ভাষার এই মানগত শ্রেষ্ঠত্ব চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে। অক্ষুন্ন থাকবে এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কথা বলেছেন,

'যদি তোমরা তা না পারো–আর কখনো তোমরা তা পারবেও না। তাহলে যে আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর এবং যে আগুন কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত ও প্রস্তুত রয়েছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করো।'

এখানে চ্যালেঞ্জ প্রদান যতটা বিস্ময়কর, চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তাদের অপরাগতার নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা তার চেয়েও বেশী বিস্ময়কর। রসূল (স.)-কে মিথ্যুক প্রমাণ করা যদি সম্ভব হতো, তাহলে তারা এক মুহূর্তও তাতে বিলম্ব করতো না। কিন্তু তারা যে কখনো তা করতে পারবে না সে কথা কোরআন বলে দিয়েছে। আর কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব বলে প্রমাণিত হওয়া নিসন্দেহে একটি বড় মোজেযা। কোরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ প্রমাণ করার সুযোগ তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিলো । এই চ্যালেঞ্জকে অসার প্রমাণ করতে তারা যদি সক্ষম হতো, তা হলে (নাউযুবিল্লাহ) কোরআনের জারিজুরি কবেই ফাঁস হয়ে যেতো এবং আল্লাহর কেতাব হিসাবে তার আর অকাট্যতা ও প্রমাণ্যতা থাকতো না। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি এবং কখনো তা আর হবেও না। যদিও একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের কাছেই কোরআন সন্দেহ সংশয়ের মুখোমুখী হয়েছিলো ,

কিন্তু আসলে কোরআনের সম্বোধন সকল যুগের গোটা মানব জাতির কাছেই। এটা কোরআনের চূড়ান্ত ও ঐতিহাসিক ঘোষণা। এ ঘোষণা দ্বারা সে নিজেকে চিরদিনের জন্যে অকাট্য ও অজেয় গ্রন্থ রূপে প্রমাণিত করেছে।

তাছাড়া বিভিন্ন রকমের বাকরীতি ও বাচনভংগির সাথে যাদের পরিচয় আছে, সৃষ্টি জগত ও তার বস্তু নিচয় সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যদের অভিজ্ঞতা রয়েছে মানব রচিত মনস্তাত্বিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও মতবাদ সম্পর্কে, তাদের এ ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই যে, এসব ব্যাপারে কোরআন যা কিছু উপস্থাপিত করেছে, তার সাথে মানব রচিত জিনিসের কোনোই মিল থাকার কথা নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যেটুকু বিতর্ক তোলা হয়েছে, তার কারণ ছিলো অজ্ঞতা। জেনে বুঝে কখনো কেউ এ বিতর্ক তোলেনি। অথবা এর কারণ ছিলো বাতিল দিয়ে সত্যকে ঢেকে দেয়ার অপপ্রয়াস। এজন্যেই 'তাহলে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো' এ কথাটা বলে যে ভয়াবহ হুমকি দেয়া হয়েছে, তা ছিলো চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ হয়েও অকাট্য সত্যকে যারা মানতে চায় না তাদের জন্যে।

এখানে এই ভয়াবহ ও আতংক-জনক ভংগীতে মানুষ ও পাথরকে একসাথে উল্লেখ করার রহস্যটা কী? তা জানা দরকার। রহস্যটা এই যে, যে কাফেরদের জন্যে এই আগুন নির্ধারিত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে সূরার শুরুতেই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে পর্দা।'

এখানে কোরআনে এদেরকেই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ পূরণে তারা অক্ষম। তাই তারা নিছক পাথর ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও বাহ্যিক চেহারার দিক দিয়ে তারা মানুষ। সুতরাং আসল পাথর ও মানুষ পাথরের এই মিলন অবধারিত।

এখানে আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্যের আর একটা বৈশিষ্টের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমত সেখানে আগুনে পাথর ভস্মীভূত হবে, দ্বিতীয়ত, সেখানে মানুষের আগে ও পেছনে শুধু পাথর আর পাথরের ভীড় থাকবে।

'অতপর যারা (এই কেতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) ভালো কাজ করেছে, তাদের তুমি (হে নবী) সুসংবাদ দাও। এমন এক জান্নাতের- যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত যখনই তাদের (এ জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া.......... তাদের জন্যে সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে তাদের সাথে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (আয়াত ২৫)

বেহেশতের দৃশ্য

সেই ভয়াবহ দৃশ্যের বিপরীতে রয়েছে মোমেনদের জন্যে আপেক্ষমান নেয়ামতসমূহ। পবিত্র সংগীনী ছাড়া তাদের জন্যে সেখানে রয়েছে আরাম আয়েশের বিচিত্র উপকরণ। সেসব নেয়ামতের বৈচিত্র দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। তার মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার ফলমূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ফলমূল। দেখে তাদের মনে হবে যে, ওগুলো আগেই তারা পেয়েছে। হয় পৃথিবীতে এ ধরনের নাম ও আকৃতির ফলমূল তারা পেয়েছে, নয় তো বেহেশতেই তারা আগে এ ধরনের ফলমূল পেয়েছে। সম্ভবত প্রতিবার প্রাপ্ত ফলমূল দেখতে আগের ফলমূলের মত হবে কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে ভিন্ন রকমের হবে। এটা এক ধরনের আনন্দমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। প্রতিবার তারা নতুন নতুন বিস্ময়ের সম্মুখীন হবে। প্রতিবারই দেখবে, দেখতে এক রকম হলেও প্রতিটি ফল ভিন্ন স্বাদের।

আকৃতিতে সাদৃশ্য এবং প্রকৃতিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র আল্লাহর সৃষ্টির একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্টের কারণে গোটা সৃষ্টিজগতই আকৃতিতে যেমন, প্রকৃতিতে তার চেয়ে বিরাট। এই বিরাট সত্যটি বুঝার জন্যে আমরা শুধুমাত্র মানুষের নমুনা ও উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। সৃষ্টির দিক থেকে সকল মানুষই মানুষ। তাদের একটা মাথা, শরীর ও অংগ প্রত্যংগ রয়েছে। তাদের শরীরে রয়েছে গোশত, রক্ত, হাড় ও শিরাসমূহ। আছে দু'টো চোখ, দু'টো কান, মুখ ও জিহবা। আরো রয়েছে জীবন্ত কোষসমূহ। এভাবে বাহ্যিক আকৃতিতে তাদের গঠন প্রক্রিয়ায় কোনো পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য নেই। অথচ গুণ ও বৈশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতিতে, যোগ্যতা ও প্রতিভায় একজন মানুষের সাথে আরেক জনের রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র নিয়ে ভাবলে আমাদের হতবাক হয়ে যেতে হয়। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে ও গুণবৈশিষ্টে তার বিভিন্নতা প্রচুর। অথচ সূচনায় তা ছিলো একই আকৃতির একটি মাত্র জীবকোষ। আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র ও অপার ক্ষমতার এত সব লক্ষণ দেখার পর কে আছে যে, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করবে না? কে আছে যে, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক ও সমকক্ষ মানবে? অথচ আল্লাহর অলৌকিক শক্তি দৃশ্য জগতে যেমন, অদৃশ্য জগতেও তেমনি দিবালোকের মত পরিষ্কার। এরপর কোরআনে আল্লাহ তায়ালা যে উদাহরণ তুলে ধরেন তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে–

'(সত্য প্রমাণের জন্যে প্রয়োজন বোধে) আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে কোনো নিকৃষ্ট মানের কিছুর উদাহরণ দিতেও লজ্জাবোধ করেন না। যারা (আল্লাহর বাণীতে) বিশ্বাস স্থাপন ...... পথকে বেছে নিয়েছে।' (আয়াত ২৬)

পবিত্র কোরআনে মোনাফেকদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, 'তারা সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালানোর আকাংখ্যা পোষণ করেছিলো ' এবং 'আকাশ থেকে নামা দুর্যোগের মতো, যাতে অন্ধকার, বিজলী ও বজ্রপাতের সম্মিলন ঘটেছে।' এ উদাহরণ ইহুদীদের ও মোশরেকদের সাথেও হয়তো মিলে যেতো। ইতিপূর্বে মক্কী সূরাগুলোতেও এ ধরনের উদাহরণ নাযিল হয়েছিলো এবং তা মদীনায়ও পড়া হতো। যেমন কাফেরদেরকে মাকড়সার সাথে তুলনা করা হয়েছে, 'তারা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্যে বাসস্থান তৈরী করেছে। আর মাকড়সার বাসা হলো দুর্বলতম বাসা; যদি তারা জানতো,' অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের দেবদেবীকে মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা সবাই মিলিত হয়েও একটা মাছি বানাতে পারবে না। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতেও পারবে না। প্রার্থী ও প্রার্থিত উভয়েই হচ্ছে দুর্বল।'

মোনাফেকরা উক্ত উদাহরণসমূহ দেখে নাক সিটকাতো এবং এ দ্বারা মানুষের মনে কোরআনের সত্যতা ও ওহীর ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহের জাল বিস্তারের চেষ্টা চালাতো। তারা যুক্তি দিতো যে, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী ও বিদ্রূপকারী এসব উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবে মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির মত তুচ্ছ প্রাণীর উল্লেখ করেন না। মূলত এ ছিলো মক্কায় মোশরেকদের এবং মদীনায় ইহুদী ও মোনাফেকদের সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত অপপ্রচারের অংশ বিশেষ।

এই ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের দাঁতভাংগা জবাব নিয়ে এসেছিলো এই আয়াতটি। উদাহরণসমূহ বর্ণনার পেছনে আল্লাহর কী মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর কদর্য করার কি ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে, সে সম্পর্কে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা এবং

মোমেনদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা যে, এ দ্বারা তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। মূলত এই ছিলো এ আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা একটা ক্ষুদ্র মশা মাছি বা তার চেয়ে বড় কোনো জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না।'

কেন লজ্জা পাবেন? তিনি তো ছোট বড় সকলেরই স্রষ্টা। মশা থেকে হাতি সবটার স্রষ্টা। মশার জীবনটা যেমন একটা অলৌকিক ব্যাপার, হাতির ক্ষেত্রেও তা একটা অলৌকিক ব্যাপার। তা এমন এক গুপ্ত রহস্য যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তা ছাড়া উদাহরণের ভেতরে যে বিষয়টি শিক্ষণীয় তার সাথে আকার ও আকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণ হচ্ছে কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যম মাত্র। উদাহরণে দোষেরও কিছু নেই, লজ্জারও কিছুই নেই। এসব উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনকে পরীক্ষা করতে চান।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে এসব উদাহরণ সত্য এবং তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।'

কেননা আল্লাহর প্রতি ঈমান তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছুকে মেনে নেয়ার যোগ্য বানিয়ে দেয় এবং সব কিছুতেই আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত করে তোলে। ঈমান তাদের মনে আলো জালিয়ে দেয়, তাদের অন্তরাত্মায় তীব্র অনুভূতির সঞ্চার করে, তাদের হৃদয়ে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রতিটি বাক্যে আল্লাহর সুগভীর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে বলে বুঝবার ক্ষমতা দেয়।

'আর যারা কুফরী করে তারা বলে, এ দ্বারা আবার আল্লাহ তায়ালা কী উদাহরণ দিতে চাইলেন?' এটা আসলে এমন ব্যক্তির প্রশ্ন যে আল্লাহর আলোর সন্ধান পায়নি, আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম বিধান ও ব্যবস্থাপনার সাথে যার কোনো সংযোগ ও সম্পর্ক নেই, যার আল্লাহর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং মনিবের কার্যকলাপের প্রতি গোলামের যে স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও আনুগত্য থাকা উচিত তা নেই। অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত আপত্তি ও অসম্মতি জ্ঞাপনের ভংগীতে অথবা এমন কথা আল্লাহ তায়ালা বলে থাকতে পারেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের ভংগীতে এসব কথা বলে থাকে।

আয়াতের শেষাংশে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে হুমকি ও হুশিয়ারী জ্ঞাপনের ভংগীতে। উদাহরণের আড়ালে যে মূল্যায়ন ও বিচার বিবেচনা নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কেই এই হুশিয়ারী। বলা হয়েছে, এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অনেককে সুপথ দেখান আবার অনেককে বিপথগামী করেন। বিপথগামী করেন শুধু ফাসেকদেরকে।'

আল্লাহর এটা শাশ্বত রীতি যে, তিনি বান্দার জন্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখেন। পরীক্ষা উন্মুক্ত থাকে ও অব্যাহতভাবে আপন গতিতে। চলতে থাকে তাঁর বান্দারা নিজ নিজ স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে এবং আপন আপন অনুসৃত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে তা গ্রহণ করে, পরীক্ষা অভিন্নই থাকে। কিন্তু প্রত্যেকের কর্মপন্থা ভেদে তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর কঠোর অগ্নি পরীক্ষা চাপানো হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তার সুগভীর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় আস্থাশীল এবং তার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল, তাকে এই অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহর প্রতি আরো অনুগত, বিনয়াবনত এবং আরো আল্লাহভীরু বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ফাসেক বা মোনাফেককে এই অগ্নি পরীক্ষা বিচলিত করে দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা থেকে আরো দূরে ঠেলে দেয়। তাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাতার থেকে একেবারেই বহিষ্কার করে দেন। অনুরূপভাবে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ দ্বারা নানা রকমের লোক সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু

পরহেযগার ও ঈমানদার ব্যক্তি যখন তা লাভ করে, তখন তার ভেতরে চেতনা ও কৃতজ্ঞতা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে ফাসেক ও মোনাফেক ব্যক্তি যখন সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা লাভ করে, তখন তা তাদের গর্বিত ও অহংকারী করে দেয়। অতপর তাকে গোমরাহী ও ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালা তায়ালা মানুষের জন্যে যেসব উদাহরণ ব্যবহার করেন তার অবস্থাও তদ্রূপ। তা দিয়ে আল্লাহ অনেককে গোমরাহ করে দেন। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রতিটি বাক্যকে শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানায় না, তাদের গোমরাহ না হয়ে উপায় থাকে না। আর যারা আল্লাহর সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করে, তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শুধু ফাসেকদেরকেই বিভ্রান্ত করেন। অর্থাৎ যাদের মন ইতিপূর্বেই পাপাসক্ত হয়ে গেছে এবং সত্য ও সুপথ তারা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তাদের সেই গোমরাহী ও পাপাসক্তি তাদেরকে আরো বেশী গোমরাহী ও পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে এই সব ফাসেকের চারিত্রিক দোষসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে, যেমন সূরার শুরুতে মোত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছিলো । বস্তুত সূরাটিতে উক্ত গোষ্ঠীসমূহের আলোচনাই অব্যাহত রয়েছে। যুগে যুগে সমগ্র মানব জাতি এসব গোষ্ঠীকেই লালন করে আসছে।

'(এরা হচ্ছে সে সব লোক) যারা তাঁর ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভংগ করে, (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) তিনি..... সর্বোপরি এই যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ (অন্যায়ে নিয়োজিত) ব্যক্তিরাই হচ্ছে (আসলে) ক্ষতিগ্রস্ত।' (আয়াত ২৭)

ফাসেকদের বিবরণ

এখন প্রশ্ন এই যে, আল্লাহর সাথে সম্পাদিত কোন্ চুক্তি তারা লংঘন করে থাকে? আল্লাহ তায়ালা সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন এমন কোন্ সম্পর্ক বন্ধনকে তারা ছিন্ন করে? কী ধরনের নৈরাজ্য ও অশান্তি তারা পৃথিবীতে বিস্তার করে?

আলোচ্য আয়াতে বিষয়টিকে খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা ক্ষেত্রটি হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের স্বভাব প্রকৃতি চিহ্নিত করার সর্বস্তরে কোনো ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্র এটা নয়। সাধারণভাবে একটি চিত্র তুলে ধরাই এখানে কাংখিত। এই প্রকৃতির যে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর যে চুক্তি বা অংগীকারই থাক না কেন, তা লংঘিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা যে সব সম্পর্ককে জোড়া দিতে আদেশ দিয়ে দেন, তা তারা ছিন্ন করে। যত রকমের ফেতনা ফাসাদ, বিপর্যয়, গোলযোগ ও চক্রান্ত করা সম্ভব, তারা তা করে এ ধরনের মানুষের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের বিকারগ্রস্ত স্বভাব প্রকৃতি ও মন মেযাজ কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির ধার ধারে না। কোনো সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং কোনো গোলযোগ থেকে বিরত হয় না। তারা জীবনরূপ বৃক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ফলস্বরূপ। এ ফল পচে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে এবং জীবন থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই কোরআনের যে উদাহরণ শুনে মোমেনরা ও মোত্তাকীরা হেদায়াত লাভ করে, তা দ্বারাই তারা বিপথগামী হয়।

আমরা দেখতে পাই, সামান্য নামধামের পার্থক্য ছাড়া এ ধরনের লোকদের ধ্বংসকারী প্রভাব এখনো বিদ্যমান। ইসলাম মদীনায় ইহুদী, মোশরেক ও মোনাফেকদের যে কর্মকান্ড মোকাবেলা করেছিলো , আজও তাকে অনুরূপ কর্মকান্ড, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে।'

মানুষের সাথে আল্লাহর যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তা বহুসংখ্যক অংগীকারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, প্রত্যেক প্রাণীর স্বভাব প্রকৃতিতে ও মনমগজে জন্মগতভাবে এরূপ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সে তার স্রষ্টাকে চিনবে, তার অনুগত হয়ে তার দিকে মনোনিবেশ করবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এই তীব্র আকাংখা ও ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে বহাল থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে তা বিকৃতি ও বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। ফলে তারা আল্লাহর কিছু শরীক ও সমকক্ষ খুঁজে নেয়। আর একটি অংগীকার হলো, পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের অংগীকার। এটি আল্লাহ হযরত আদম (আ.) থেকে গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'অতপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের কাছে কোনো নির্দেশ আসে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ মেনে চলবে, তার কোনো ভয়ও নেই, চিন্তাও নেই। আর যারা কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং আমার আয়াতগুলোকে অমান্য করে, তারা হবে চিরস্থায়ী দোযখবাসী।'

আর এক ধরনের অংগীকার তিনি প্রত্যেক জাতির কাছ থেকে তাদের রসূলদের মাধ্যমে নিয়ে থাকেন যে, তারা যেন এক আল্লাহর এবাদাত করে এবং তারা যেন নিজেদের জীবনকে আল্লাহর আইন কানুন ও শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করে। এই সকল ধরনের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি ফাসেকরা ভংগ করে। আর আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকার যখন লংঘিত হয়, তখন আর কোনো কিছুই লংঘিত হতে বাকী থাকে না। আল্লাহর অংগীকার লংঘনের ধৃষ্টতা যার হয়। সে এরপর আর কোন অংগীকারকে শ্রদ্ধা করে না।

'আর আল্লাহ তায়ালা যে সকল সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে।'

আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক রক্ষা করতে বলেছেন তা বহু রকমের। আর এসব কিছুর আগে আদেশ দিয়েছেন আকীদা ও আদর্শগত ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রক্ষা করতে। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন হলে অতপর সকল বন্ধনই ছিন্ন হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে গোলযোগ অশান্তি ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।

'আর পৃথিবীতে তারা অরাজকতা ছড়ায়।'

পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ানোর প্রকার ভেদ আছে। তবে সব রকমের অরাজকতারই উৎপত্তি ঘটে আল্লাহর বাণীর অবাধ্যতা, আল্লাহর অংগীকার লংঘন এবং আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা থেকে। আর সবচেয়ে বড় অরাজকতা এবং সবচেয়ে বড় ফাসাদ হলো আল্লাহ তায়ালা যে আইন ও বিধান মানুষের জীবন পরিচালনা করার জন্যে পাঠিয়েছেন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থল, যেখান থেকে একটি রাস্তা অনিবার্যভাবে অরাজকতা ও ফাসাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে শেষ হয়। আল্লাহর যমীন থেকে আল্লাহর আইন যখন নির্বাসিত এবং আল্লাহর বিধান যখন দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ক্ষমতা থেকে অপসারিত, তখন পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। আর যখন এভাবে মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তখন তা হবে সকল প্রাণী, বিরাজমান পরিস্থিতি, জীবন ও অর্থনীতি এবং গোটা পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের জন্যে সর্বাত্মক অরাজকতা ও বিপর্যয়। সেটা হবে ধ্বংস, অকল্যাণ ও নৈরাজ্য এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুতির ফল। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে গোমরাহ করেন এবং সেই একই জিনিস দ্বারা মোমেনদেরকে সুপথগামী করেন তবে তা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবে না।

পৃথিবীতে প্রকাশিত কুফরী ও ফাসেকীর ফলাফল বর্ণনা করার পর কোরআন বিরক্তি মিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করছে যে, মানুষ কিভাবে মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়, যিনি জীবন ও মৃত্যু দাতা, স্রষ্টা, জীবিকা দাতা, সুদক্ষ শাসক ও মহাজ্ঞানী!

'তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা প্রথম দিকে ছিলে মৃত তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, অতপর তিনি পনুরায় তোমাদের মৃত্যু দেবেন। (সর্বশেষে) তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান ..... জন্যে তৈরী করেছেন। অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সাত আসমান তৈরীর কাজকে সুষম করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।' (আয়াত ২৮-২৯)

আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ

বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র আল্লাহর এতো নেয়ামত ও এতো নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তাঁর অবাধ্য হওয়া এক জঘন্য ও নিকৃষ্ট ধরনের কুফরী। অথচ এই কুফরী সম্পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই করা হয়ে থাকে। ঈমানের সপক্ষে কোরআন মানুষের সামনে এমন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করে যা অস্বীকার করা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয় এবং যার দাবী অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কোরআন বলে যে, তারা প্রাণহীন ছিলো , আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রাণ দান করেছেন। এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার এটা স্বীকার করলে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্ব না মেনে উপায় থাকে না। মানুষ একটা জীবন্ত প্রাণী। কিন্তু কে দিলো তাকে এই জীবন? ভূপৃষ্ঠে এত জড় পদার্থের মাঝে এই নতুন অতিরিক্ত উপসর্গটির কে অস্তিত্ব দান করলো? জীবনের প্রকৃতি জড়পদার্থে বিরাজমান নির্জীব অবস্থার প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে তা কোথা থেকে এল? বিবেক ও মনের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টিকারী এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। এমন উপায়ও নেই যে, সৃষ্টিজগতের ঊর্ধের কোন শক্তি জীবনের উদগাতা বলে দেখানো যাবে। পৃথিবীতে বিরাজমান সকল জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন রকমের চালচলন সক্ষম এই জীবন কোথা থেকে এলো? নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এটাই নিকটতম ও সম্ভাব্যতম জবাব। এ জবাব যার মনোপুত নয় তার বলা উচিত প্রকৃত জবাব কী? এই তত্ত্ব নিয়েই কোরআন এখানে মানুষের সম্মুখীন হচ্ছে এবং প্রশ্ন রাখছে,

'কিভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করছ, অথচ তোমরা মৃত ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন?'

অর্থাৎ তোমাদের চারপাশে বিদ্যমান নির্জীব পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তাহলে যে সত্তার কাছ থেকে জীবন লাভ করা হয়, তাঁকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

'অতপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন।'

সম্ভবত এ বিষয়ে কোন বিতর্ক বা সংশয় দেখা দেবে না। কেননা প্রাণীকুল প্রতি মুহূর্তে এ সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকে। মৃত্যু নিজেই তাদের ঘাড়ে চেপে বসে। কোন বিতর্ক বা সংশয়ের তোয়াক্কাই করে না।

'অতপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করেন।'

এই বিষয়টা নিয়েই ছিলো তাদের যত প্রশ্ন এবং যত সন্দেহ সংশয় ও বিতর্ক। এ যুগেরও অনেক বিকৃত বিবেক ও সহস্রাধিক বছর পুরানো প্রাচীন জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পিত লোকেরা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অথচ প্রথমবারের জীবন লাভের ব্যাপারটা নিয়ে

চিন্তা-ভাবনা করলে এটা নিয়ে বিস্ময়ের আর কোনো অবকাশ থাকে না, এটাকে মিথ্যা ভাবারও কোনো সুযোগ থাকে না।

'অতপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।'

অর্থাৎ ঠিক যেমন তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছিলো , যেভাবেই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। পৃথিবীতে যেভাবে তোমাদের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিলো , সেভাবেই তোমরা আবার পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহরই ইচ্ছায় তোমরা যেমন মৃত্যুর জগত থেকে জীবনের জগতে স্থানান্তরিত হয়েছিলে, ঠিক তেমনি তাঁরই ইচ্ছায় তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হবে যাতে তোমাদের ওপর তাঁর ফায়সালা কার্যকর হয়, তিনি তোমাদের বিচার করতে পারেন।

এভাবে একটি মাত্র ক্ষুদ্র আয়াতে মানব জাতির সমগ্র খাতা খোলা ও বন্ধ করা হয়। একটি মাত্র ঝলকে মানব জাতিকে, স্রষ্টার মুঠোর মধ্যে সমর্পণ করা হয়। প্রথমবারে তিনি তাকে মৃত্যুর অসারতা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। অতপর তাকে প্রথমবারের মত মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করেন। তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করেন, অতপর চূড়ান্ত পর্যায়ে তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়-ঠিক যেমন শুরুতে তিনি জীবনের সূচনা করেন। এই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় মহা শক্তিধর স্রষ্টার অপার শক্তি মহিমাই ফুটে উঠেছে। এর ভেতর দিয়ে চেতনায় তাঁর গভীর ও কার্যকর প্রভাব পড়ে। এর পরবর্তী আয়াতে রয়েছে প্রথম ঝলকের পরিপূরক আরেকটি ঝলক,

'তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতপর আকশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাতটি আকাশে সমন্বিত করলেন। তিনি সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।'

তাফসীরকাররা ও আকীদা শাস্ত্রবিদরা এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-তত্ত্ব, আকাশ ও পৃথিবীর কোনটি আগে ও কোনটি পরে সৃষ্ট এবং আল্লাহর মনোনিবেশ করা ও সমন্বিত করার তাৎপর্য কি সে সম্পর্কে অনেক কথা বলে থাকেন। কিন্তু তারা এ কথা ভুলে যান যে, 'আগে' ও 'পরে' এমন দুটো পরিভাষা, যার কোনো তাৎপর্য আল্লাহর বেলায় নেই। তারা এও ভুলে যান যে, মনোনিবেশ করা ও সমন্বিত করা এমন দু'টো আভিধানিক পরিভাষা, যা মানুষের সীমিত কল্পনায় অসীমকে নিকটতম করে মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। কোরআনের এই পরিভাষাগুলো সম্পর্কে মুসলিম আলেমদের মাঝে যে সার বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, তা গ্রীক দর্শন ও ইহুদী-খৃষ্টানদের ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কূটতর্কের কুফল ছাড়া কিছু নয়। এই কূটতর্ক যখন স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল আরবীয় যুক্তিবাদ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী যুক্তিবাদের সংমিশ্রণে এসেছে, তখন তা এই রূপ ধারণ করেছে। আজকের দিনে এই অবাঞ্ছিত বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আমাদের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়, তাহলে আমরা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কোরআনের সহজাত সৌন্দর্যকে 'কালাম' শাস্ত্রের (যুক্তি বিদ্যা) বিতর্কে জড়িয়ে বিনষ্ট করে ফেলবো।

এবার আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল জিনিস মানুষের জন্যে সৃষ্টি করার তাৎপর্য কী, এ দ্বারা মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায়, কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্যে পৃথিবীতে মানুষের আগমন, আল্লাহর মানদন্ডে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা কী এবং ইসলামী আদর্শে ও ইসলামী সমাজের পরিচালনায় মানুষের গুরুত্ব কতটুকু ইত্যাদি বিষয়ে। আল্লাহ বলেন,

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।'

এখানে 'তোমাদের জন্যে' অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যবহ ও সুক্ষ্ম ইংগিতবহ। এখানে এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ সমাধা করার জন্যে পাঠিয়েছেন, পৃথিবীতে সে আল্লাহর প্রতিনিধি হবে, পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছুর মালিক হবে এবং পৃথিবীর ওপর কার্যকর কর্তৃত্ব চালাবে-এ উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর এই বিস্তীর্ণ রাজ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ প্রাণী। সে-ই এই বিশাল উত্তরাধিকার সম্পত্তির প্রধান শাসক ও পরিচালক। সুতরাং পৃথিবীতে, পৃথিবীর ঘটনাবলীতে এবং তার বিকাশ ও বিবর্তনে তার ভূমিকাই প্রধান। সে ভূমিরও অধিপতি, যন্ত্রপাতিরও অধিপতি। আজকের বস্তুবাদী জগতের মত সে যন্ত্রের গোলাম নয়। যন্ত্র মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ও তাদের সঠিক অবস্থায় যে পরিবর্তন এনেছে, মানুষ তার তল্পীবাহক ও অন্ধ অনুসারী নয়, যদিও বস্তুবাদী ও জড়বাদী সভ্যতার তল্পীবাহকরা এই দাবীই করে থাকে। তারা মানুষের ভূমিকা ও কর্মকান্ডকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাই তাকে অচেতন যন্ত্রের গোলাম বানিয়ে দেয়। অথচ সে হচ্ছে মহা সম্মানিত নেতা। কোনো জড়বাদী মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে বেশী মূল্যবান হতে পারে না এবং তাকে মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়া যায় না। আর মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয় এমন কোনো বিষয় যতই বস্তুবাদী সমৃদ্ধির কারণ হোক না কেন, তা মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধী। তাই সব কিছুর আগে ওসব কিছুর উর্ধে স্থান দিতে হবে মানুষের মর্যাদা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে।

আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দিয়ে মানুষকে পরম অনুগৃহীত করেছেন বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন এবং যে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার জন্যে তাকে ধিক্কার দেন, সেটা শুধু তার জন্যে পৃথিবীর সব কিছুকে সৃষ্টি করা নয়, বরং সেই সাথে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর ওপর মানুষের আধিপত্য লাভ করা এবং তাকে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর চেয়ে বেশী মূল্য ও মর্যাদা দান করাও অন্তর্ভুক্ত। এই মর্যাদাটা আর কিছু নয়, খেলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের নেয়ামত। এ নেয়ামত রাজত্বের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

'অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাতটি আকাশে সমন্বিত করলেন।'

এখানে মনোনিবেশ করার তাৎপর্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামানের অবকাশ নেই। এর তাৎপর্য হলো, তিনি নিজের সর্বাত্মক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেন এবং তাঁর আকৃতি ও পরিধি নিয়েও মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই। এদ্বারা যে মূল সত্যটা প্রকাশ করা হয়েছে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সে সত্যটি এই যে, তিনি এই মহাবিশ্বের আকাশ ও পৃথিবীকে সুষ্ঠু ও সা স্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। অথচ সেই বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা এবং যিনি তাঁর ওপর নিরংকুশ ও সার্বভৌম আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অধিকারী যিনি মানুষের জন্যে পৃথিবীর সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে পৃথিবীতে তার জীবন যাপন সম্ভব ও আরামদায়ক হয়, সেভাবে আকাশকে সমন্বিত করেছেন, সেই মহান রব্বুল আলামীনকেই মানুষ অস্বীকার করে চলেছে!

'তিনি সকল জিনিস সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান রাখেন।'

কেননা তিনিই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, সকল জিনিসের নিয়ন্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিকল্পনাকারী। সকল জিনিসের ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্তা হওয়ার মত সকল জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার গুণটিও এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর সর্বাসদ আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায়। আর এত নেয়ামত ও জীবিকা যিনি দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একমাত্র তাঁরই এবাদাত ও ফরমাবরদারী করার দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়।

এভাবে সূরার প্রথম পর্ব শেষ হলো। এর পুরোটাই ঈমান এবং পরহেযগার মোমেনদের পদাংক অনুসরণ ও তাদের দলভুক্ত হবার দাওয়াতে কেন্দ্রীভূত।

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও তার খেলাফত

পবিত্র কোরআনে যে কেসসা কাহিনী বর্ণনা করা হয়, তা বিভিন্ন উপলক্ষ ও পটভূমি অনুসারেই করা হয়। এসব পটভূমি ও উপলক্ষই কেসসা কাহিনীগুলোর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নির্ণয় করে। এর মাধ্যমে সে কিসসার সাথে তার আধ্যাত্মিক, চিন্তাগত ও শৈল্পিক পরিবেশের সমন্বয় সাধিত হয়। আর এভাবেই তা তার বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা, তার মনস্তাত্বিক উদ্দেশ্য এবং কাংখিত প্রভাব বাস্তবায়িত করে থাকে।

কেউ কেউ মনে করে, কোরআনে কেসসা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। একাধিক সূরায় একই ঘটনা বর্ণিত হওয়ার কারণেই এরূপ ধারণা জন্মেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, কোন কিসসাই বা কোনো কেসসার অংশই একই আকৃতিতে এবং একই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরাবৃত্ত হয়নি। যেখানেই কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেখানে নতুন কোনো না কোনো বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ফলে তাকে আর পুনরাবৃত্তি বলে মনে করার অবকাশ নেই।

কেউ কেউ খানিকটা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে ভাবেন যে, এসব কেসসা ও কাহিনীতে ঘটনার গতিধারায় কিছুটা কৃত্রিমতা ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিছক কাহিনী রচনার শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখানোর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যে কোন সত্যনিষ্ঠ, সুস্থ ও স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন কোরআন পাঠকের কাছে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বিষয়বস্তুর সাথে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই প্রত্যেক জায়গায় কেসসার আকৃতি ও বর্ণনাভংগীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোরআন তো আসলে একটি দাওয়াতী গ্রন্থ, জীবন যাপনের একটি বিধান এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি সংবিধান। এটা কোন উপন্যাস, উপাখ্যান, ইতিহাস বা বিনোদনমূলক পুস্তক নয়। দাওয়াতের প্রসংগেই কেসসা কাহিনী এসে যায় এবং যতটুকু ও যেভাবে বক্তব্য ও পরিবেশের দাবী, শুধু ততটুকুই এবং সেভাবেই তা বর্ণনা করা হয়। এতে কোন কৃত্রিমতা ও অবাস্তব কল্পনা বিলাসের ওপর নির্ভরশীলতা নেই, বরং প্রকৃত শৈল্পিক সৌন্দর্যই এতে উদভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে বাচনভংগীতে আছে নতুনত্ব, সত্যের তেজস্বীতা ও প্রকাশের লালিত্য।

কোরআনের বর্ণিত নবীদের কেসসা কাহিনীতে মোমেনদের কাফেলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী দীর্ঘ অভিযাত্রার প্রফিলন ঘটেছে। যুগ যুগ ধরে কিভাবে মানুষরা তাতে সাড়া দিয়েছে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই মনোনীত মানব গোষ্ঠীর ঈমান কত উন্নতমানের ছিলো এবং যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন দুর্লভ অনুগ্রহে অনুগৃহীত করেছেন তাঁর সাথে তারা কিরূপ সম্পর্ক রাখতেন তাও এসব কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরম সম্মানিত মানব গোষ্ঠী স্বীয় উন্মুক্ত রাজপথে এমনভাবে চলে যে, তাদের হৃদয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য প্রস্ফুটিত ও উদ্ভাসিত হতে থাকে। আর মানুষের মনে এই মহামূল্যবান উপাদান ঈমানের উৎকৃষ্টতা ও মৌলিকতার ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়। সেই সাথে ঈমানী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে অন্য সকল ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত ও নির্ভেজাল রাখে। এ জন্যে কেসসা কাহিনী কোরআনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে সূরা বাকারার এই অংশে হযরত আদম (রা.)-এর কাহিনীটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবজগত শুধু নয় বরং গোটা সৃষ্টিজগত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মানুষের ওপর বর্ষিত আল্লাহর অঢেল নেয়ামতের বর্ণনা প্রসংগে পৃথিবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে এখানে আদম (আ.)-কে খেলাফত দানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা কিছু সুনির্দিষ্ট অংগীকার ও শর্তের ভিত্তিতে এবং খেলাফত পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য জ্ঞান দানের পর পৃথিবীর শাসনভার তার হাতে অর্পণ করেন। এই সাথে এ ঘটনা পৃথিবীতে বনী ইসরাঈলকে অনুরূপ অংগীকারের ভিত্তিতে খেলাফতদানের বিষয়টি আলোচনার ভূমিকা হিসাবে স্থান লাভ করেছে। এরপর কিভাবে সেই খেলাফত থেকে বনী ইসরাঈলকে পদচ্যুত করে সেই গুরু দায়িত্ব আল্লাহর অংগীকার পালনকারী মুসলিম উম্মাহকে প্রদান করা হয়েছে, সে বিবরণ সামনে আসছে। কাজেই আদম (আ.)-এর কাহিনীটি সূরার পূর্বাপর আলোচনার সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আসুন, আমরা প্রথম মানব প্রজন্মের ঘটনাবলী ও তার মূল শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি। এই ঘটনা আলোচনা করতে করতে আমরা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতা পরিবেষ্টিত পবিত্র অংগনটিতে এসে পৌঁছে গেছি। আমরা যেন প্রথম মানুষটির ঘটনাবলী নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি,

'যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাতে চাই।'

অর্থাৎ যখন মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ ইচ্ছা এই নতুন সৃষ্টির হাতে পৃথিবীর দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে মানুষের হাতকে ক্ষমতাশালী করে দিয়েছেন। তার কাছে ন্যস্ত করেছেন নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ ও সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান শক্তি ও খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন এবং গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপন অনুগত করার আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের ক্ষমতা। এটাই ছিলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার উপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তখন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সকল সুপ্ত শক্তি এবং সকল গুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করলেন যাতে সে পৃথিবীর সকল শক্তিকে এবং সকল খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামালকে ব্যবহার করতে পারে। আর আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রয়োজন, তাও তাকে দিলেন।

তখন পৃথিবী ও গোটা সৃষ্টি জগতকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তি এবং এই নতুন সৃষ্টি (মানুষকে) এবং তার শক্তি ও ক্ষমতাকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে সংঘাত না বেধে যায় এবং এই বিশাল বিশ্বে মানুষের শক্তি ধ্বংস হয়ে না যায়। তখন মানুষ সত্যিই অর্জন করলো এক সুমহান মর্যাদা। এই প্রশস্ত পৃথিবীতে মানুষ এক পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো। এসবই হচ্ছে মহান আল্লাহর 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলিফা পাঠাতে মনস্থ করেছি' এই উক্তির কিছু ব্যাখ্যা। সচেতন স্নায়ুমন্ডল ও উন্মুক্ত অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে এবং এই নব্য সৃজিত প্রতিনিধির হাতে এই বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এ উক্তির উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই যুক্তি সংগত মনে হবে।

ফেরেশতারা বললো, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে যাচ্ছো যে সেখানে গিয়ে অনাচার ও অরাজকতা বিস্তার করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তো তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণায় (সারাক্ষণ) নিয়োজিত আছি।'

ফেরেশতাদের এ উক্তি থেকে ধারণা জন্মে যে, তাদের কাছে এমন কিছু তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য প্রমাণ ছিলো অথবা অতীতের সঞ্চিত এমন কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো কিংবা এমন কিছু প্রজ্ঞাজাত ধ্যান-ধারণা ছিলো যা দ্বারা তারা এই নতুন সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতি কিংবা পৃথিবীতে তার জীবন যাপনের অনিবার্য ফল হিসাবে কী সংঘটিত হবে, তা আঁচ করতে পেরেছিলো। তারা হয়তো বুঝতে পেরেছিলো কিংবা আশংকা করেছিলো যে, নতুন এই প্রতিনিধি পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াবে ও রক্ত পাত ঘটাবে। ফেরেশতারা নিষ্পাপ স্বভাববশত নির্ভেজাল কল্যাণ ও পরিপূর্ণ শান্তি ছাড়া আর কিছু হয়তো ভাবতেও পারে না। সে জন্যে তারা হয়তো মনে করে আল্লাহর প্রশংসা, গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করা ছাড়া কোনো সৃষ্টির জন্মের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এবং ওটাই সৃষ্টির প্রথম ও একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এ জিনিসটা তো ফেরেশতাদের দ্বারাই সমাধা হয়ে যাচ্ছে, তারা দিনরাত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে থাকে। তারা অহোরাত্র অক্লান্তভাবে ও অবিশ্রান্তভাবে তাঁর এবাদাত করে থাকে।

কিন্তু আল্লাহর এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের জানা ছিলো না। তাদের জানা ছিলো না পৃথিবীর সৃষ্টি, উন্নয়ন ও বিকাশসাধন, জীবনের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি, স্রষ্টার ইচ্ছা ও প্রকৃতির নিয়ম বাস্তবায়ন, প্রকৃতির উন্নয়ন ও সংশোধন ইত্যাদি কাজ আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর নিযুক্ত খলীফার হাতে সমাধা হওয়ার মধ্যে কী রহস্য ও কী বিচক্ষণতা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর এই খলীফা কখনো দাংগা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে, কখনো রক্তপাতও ঘটাতে পারে, কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান আংশিক অকল্যাণ ও অনাচারের মধ্য দিয়ে সে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনও করে থাকে। স্থায়ী উন্নতি ও অপ্রতিহত প্রগতিও অব্যাহত থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে, 'তিনি বললেন! আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

'আল্লাহ তায়ালা অতপর (তাঁর প্রতিনিধি) আদমকে (প্রয়োজনীয় সব ধরনের) জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি তা ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, (আমার প্রতিনিধি সংক্রান্ত সে আশংকার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো? ফেরেশতারা বললো, (হে আল্লাহ তায়ালা,) একমাত্র তুমিই (সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত এবং) পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই, যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো, তুমিই একমাত্র জ্ঞানী একমাত্র কুশলী। তখন (তা দেখে) আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গোপন রহস্য জানি। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো–আর যা কিছু গোপন করো আমি তা ভালোভাবেই জানি।' (আয়াত ৩০-৩৩)

মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

এ পর্যায়ে আমরা যেন অর্ন্তচক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যা ফেরেশতারা দেখেছিলেন। খেলাফতের দায়িত্ব অর্পনকালে যে গুপ্ত রত্নভান্ডার আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়েছিলেন, তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। সে জিনিসটা হচ্ছে নাম দ্বারা নির্দিষ্ট জিনিসকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা, ব্যক্তি ও বস্তুর নাম রাখার ক্ষমতা এবং সেই নামকে সে ব্যক্তি বস্তুর সংকেত চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা, মানুষ এভাবে নামকে জিনিসের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করতে না

পারলে কিরূপ জটিলতা দেখা দিতো, তা কল্পনা করলেই এই ক্ষমতার মূল্য কত তা আমরা বুঝতে পারি। পারস্পরিক লেনদেন ও মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কি দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তা একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। একটি জিনিসকে নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করতে চাইলে সে জিনিসটাকে হাযির করতে হতো। নচেত পুরো কথাটাই দুর্বোধ্য থেকে যেতো। মনে করুন একটি খেজুর গাছের কথা আমি বলতে চাই। তাহলে আস্ত একটা খেজুর গাছ সামনে দাঁড় করিয়ে তবেই তার সম্বন্ধে কথা বলতে হতো। একটা পাহাড় সম্বন্ধে কথা বলতে হলে বক্তা ও শ্রোতাকে স্বশরীরে সোজাসুজি পাহাড়ের কাছে চলে যেতে হতো। কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা বলতে হলে সেই ব্যক্তিকে স্বশরীরে সেখানে হাযির করে নিতে হতো। এভাবে এ সমস্যা এত কঠিন আকার ধারণ করতো যে, আল্লাহ মানুষকে নাম ব্যবহারের ক্ষমতা না দিলে তাদের গোটা জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠতো।

ফেরেশতাদের এই গুণটির কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের দায়িত্ব পালনে নামের কোনো অবশ্যকতা নেই, তাই এ জ্ঞান তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম (আ.)-কে এ গুপ্ত রহস্য অবহিত করলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে যা উপস্থাপিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন তা উপস্থাপিত করলেন, তখন সে সবের নাম ফেরেশতাদের জানা ছিলো না। সুনির্দিষ্ট কিছু বস্তু ও ব্যক্তিকে কিভাবে শাব্দিক সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তা তারা জানতো না। এই অক্ষমতার সম্মুখীন হয়ে তারা উচ্চস্বরে আল্লাহর গুণগান করতে লাগলো। তারা তাদের অক্ষমতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করলো। আসলে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি তাদেরকে শেখাননি কিন্তু আদমকে শিখিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর অতলস্পর্শী জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হবার উপদেশ দেন এভাবে,

‘তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অজানা তথ্য জানি এবং যা তোমরা প্রকাশ করে থাকো ও যা গোপন করো–তাও জানি?’

‘আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা আদমের জন্যে (সম্মানের) সেজদা (পেশ) করো, তারা (আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়ে) আদমের সামনে সেজদাবনত হলো–শুধু ইবলিস ছাড়া সে অহংকারের বড়াই করলো এ..... তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত কিছু) হেদায়াত আসবে। অতপর যে আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো উৎকণ্ঠা (কিংবা) চিন্তারও কারণ থাকবে না। আর (যারা আমার বিধানকে) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (লাগামহীন জীবনযাপন করবে) তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে এবং চিরস্থায়ী থাকবে।’ (আয়াত ৩৪-৩৯)

আদম (আ.)-এর সম্মান, পদস্খলন ও ইবলীসের পতন

‘আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদম (আ.)-কে সেজদা কর, তখনি তারা সেজদা করলো।’

মানুষ নামের এই প্রাণী পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়ায় ও রক্তপাত ঘটায়। অথচ তাকে এমন কিছু গোপন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তাকে ফেরেশতার চেয়েও ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে। এ জন্যে তাকে এই বিরল ও সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তাকে দেয়া হয়েছে অজানা জিনিসের জ্ঞান এবং জীবন যাপনের পথ ও পন্থা নির্বাচনের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি। তার দ্বৈত স্বভাব, তার নিজ কর্মপন্থা নির্বাচনে নিজ ইচ্ছা শক্তিকে কার্যকর করার ক্ষমতা, তার নিজ চেষ্টায় আল্লাহর পথে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এসব বৈশিষ্টের কারণেই মানুষ এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা সেজদা করেছিলেন।

'কিন্তু ইবলীস সেজদা করেনি, সে এ নির্দেশ অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'

এখানে মানব চরিত্রের খারাপ বৈশিষ্ট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সেটি হলো মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, অহংকারের বশে যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকৃতি, পাপ কাজের মাধ্যমে মর্যাদাশালী ও প্রতাপশালী হবার চেষ্টা এবং নিজের অপছন্দনীয় কিছু বুঝতে না চাওয়ার মাধ্যমে হটকারী ও একগুঁয়ে মনোভাব প্রদর্শন।

আয়াতের বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায় যে, ইবলীস ফেরেশতা ছিলো না। সে তাদের সংগী ছিলো মাত্র। সে যদি ফেরেশতা হতো, তাহলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করতো না। কেননা কোরআনেই তাদের প্রাথমিক গুণ বলা হয়েছে এই যে, 'তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, যা আদেশ পায়, তাই করে।' ইবলীস যে ফেরেশতা ছিলো না সে কথা কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আগুন থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রকৃত লড়াই এর ময়দান চিহ্নিত হয়ে গেছে। অন্যায় ও অসত্যের ইবলীসী শক্তি আর পৃথিবীতে নিযুক্ত আল্লাহর খলীফার মধ্যে এ লড়াই চলে আসছে। মানুষের বিবেকের অভ্যন্তরে চালু এ এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাত। এ দ্বন্দ্ব সংঘাতে ন্যায়ের শক্তি ঠিক ততখানি সাফল্য ও বিজয় লাভ করে, যতটা মানুষ তার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা এবং আল্লাহর সাথে কৃত স্বীয় অংগীকার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ের জন্যে সচেষ্ট হয়। আর এতে অন্যায় ও অপশক্তি ঠিক ততখানি সাফল্য ও বিজয় লাভ করে, যতখানি মানুষ তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে যতখানি দূরে সরে যায়।

আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এর ভেতর থেকে যা খুশী তৃপ্তি সহকারে খাও দাও। কেবল এই গাছটার ধারে খাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।'

তাদের জন্যে বেহেশতের যাবতীয় ফলমূল বৈধ করা হয়েছিলো। কেবল একটি গাছ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। সম্ভবত সে গাছটিকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিছু নিষিদ্ধ জিনিস না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায় না এবং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন মানুষকে ইচ্ছা শক্তিহীন পশু পাখী থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষ কতটা ধৈর্যসহকারে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারে তার পরীক্ষা নিষিদ্ধ জিনিস ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতাই হলো মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি। যাদের ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায় বাছবিচার করার ক্ষমতা নেই এবং নির্বিচার জীবন যাপন করে তারা দেখতে মানুষ হলেও এরা আসলে পশু। 'অতপর শয়তান তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো এবং যে অবস্থায় তারা ছিলো তা থেকে তাদেরকে বের করলো।'

কত নিখুঁত ও চমকপ্রদভাবে ঘটনাটার ছবি আঁকা হয়েছে, ভেবে অবাক হতে হয়! 'সে পদস্খলন ঘটালো।' কথাটা যেন কাজটির অবিকল ছবি! পাঠকের মনে হবে শয়তান কিভাবে তাদের উভয়কে বেহেশতে থেকে বের করে দিচ্ছে, কিভাবে তাদের পা ঠেলে দিচ্ছে এবং তার ফলে তারা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে, তা যেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তখন আদম (আ.) তার অংগীকার ভুলে গেলেন এবং শয়তানের বিভ্রান্তিকর উপদেশের সামনে দুর্বল হয়ে গেলেন। আর তখনই আল্লাহর ফায়সালা সত্য হয়ে দেখা দিলো,

'আমি বললাম, তোমরা সবাই পরস্পরের শত্রু হয়ে এখান থেকে নেমে যাও। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ভোগের সামগ্রী থাকবে।'

এ উক্তিটি ছিলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শয়তান ও মানুষের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা।

আদম (আ.) তার সহজাত গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ভুল শুধরে নিলেন আর আল্লাহর রহমতও তিনি পেলেন। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণকারী হলেন। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ তায়ালার এ রহমত পেয়ে থাকে।

'অতপর আদম তার প্রভুর কাছ থেকে কিছু কথা শিখে নিলো, আর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়।'

এরপর আল্লাহর শেষ কথাও সত্য হলো, আদম (আ.) ও তার বংশধরের সাথে তাঁর শাশ্বত অংগীকার বাস্তব রূপ লাভ করলো। পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত লাভ এবং সুখ সমৃদ্ধি অথবা পতন ও ধ্বংসের আকারে সে অংগীকার কার্যকর হবে।

'আমি বললাম, তোমরা সবাই বেহেশতে থেকে নেমে যাও। তারপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে যখনি কোনো পথনির্দেশ আসে তখন যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ অনুসরণ করবে, তার কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। আর যারা তা অমান্য করবে এবং আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে দোযখের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে।'

এভাবে এই শাশ্বত লড়াই-সংঘাত তার আসল রণাংগনে স্থানান্তরিত হলো। এ যুদ্ধ সেই থেকেই শুরু হয়েছে। কখনো তা ক্ষণেকের জন্যেও স্তিমিত হয় না এবং থামেও নি। মানুষ তার জীবনের সূচনাকাল থেকেই জানে যে, সে এই লড়াইতে জিততে চাইলে কিভাবে জিততে পারে এবং বিপর্যয় ও পরাজয় চাইলে কিভাবে সে বিপর্যস্ত হবে।

এ পর্যায়ে আমাদেরকে এ কাহিনীটির ওপর আরেকবার নযর বুলাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে যে কথাটা বলেছিলেন তা হলো, 'আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা পাঠাবো।' এ থেকে বুঝা যায়, হযরত আদম প্রথম থেকেই এই পৃথিবীর জন্যেই সৃষ্ট হয়েছিলেন। তাহলে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ থাকার রহস্য কি? কি কারণে আদমের পরীক্ষা হলো? আর কেনই বা তাকে দুনিয়ায় নামতে হলো? অথচ প্রথম থেকেই তো তিনি এই পৃথিবীর অধিবাসী হিসাবে মনোনীত ছিলেন।

আমার কাছে এরূপ প্রতিভাত হচ্ছে যে, এই পরীক্ষাটা ছিলো আল্লাহর এই খলীফার জন্যে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক। তার ব্যক্তি সত্তায় নিহিত সুপ্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা। গোমরাহীর পথ গ্রহণ করলে কী পরিণাম ভোগ করতে হয়, কিরূপ অনুতপ্ত হতে হয়, কিভাবে শত্রুকে চিনতে হয় এবং কিভাবে অতপর আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়, এটি ছিলো তারই প্রশিক্ষণ। নিষিদ্ধ বৃক্ষ, শয়তানের পক্ষ থেকে তার ফল আস্বাদনের প্ররোচণা, আল্লাহর অংগীকার ভুলে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া, তারপর বিভ্রান্তির ঘোর কেটে গেলে সচেতন হওয়া, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার এই সমগ্র কাহিনী মানব জাতির প্রত্যেক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা। যুগে যুগে বারবার মানব জাতির অবিকল এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করে থাকে।

এই নতুন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর দয়া অনুগ্রহেরই দাবী ছিলো এই যে, তাকে এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তার খেলাফাতের কর্মস্থলে পাঠাবেন। কেননা তাকে দীর্ঘকালব্যাপী এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এক চিরন্তন সংগ্রামে তাকে লিপ্ত হতে হবে। সে জন্যে তাকে সতর্ক ও সচেতন করে এবং ভালোভাবে প্রস্তুত করে পাঠানো তার রহমতেরই দাবী ছিলো ।

এখানে পুনরায় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, এই ঘটনা কোথায় ঘটেছিলো ? যে বেহেস্তে আদম ও তাঁর স্ত্রী কিছুকাল কাটিয়েছেন সেটি কি ধরনের? ফেরেশতারাই বা কারা? ইবলীস কে? কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বললেন? আর কিভাবেই বা তারা জবাব দিল? এগুলো এবং কোরআনে বর্ণিত এ ধরনের অন্যান্য বিষয় সম্পূর্ণ অদৃশ্য ব্যাপার। একমাত্র আল্লাহই এসব প্রশ্নের জবাব জানেন এবং নিজের সূক্ষ্মতম জ্ঞান দ্বারা তিনি জানতেন যে, এসব সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ব্যাপার জেনে মানুষের কোন লাভ নেই। পৃথিবীতে খেলাফতের কাজ পরিচালনার জন্যে তিনি যেসব উপকরণ সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছেন, সে সব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ও অনুধাবন করার ক্ষমতা তিনি মানুষকে দেননি, আর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যেও তা জরুরী নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের যতটুকু আল্লাহ মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যের যতটুকু তাকে অবহিত করেছেন, তার দায়িত্বের গন্ডী সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। জানা নিষ্প্রয়োজন বিধায় যে গুপ্ত রহস্য তার অগোচরে রেখেছেন, তা তার দায়িত্বের সীমারও বাইরে। প্রাকৃতিক রহস্যের যেটুকু তিনি তার কাছে উন্মোচন করেছেন, সেটুকু পেয়েও সে তার হস্তগত সাজ সরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধা দ্বারা এ কথাও জানতে পারে না যে, এক মুহূর্ত পরে পরে তার কী ঘটবে, কিংবা যে নিশ্বাস তার বেরিয়ে গেছে, তার কাছে আবার ফিরে আসবে কিনা। মানুষের আগোচরে রাখা অদৃশ্য জ্ঞানের এ হলো একটি নমুনা মাত্র। এটা জানা তার খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে জরুরী তো নয়ই, বরঞ্চ এগুলো উন্মোচন করলে হয়তো তা তার দায়িত্ব পালনকে বাধাগ্রস্ত করতো। এ ধরনের আরো বহু প্রকারের গুপ্ত রহস্য রয়েছে যা মানুষের অজানা রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তা জানেনা।

এ কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এ জাতীয় গুপ্ত রহস্য উদঘাটনের জন্যে কোনো প্রচেষ্টা চালানোর যোগ্যতা দেয়া হয়নি, কেননা তার কোনো উপকরণ বা সাজ-সরঞ্জাম তার আয়ত্তে নেই। এ জন্যে যে প্রচেষ্টাই চালানো হবে, তা হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, নিষ্ফল ও বৃথা।

আর এই অজানা গায়েবী রহস্যকে জানবার কোনো উপায়-উপকরণ যখন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে দেয়া হয়নি, তখন তার সেটা অস্বীকার করা ধৃষ্টতাও দেখানো উচিত নয়। কেননা অস্বীকার করা এমন একটা সিদ্ধান্ত, যার জন্যে জ্ঞান ও তথ্য দরকার। অথচ জ্ঞান বা তথ্য বিবেকের স্বভাবজাত নয়, তা অর্জন করা তার আয়ত্তাধীনও নয়, আর তা তার দায়িত্ব পালনের জন্যেও জরুরী নয়।

অলীক ও ভিত্তিহীন অনুমানকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া ভীষণ বিপজ্জনক বটে। তবে তার চেয়েও বিপজ্জনক ও মারাত্মক ব্যাপার হলো, শুধুমাত্র নিজের অজ্ঞতার অজুহাতে অজানা ও অদৃশ্য জিনিসকে একেবারেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। সেটা হবে পশুত্বের স্তরে অধপতনের শামিল। পশুর বিচরণ তো নিছক ইন্দ্রীয়জাত অনুভূতির গন্ডীতে সীমিত এবং এর বাইরে যে, বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত জগত রয়েছে, তা তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

সুতরাং এই গায়েব বা অজানা অদৃশ্য জগতকে সেই জগতের একক মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর হাতে সমর্পণ করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের জীবন যাপনের জন্যে যতটুকু উপযোগী এবং আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংশোধনের জন্যে যতটুকু জরুরী, ততটুকু অদৃশ্য তথ্য তিনিই আমাদেরকে জানাবেন এবং সেটুকুই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর এই কাহিনীতে অজানা প্রাকৃতিক ও মানবিক তত্ত্ব তথ্য ও রহস্য সম্পর্কে যে ইংগিত রয়েছে, সৃষ্টিজগত ও তার বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংযোগের যে ধারণা দেয়া হয়েছে, এই মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও মূল্যমান

সম্পর্কে যে আভাস দেয়া হয়েছে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এটুকুই মানবতার জন্যে সর্বাধিক লাভজনক ও কল্যাণকর। আমি তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এ এই মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংক্ষিপ্তভাবে এই সব ইংগিত, তত্ত্ব ও তথ্য এবং ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবো।

এই স্থানে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইংগিত এই যে, পৃথিবীতে মানুষ যে ভূমিকা পালন করে থাকে ইসলাম তাকে এজন্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, সৃষ্টি জগতের সার্বিক বিধিব্যবস্থায় তার অবস্থানকে, তার মর্যাদা নির্ণয়কারী মূল্যবোধকে, আল্লাহকে দেয়া অংগীকারের সাথে তার সংযোগ ও সম্পর্ককে এবং যে অংগীকারের ভিত্তিতে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তাকেও ইসলাম সর্বাধিক মূল্য দিয়ে থাকে।

এই যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত সর্বোচ্চ পরিষদের সামনে প্রদত্ত এই ঘোষণা থেকেই প্রতিভাত হয় যে, তাকে পৃথিবীতে খলীফা করেই সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সেজদা করার আদেশ দান, অহংকার বশে সেজদা করতে অস্বীকার করায় ইবলীসকে বিতাড়িত করা এবং আদমকে শুরুতে ও শেষে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকেও তা বুঝা যায়।

আল্লাহর খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান

মানুষের প্রতি এই দৃষ্টিভংগী থেকেই তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক উভয় পর্যায়েই তার সম্পর্কে উচ্চ ও মূল্যবান ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে। প্রথমত মানুষ এই পৃথিবীর নেতা এবং তার জন্যেই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন এ কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থ এবং যাবতীয় বস্তুবাদী মূল্যবোধের চেয়ে সে অধিক সম্মানিত, অধিক মর্যাদাবান ও অধিক মূল্যবান। তাই কোনো বস্তুবাদী স্বার্থের খাতিরে তাকে দাসে পরিণত করা বা অপমাণিত করা যেতে পারে না এবং তার কোনো মহৎ মানবিক বৈশিষ্টকে আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা যেতে পারে না। কোনো বস্তুবাদী স্বার্থ উদ্ধার, কোনো বস্তুবাদী জিনিস উৎপাদন কিংবা কোনো বস্তুগত উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির খাতিরে তার কোন মানবীয় মূল্য ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করা যেতে পারে না। এই সমস্ত বস্তুগত উপকরণ মানুষেরই উদ্দেশ্যে এবং মানুষেরই প্রয়োজনে সৃজিত কিংবা নির্মিত। তার মনুষত্বের লালন ও বাস্তবায়ন এবং তার মানবীয় অস্তিত্বকে স্থীতিশীল করার উদ্দেশ্যেই তা সৃজিত বা নির্মিত। সুতরাং এই সমস্ত বস্তুগত স্বার্থ অর্জন করতে গিয়ে তার কোন একটি মানবীয় মূল্যবোধকেও কিংবা তার মর্যাদার কোন একটি উপাদানকেও হারানো ও বিসর্জন দেয়া চলবে না।

দ্বিতীয় যে ধারণাটি পোষণ করা হয় তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম ও অগ্রণী ভূমিকা। পৃথিবী ও তার ভেতরকার যাবতীয় জিনিসের আকার-আকৃতিতে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগে মানুষই রদবদল এনে থাকে এবং মানুষই এসব জিনিসের লক্ষ্য ও গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। কিছু বস্তুবাদী মতবাদ এরূপ রয়েছে, যা মানুষের ভূমিকাকে বেশী তুচ্ছ ও খাটো করে দেখায়। অথচ যন্ত্রের ভূমিকাকে সেই তুলনায় অনেক বড় ও বিরাট করে দেখায়। সেসব মতবাদের মতে, উৎপাদনের উপকরণাদি ও উৎপাদিত সামগ্রীর বন্টন ব্যবস্থাসমূহ মানুষকে তার তুচ্ছ লেজুড় হিসাবে টেনে নিয়ে যায়।

কোরআনের তৈরী পৃথিবীতে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত মানুষ হলো বিশ্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য উপাদান। কেননা পৃথিবীতে তার খেলাফত আকাশের সাথে, বাতাসের

সাথে, বৃষ্টির সাথে এবং সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রের সাথে রকমারি সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। সৃষ্টিলোকের এ সকল উপাদানের নির্মাণ পরিকল্পনা ও আকৃতিগত বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যেন পৃথিবীতে প্রাণীর জীবনধারণ ও মানুষের খেলাফতের দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়। ইসলামে মানুষকে বিশ্বলোকে এই যে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে, বস্তুবাদী মতবাদগুলো কর্তৃক তাকে দেয়া সেই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ভূমিকার সাথে তার কোন তুলনাই হতে পারে না, যার ঊর্ধে ওঠার কোনো সুযোগই তাকে দেয়া হয় না।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মানুষ সম্পর্কে ইসলামের এই দৃষ্টিভংগি এবং তার সম্পর্কে বস্তুবাদী মতবাদগুলোর দৃষ্টিভংগি মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ওপর এবং মানুষের মর্যাদা বা অমর্যাদার ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আজকের বস্তুবাদী জগতে অধিকতর বস্তুবাদী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মানুষের স্বাধীনতা, সম্মান ও মানবীয় বৈশিষ্টের যে অবমাননা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি তা মানুষ ও পৃথিবীতে তার ভূমিকা সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীরই শোচনীয় পরিণতি।

এভাবে মানুষ সম্পর্কে ও মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে ইসলাম যে উচ্চ দৃষ্টিভংগি পোষণ করে, তার ফলে ইসলামের মানদন্ডে মানব জীবনে শিষ্টাচারমূলক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ঈমান, সততা ও নিষ্ঠা সংক্রান্ত মূল্যবোধের গুরুত্ব ও মর্যাদা সর্বাধিক সাব্যস্ত হয়। আর এই সব মূল্যবোধের ওপরেই তার খেলাফতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। একথাই বলা হয়েছে এভাবে, 'আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ যদি তোমাদের কাছে আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ মানবে, তার কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই।'

সকল জড়বাদী ও ভোগবাদী মূল্যবোধের চেয়ে এই মূল্যবোধ শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। এ কথা সত্য যে, এসব জড়বাদী মূল্যবোধের বাস্তবায়নও খেলাফতের আওতাভুক্ত, কিন্তু সেটা এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যে, ওটাই যেন প্রধান কাজ না হয়ে বসে এবং উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধগুলোর ওপর যেন তা অগ্রাধিকার না পায়। বস্তুত এসব উচ্চতর মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের মনকে পবিত্রতা, উচ্চ ও মহৎ মানসিকতা এবং পরিছন্নতায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী মতবাদ মানুষকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং সকল শিষ্টাচার ও সৌজন্যেবোধকে উপহাস করতে শেখায় আর শুধুমাত্র উৎপাদন, ভোগ্যপণ্য ও নিছক পশুর মতো উদরের ক্ষুধা মেটানোর দাবীকে অগ্রাধিকার দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী আদর্শে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কেননা এর ওপরই আল্লাহর খেলাফতের অংগীকার বাস্তবায়ন নির্ভরশীল এবং এটাই ভালো মন্দের দায় দায়িত্ব ও কর্মফল প্রদানের ভিত্তি। সে যদি নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকর করে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত নিজ প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পূরণ করে, প্রবৃত্তির লালসার কাছে নতি স্বীকার না করে তার দিকে ধাবমান গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাকে পরাস্ত করতে পারে, তাহলে ফেরেশতার চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা সে লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে প্রবৃত্তির লালসার কাছে ও সৎ প্রবণতাকে অসৎপ্রবণতার কাছে পরাভূত করে এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন অংগীকারকে ভুলে গিয়ে সে নিজেকে চরম অধঃপতন ও ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করতে পারে। নিসন্দেহে এই স্বাধীনতা সম্মানের লক্ষণ। তা ছাড়া এটা মানুষকে সব সময় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, উন্নয়ন ও অধপতন এবং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী মানুষ ও স্বাধীনতাহীন পশুর মধ্যকার পার্থক্য স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ ও শয়তানের মধ্যকার যে লড়াই এর ছবি ভেসে ওঠে, তা এই লড়াই এর প্রকৃতি ও চরিত্র কেমন, তা সবসময় স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা শয়তানের প্ররোচণার সাথে আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকারের লড়াই, কুফরীর সাথে ঈমানের লড়াই, বাতিলের সাথে হকের লড়াই, আর হেদায়াতের সাথে গোমরাহীর লড়াই। আর মানুষ হচ্ছে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্র। সে নিজেই এ যুদ্ধের বিজয়ী অথবা পরাজিত পক্ষ। এর ভেতরে তাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্যে ক্রমাগত সতর্ক সংকেত দেয়া হয়েছে। তাকে সর্বক্ষণ জানানো হয়েছে সে এ ময়দানে একজন লড়াকু সৈনিক। এখানে হয় সে জিতবে না হয় হারবে।

গুনাহ ও তওবা

সর্বশেষ 'গুনাহ' ও 'তাওবা' সম্পর্কে ইসলামের চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে। গুনাহ তাওবা দু'টোই একান্ত ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের ব্যাপার। এতে কোনো বক্রতা ও জটিলতা নেই। অত্যন্ত সহজ সরল ও সুস্পষ্ট ব্যাপার। খৃষ্টবাদের এ বক্তব্য মোটেই ঠিক নয় যে, মানুষের জন্মের আগে থেকেই তার ঘাড়ে 'পাপ' চেপে বসে আছে। খৃষ্টবাদের এ কথাও সত্য নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) হযরত আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেই শূলে চড়েছেন এবং তার পাপ থেকে তার সন্তানদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। সব একেবারেই বাজে কথা! আদম (আ.)-এর গুনাহ তার ব্যক্তিগত গুনাহ ছিলো । তিনি সরাসরি তাওবা করে নিজেই তা থেকে মুক্ত হয়েছেন একেবারেই সোজা ও সরল পথে চলে এসেছেন। আদম সন্তানদের ও প্রত্যেকের পাপ তার নিজস্ব পাপ। প্রত্যেকের জন্যে সহজ ও সরল উপায়ে তওবার পথ খোলা রয়েছে। এ একটা সুস্পষ্ট ও সরল সান্ত্বনাদায়ক মতাদর্শ যে, প্রত্যেক মানুষ নিজের পাপের জন্যে নিজেই দায়ী, কিন্তু সে জন্যে তার হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। চেষ্টা সাধনা দ্বারা সে তার পাপ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কেননা, 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আদম (আ.)-এর ঘটনা এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু শিক্ষা এখানে তুলে ধরা হলো। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এ এটুকু তুলে ধরাই আমি যথেষ্ট মনে করছি। ইসলামের চিরন্তন তত্ত্ব ও মতাদর্শের এ এক মূল্যবান সমাহার এবং এক অমূল্য সম্পদ। এখানে অতি উচুমানের নির্দেশনা ও আভাস ইংগিতের সমাবেশ ঘটেছে। এখানে একটি উচ্চাংগের সামাজিক আদর্শ ও মহৎ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির ভিত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। সে সমাজের চালিকা শক্তি হলো নির্মল চরিত্র, সততা, কল্যাণ ও মহত্ব। এ শিক্ষা পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তি নির্মাণে কোরআনের কেসসা কাহিনীর গুরুত্ব কতখানি। যে মূল্যবোধ ইসলামী আদর্শের প্রাণশক্তি সেই মূল্যবোধকে ও এই কেসসা-কাহিনী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যে সমাজ আল্লাহর পরিকল্পনার আলোকে ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে, যে সমাজ আল্লাহর দিকে আগুয়ান এবং আল্লাহর কাছেই যার শেষ প্রত্যাবর্তন, সেই সমাজের সাথেই এই মূল্যবোধ মানানসই। সেই সমাজে খেলাফতের দায়িত্ব আল্লাহর হেদায়াতের বাস্তব অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। এখানে দুটি পথ সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে। একটা পথ হলো, আল্লাহর ফরমাবরদারীর পথ, অপরটি হলো শয়তানের অনুকরণের পথ। এখানে আর কোনো তৃতীয় পথ নেই। হয় আল্লাহ তায়ালা নচেৎ অভিশপ্ত শয়তান। হয় গোমরাহী নচেৎ সঠিক পথের অনুসরণ। হয় সত্য না হয় বাতিল। হয় কল্যাণ ও মুক্তি, না হয় ধ্বংস ও সর্বনাশ। সমগ্র কোরআন জুড়ে এই সত্যটিরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সত্যই হচ্ছে মানব সমাজের সকল চিন্তা ও মতামতের মূল তত্ত্ব। এটাই সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশের গোড়ার কথা।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ
اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ
وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى
الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

রুকু ৫

৪০. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলো স্মরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো। ৪১. আমি (মোহাম্মদের কাছে) যা (কোরআন) নাযিল করেছি, তোমরা এর ওপর ঈমান আনো, যা তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সত্যায়নকারী, তোমরা কিছুতেই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং (বৈষয়িক স্বার্থে) সামান্য মূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। ৪২. তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে পোশাক পরিয়ে দিয়ো না এবং সত্যকে জেনে বুঝে লুকিয়েও রেখো না। ৪৩. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে মিলে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো। ৪৪. তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং নিজেদের (জীবনে তা বাস্তবায়নের) কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা সবাই আল্লাহর কেতাব পড়ো; কিন্তু (কেতাবের এ কথাটি) তোমরা কি বুঝো না? ৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর'ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও; (যাবতীয় হক আদায় করে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই একটা) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের কথা আলাদা। ৪৬. যারা জানে, একদিন তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং তাদের (সবাইকে) তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে (তার জন্যে এটা কঠিন কিছু নয়)।

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞ ﴿٤٩﴾ وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذۡ وَٰعَدۡنَا مُوسَىٰٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةٗ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَنتُمۡ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوۡنَا عَنكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٥٢﴾

রুকু ৬

৪৭. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি (আমার সেই নেয়ামতের মধ্যে একটি ছিলো), আমি তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম। ৪৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো যেদিন একজন আরেক জনের কোনোই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের (পক্ষে সেদিন) কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, (কাউকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে) কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না– না তাদের (সেদিন) কোনো রকম সাহায্য করা হবে! ৪৯. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো, তারা নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণা দিতো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের (তারা) জীবিত রেখে দিতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে বড়ো একটা পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো। ৫০. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিলাম, অতপর আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা তা তো (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করছিলে! ৫১. (আরো স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ একটি কাজের জন্যে) চল্লিশ রাত নির্ধারণ করে দিলাম, তার (যাওয়ার) পর তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিলে, তোমরা (নিজেদের ওপর) ভীষণ যুলুম করেছিলে! ৫২. অতপর (এ অপরাধ সত্ত্বেও) আমি (পুনরায়) তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি এ আশায় যে, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى

بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ

اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى

نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ

بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৩. (সে কথাও স্মরণ করো,) যখন আমি মূসাকে কেতাব ও ন্যায় অন্যায়ের পরখকারী- (একটি মানদণ্ড) দান করেছি, যাতে করে তোমরা হেদায়াতের পথে চলতে পারো। ৫৪. (আরো স্মরণ করো,) মূসা যখন তার নিজ লোকদের (কাছে এসে) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করে যে (বড়ো রকমের) যুলুম করেছো, তার জন্যে অবিলম্বে আল্লাহর দরবারে তাওবা করো এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের (শেরেকে অভিশপ্ত) নফসসমূহকে হত্যা করো, এর মাঝেই আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, (কারণ) তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। ৫৫. তোমরা যখন বলেছিলো, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (-এর মতো এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে (কিছুই করতে পারলে না)। ৫৬. অতপর (এই ধ্বংসকর) মৃত্যুর পর তোমাদের আমি পুনরায় জীবন দান করলাম, যাতে করে তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। ৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম, 'মান্' এবং 'সালওয়া' (নামক খাবারও) তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছিলাম; (আমি তোমাদের বলেছিলাম,) সে সব পবিত্র খাবার খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, তা তোমরা উপভোগ করো, (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার ওপর কোনো অবিচার করেনি, (বরং এর দ্বারা) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوسٰى
لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ

৫৮. (স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং তোমরা তার যেখান থেকেই ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, (দম্ভ সহকারে প্রবেশ না করে) মাথানত করে ঢোকো, তোমরা ক্ষমার কথা বলবে, আমিও তোমাদের ভুল ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং যারা ভালো কাজ করে আমি (এভাবেই) তাদের (পাওনার অংক) বাড়িয়ে দেই। ৫৯. (সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও) অতপর যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রদবদল করে ফেললো, যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো, আমিও এরপর যারা যুলুম করলো তাদের ওপর আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের গুনাহর ফল।

রুকু ৭

৬০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা (আমার কাছে) তার জাতির লোকদের জন্যে পানি চাইলো, আমি (তাকে) বললাম, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, (আঘাত করা মাত্রই) সে পাথর থেকে বারোটি (পানির) নহর উৎপন্ন হয়ে গেলো; প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ (পানির) ঘাট চিনে নিলো; (আমি বললাম,) আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে তোমরা পানাহার করো, তবে (কিছুতেই আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না। ৬১. (স্মরণ করো,) তোমরা যখন মূসাকে বলেছিলে, হে মূসা, (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্য ধরতে পারবো না, তুমি তোমার মালিকের কাছে বলো যেন তিনি কিছু ভূমিজাত দ্রব্য– তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডাল উৎপাদন করেন, সে বললো, তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ (ধরনের) জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা

اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم

مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

অন্য কোনো শহরে সরে পড়ো, যেখানে তোমাদের এসব জিনিস– যা তোমরা চাইবে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান ও দারিদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো; আল্লাহর গযব দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়ে গেলো, এটা এ কারণে (যে), এরা (ক্রমাগত) আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকলো, আর এসব কিছু এজন্যই ছিলো যে, তারা আল্লাহর সাথে না-ফরমানী ও সীমালংঘন করছিলো!

রুকু ৮

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা খৃষ্টান এবং 'সাবী'– এদের যে কেউই আল্লাহর ওপর যথাযথ ঈমান আনবে, ঈমান আনবে পরকালের ওপর এবং ভালো কাজ করবে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং এসব লোকের (যেমন) কোনো ভয় নেই, (তেমনি) তারা চিন্তিতও হবে না। ৬৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম (যে, তোমরা তাওরাত মেনে চলবে) এবং তূর পাহাড়কে আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে (বলে) ছিলাম; যে কেতাব তোমাদের আমি দান করেছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রেখো, (এ উপায়ে) তোমরা হয়তো (শয়তান থেকে) নিজেদের বাঁচাতে পারবে। ৬৪. অতপর তোমরা এ (ওয়াদা) থেকে ফিরে গেলে, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) আমার অনুদান ও রহমত যদি তোমাদের ওপর না থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে!

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

৬৫. তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশের সীমা) লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও- (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত বানর (-এ পরিণত) হয়ে যাও। ৬৬. এ (ঘটনা)-কে আমি সে সব মানুষদের- যারা তখন সেখানে (মজুদ) ছিলো- আরো যারা পরে আসবে, তাদের (সবার) জন্যে একটি দৃষ্টান্তমূলক (ঘটনা) বানিয়ে দিয়েছি, যারা আল্লাহকে ভয় করে এমন লোকদের জন্যেও এ ঘটনা (ছিলো) একটি উপদেশ। ৬৭. (আরো স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নামে) তোমাদের একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিচ্ছেন; তারা (এ কথা শুনে) বললো (হে মূসা), তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? সে বললো, আমি (তামাশা করে) জাহেলদের দলে শামিল হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই! ৬৮. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি তোমার মালিককে বলো, আমাদের তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে বলে দেন- তা কেমন (হবে)? সে বললো, অবশ্যই তা হবে এমন যা বৃদ্ধ হবে না, আবার (একেবারে) বাচ্চাও হবে না; (বরং তা হবে) এর মাঝামাঝি বয়সের (যাও, এখন) যা কিছু তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তাই করো। ৬৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি তোমার মালিককে জিজ্ঞেস করে নাও, তিনি আমাদের যেন বলে দেন তার রং কেমন হবে? সে বললো, তা হবে হলুদ রংয়ের, তার রং এতো আকর্ষণীয় হবে যে, যারা তাকাবে তা তাদেরই পরিতৃপ্ত করবে। ৭০. তারা বললো (হে মূসা), তুমি তোমার মালিককে (আবার) জিজ্ঞেস করে নাও, (আসলে) তা কি ধরনের হবে, (আমরা তো সঠিক গাভী বাছাই করতে পারছি না,) আমাদের কাছে (তো সব) গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়; আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এবার) অবশ্যই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا

يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۚ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ

اَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا

يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭১. সে বললো, (তাহলে শুনো, আল্লাহর ঈঙ্গিত) সে (গাভী) হবে এমন যে, সেটি কোনো চাষাবাদের কাজ করে না, যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, (অর্থাৎ তা হবে) সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত, (একথা শুনে) তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি (আমাদের সামনে) সত্য কথাটা নিয়ে এসেছো! অতপর তারা (এ ধরনের একটি গাভী) যবাই করলো, যদিও (ইতিপূর্বে) মনে হয়নি যে, তারা এ কাজটি আদৌ করতে চায়।

রুকু ৯

৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে, অতপর সে ব্যাপারে তোমরা একে অপরের ওপর (হত্যার) অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ই (মানুষের সামনে) বের করে আনতে চাইলেন, যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করছিলে। ৭৩. (হত্যাকারীকে খোজার জন্যে) আমি তোমাদের বললাম, (কোরবানী করা) সেই (গাভীর) শরীরের একাংশ দিয়ে তোমরা একে (মৃদু) আঘাত করো, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন এবং (এ ঘটনা দ্বারা) তিনি তোমাদের কাছে তাঁর (জ্ঞানের) নিদর্শনসমূহ তুলে ধরেন, আশা করা যায় তোমরা (সত্য) অনুধাবন করবে। ৭৪. (কিন্তু এতো বড়ো একটি নিদর্শন সত্ত্বেও) অতপর তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেলো, (এমন কঠিন) যেন তা (শক্ত) পাথর, (বরং মাঝে মাঝে মনে হয়) পাথরের চেয়েও (বুঝি তা) বেশী কঠিন; (কেননা) কিছু পাথর এমন আছে যা থেকে (মাঝে মাঝে) ঝর্ণাধারা নির্গত হয়, আবার কোনো কোনো সময় তা বিদীর্ণ হয়ে ফেটেও যায় এবং তা থেকে পানি (ফোয়ারা)-ও বেরিয়ে আসে, (অবশ্য) এর মধ্য থেকে (এমন কিছু পাথর আছে) যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন।

তাফসীর

আয়াত ৪০-৭৪

সূরার এই অংশ থেকেই বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। বনী ইসরাঈলরা মদিনায় ইসলামী আন্দোলন পরিচালনাকে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। তারা বিরুদ্ধে গোপনে ও প্রকাশ্যে নানা প্রতিরোধ চালিয়েছে। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্যে বহুতরো ফন্দি এঁটেছে। মদিনার ইসলামী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এক মুহূর্তের জন্যেও থামেনি। এই আন্দোলন যে অচিরেই সমগ্র মদিনাকে নিজের কর্তৃত্বের অধীনে এনে ফেলবে এটা তারা বুঝতে পেরেছিলো। তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের সুবাদে যে কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা ভোগ করে আসছিলো এই আন্দোলন যে তা থেকে তাদেরকে অপসারিত করবে, তার লক্ষণ তারা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলো। ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো, যে শূন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে ইহুদীরা ঢুকতো তা যখন পূরণ করে সেখানে তাদের ঢোকার পথ বন্ধ করা হলো এবং তাদের জন্যে কোরআনের ভিত্তিতে আলাদা এক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলো, তখন ইহুদীরা বেশামাল হয়ে মুসলমানদের ও ইসলামের ওপর এক ভয়াবহ সংঘাত চাপিয়ে দিল। এ সংঘাত সেই দিন থেকে যে শুরু হয়েছে তা আজও চালু রয়েছে, চালু রয়েছে একই উপায় উপকরণ নিয়ে এবং একই পন্থায় ও প্রক্রিয়ায়। যুগে যুগে সে সংঘাতের বাহ্যিক আকার আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে বহুবার, কিন্তু তাতে প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তার স্বভাব ও মেযাজ সব সময় একই রয়েছে। একথা সত্যি যে, ইহুদি জাতি শত শত বছর ধরে দেশ থেকে দেশে তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছে। গোটা দুনিয়াব্যাপী তাদের ওপর সীমাহীন লাঞ্ছনা গঞ্জনা চলেছে। উদারচেতা মুসলিম বিশ্ব ছাড়া আর কোথাও তাদের ভাগ্যে এতটুকু নিরাপদ ও অনুকাশীল জায়গা জোটেনি । কেননা মুসলমানরা ধর্মীয় ও বর্ণগত বৈষম্য ও দমননীতি স্বীকার করে না। তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ক্ষতিকর কাজ করে না-এমন যে কোন মানুষের জন্যে তার দুয়ার চির উন্মুক্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইহুদীদের আগ্রাসী চরিত্র আগে যেমন ছিলো এখনো ঠিক তেমনিই রয়েছে।

ইহুদীদের চক্রান্ত

নবাগত রসূল (স.) ও তাঁর রেসালাতের প্রতি মদিনার ইহুদীরা সর্বপ্রথম ঈমান আনবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কেননা কোরআন সামগ্রিকভাবে তাওরাতকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিচ্ছিলো। তাছাড়া তারা এই রসূলের আগমন প্রত্যাশাও করছিলো। তাদের কেতাবে এই রসূল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট বর্ণনাও ছিলো, সেগুলোর কথা বলে আরব পৌত্তলিকদের ওপর বিজয়ী হবার আশায় দিন গুণতো।

বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত বিস্তীর্ণ আলোচনার প্রথম অংশটির এটাই প্রধানতম প্রতিপাদ্য। এতে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করা এবং তাদের দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকার মুখোশ উন্মোচন করার অভিযান চালানো হয়েছে। ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নতুন ঈমানী কাফেলার সাথে যুক্ত হওয়ার প্রতি তাদের আগ্রহ জন্মানোর জন্যে যাবতীয় দাওয়াতী চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এই অভিযান চালানো তাদের জন্যে অপরিহার্য্য ছিলো।

এ অংশের সূচনাতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার সাথে করা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করার

জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তিনি ও তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন। আল্লাহকে ভয় করা ও সাবধান হওয়ার ডাক দিয়েছেন। এসব ছিলো মূলত তাওরাতের সমর্থক কোরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতেরই মুখবন্ধ। এর দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করায় ইহুদীদের অগ্রণী ভূমিকার সমালোচনা করা হয়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করতো এবং (মহানবীর রেসালত সম্পর্কিত) সত্য (ভবিষ্যদ্বাণী)-কে লুকাতো। সেটা তারা মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য এবং মানবিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টির জন্যেই। এভাবে তারা করতো ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও বিশেষত মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা ও সদ্য ইসলামে দীক্ষিতদের মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস পেত। এই ভূমিকার সমালোচনার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কপটতা ও দোমুখোপনা বাদ দিয়ে একমুখো ও একনিষ্ঠভাবে ইসলামের কাতারে শামিল হতে বলেছেন। নামায, যাকাত ও আনুগত্যশীলতার কর্তব্য পালন করতে বলে নামায ও ধৈর্য্য অবলম্বনের মাধ্যমে আপন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে তাকে ইসলামের অনুগত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সহায়তা লাভ করতে বলেছেন।

এরপর শুরু হয়েছে বনী ইসরাঈলের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে নানাভাবে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পালা। কোরআন নাযিলের সময় বনী ইসরাঈলের যে বংশধরটি জীবিত ছিলো তাদেরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো এমনভাবে বলা হয়েছে, যেন স্বয়ং তারাই হযরত মূসার আমলে এসব নেয়ামত ভোগ করে এসেছে। তাদের উত্তর পুরুষেরা পূর্বপুরুষদের প্রতি এতবেশী অনুরক্ত একাত্ম এবং তাদের স্বভাব চরিত্রে এতবেশী মিল ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যে এর জন্যে তাদেরকে যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও একই জাতি বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সকল যুগেই তাদের একই রীতিনীতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে তাদেরকে এক জাতি ধরে নেয়া সম্মত ও যথার্থ হয়েছে। সেই দিনের ভয় দেখানো হয়েছে, যে দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারো কাছ থেকে মুক্তিপণও নেয়া হবে না এবং আযাব থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে–সাহায্য করতে পারে এমন কোন লোকও পাওয়া যাবে না।

ফেরাউন ও তার লোকজনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তির ঘটনাটা এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তাকে চলতি ঘটনা বলেই মনে হয়। অনুরূপভাবে মেঘ দিয়ে ছায়া দেয়া, আকশ থেকে 'মান ও সালওয়া' নামক খাদ্য নামিয়ে দেয়া এবং পাথর বিদীর্ণ করে পানি বের করা সহ সব অনুগ্রহের ধারাবাহিক ঘটনাবলীকে এক এক করে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এত সব অনুগ্রহের পরও কিভাবে তারা ক্রমাগত বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয়েছে, এক বিভ্রান্তি থেকে পথে ফিরিয়ে আনার পর পুনরায় তারা আর এক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে। এক গুনাহ মাফ করে দেয়ার পরক্ষণেই আর এক পাপে তারা জড়িয়ে পড়েছে। এক পদস্খলন থেকে রক্ষা করার পর তারা আবার আরেক গর্ভে পড়ে গেছে, এ সবই তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার স্বভাব তাদের এখনো সে অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও আমানত রক্ষায় তাদের অপারগতা এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীদের সাথে সম্পাদিত অংগীকার ভংগ প্রভৃতি তাদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। তারা নিজেদের নবীদেরকে পর্যন্ত হত্যা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহর নাযিল করা বাণী ও মোজেযাগুলোকে অস্বীকার করেছে। বাছুর পূজা করেছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সামনে এতদূর স্পর্ধা দেখিয়েছে যে, আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখলে নবীর কথা মানবেনা বলেও হুংকার দিয়েছে।

তাদের জন্যে নির্দিষ্ট গ্রামে ঢুকবার সময় যে কাজ করতে বলা হয়েছে তাও তারা বিকৃত করেছে। শনিবার সংক্রান্ত বিধি তারা লংঘন করেছে। তূর পর্বতের অংগীকার ভংগ করেছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে গাভী যবাই করতে নির্দেশ দেয়া হলে তাতে নানা ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে এবং বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, এতসব অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে সেই বনী ইসরাঈল জাতি, যারা গালভরা বুলি আওড়াতো যে, তারাই একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী জাতি, তাদের ছাড়া আল্লাহ তায়ালা আর কাউকে পছন্দ করেন না। তারা ছাড়া সকল জাতি বিপথগামী এবং তাদের ধর্মছাড়া সকল ধর্ম বাতিল। কোরআন তাদের এই দাবীকে মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করেছে। কোরআন বলেছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তা সে যে জাতির লোকই হোক না কেন−তার মুক্তি নিরাপত্তা ও পুরস্কার পাওয়া নিশ্চিত।

অন্য যে কোনো বক্তব্য পেশ করার আগে এ সমালোচনা-অভিযানের প্রয়োজন ছিলো। ইহুদীদের লম্বা বুলি ও তাদের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন এর স্বরূপ উদঘাটন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভেতরে তাদের অনুপ্রবেশের দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেয়ার জন্যে এটা ছিলো অপরিহার্য। অনুরূপভাবে এসব কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানদের চোখ খুলে দিয়ে ও তাদের মনকে সজাগ করে দিয়ে তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ সেই সমাজের মৌল নীতিগুলোকে এবং তাদের সংগঠনকে বিভেদ বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করার জন্যে এর গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। এ জন্যে সূরার এই অংশ এবং এর পরবর্তী অংশ জুড়ে এই সমালোচনাকে বিস্তৃত করে রাখা হয়েছে।

এ সমালোচনা মুসলমানদেরকে পূর্বতন উম্মতের সেই পদস্খলন থেকে হুশিয়ার করার জন্যে খুবই দরকারী ছিলো। এ কারণেই তারা খেলাফতের মহান আসন হারিয়েছে, আল্লাহর যমীনে তার আমানতের রক্ষণাবেক্ষণের মর্যাদা এবং মানব জাতির নেতৃত্বের গৌরব পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই হুশিয়ারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

কোরআনের এই হুশিয়ারী ও শিক্ষাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করা তৎকালীন মদিনার মুসলিম সংগঠন এবং সর্বকালের মুসলিম উম্মাতের জন্যে আরো বেশী প্রয়োজন ছিলো এই জন্যে যে, এতে করে তারা আল্লাহর সুমহান দিক- নির্দেশনাকে গ্রহণ করে তাদের চিরন্তন শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারবে। জানতে পারবে কিভাবে সেই শত্রুদের গোপন সুচতুর ও ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা যায়। এ জন্যে এই শিক্ষা ও হুঁশিয়ারীকে উন্মুক্ত চোখ প্রাজ্ঞ মন মস্তিষ্ক নিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুত: যার মন ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত নয় এবং গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর নির্দেশ যে ব্যক্তি গ্রহণ করেনি, তার পক্ষে ইসলামের শত্রুদের এই বিভ্রান্তিকর ও ঘৃণ্য গোপন চক্রান্ত নস্যাৎ করা সম্ভব নয়।

এখানে কোরআনের বর্ণনার মধ্যে এক অপূর্ব শৈল্পিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করছি। বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত এই আলোচনা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের কাহিনী ও তার কাছে আসা আল্লাহর ওহীর শিক্ষাসমূহের বর্ণনার পরপরই এসেছে। এভাবে কোরআনের বর্ণনার ধারায় যে কাহিনী ও প্রেক্ষিত আলোচিত হয় তা যে পরস্পরের পরিপূরক তা এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবকিছুকে মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এরপর পৃথিবীতে আল্লাহর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অংগীকার সহকারে হযরত আদমের খেলাফত লাভ এবং ফেরেশতাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাকে কি নসীহত করা হলো এবং কিভাবে তিনি তা ভুলে গেলেন, তারপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলেন, ফলে সুপথ ফিরে পেলেন ও ক্ষমা লাভ করলেন—তারও উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, অন্যায় অসত্য ও অকল্যাণমূলক ও ধ্বংসাত্মক শক্তি যা ইবলিসের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও গঠনমূলক শক্তি যার প্রতিনিধি ঈমানদার মানুষ—এই উভয় শক্তির মধ্যে পৃথিবীতে যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব সংঘাত চলবে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো।

সূরার প্রথমাংশে এই সমুদয় বিষয় আলোচিত হবার পর বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কাছে তাদের অংগীকারাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে তা ভংগ করা, আল্লাহর অনুগ্রহ দান এবং সে অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর এর পরিণাম স্বরূপ তাদের খেলাফত থেকে পদচ্যুত হওয়া, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা লাভের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে মোমেনদেরকে তাদের চক্রান্ত ও নিজেদের সম্ভাব্য পদস্খলন থেকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আদমের খেলাফত লাভের ঘটনা ও বনী ইসরাঈলের খেলাফত লাভের ঘটনার মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ ও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয় ঘটনার ধারাবর্ণনায় এবং উপস্থাপনার ভংগীতে সমন্বয়ও এখানে সুস্পষ্ট।

অবশ্য কোরআন এখানে নিছক কাহিনী শোনানোর গরজেই বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ তোলেনি। বরং সংক্ষেপে অথবা ঈষৎ বিস্তৃতভাবে, তাদের জীবন ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর্যালোচনা করেছে। এর আগে মক্কী যুগে নাযিল হওয়া সূরাগুলোতে এ ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এই ঘটনার উল্লেখ অন্যান্য আনুষঙ্গিক আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিলিত হয়ে মক্কার মুষ্টিমেয় মোমেনের দলের সান্ত্বনা ও মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এতে তাদেরকে দেখানো হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ঈমানী কাফেলা দাওয়াতের নির্ভুল পথে চলতে গিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং একই ধরনের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেছে। অতপর মক্কার মুসলিম জামায়াতকে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী পথ-নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখানে (সূরা বাকারার এই জায়গায়) কি উদ্দেশ্যে এ ঐতিহাসিক পর্যালোচনার অবতারণা, তা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি। এখানকার উদ্দেশ্যটা হলো, ইহুদীদের ঘৃণ্য অভিপ্রায় ও হীন মানসিকতার মুখোশ উন্মোচন এবং তাদের দুরভিসন্ধিমূলক উপায়-উপকরণ ও আয়োজনের স্বরূপ উদঘাটন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাদের চক্রান্তের ফাঁদে পড়া থেকে এবং তাদের মত অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান করে দিতে চান। তবে কোরআনের যে অংশ মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং যে অংশ মদিনায় নাযিল হয়েছে, উভয়ের লক্ষ্য ও গন্তব্য আলাদা আলাদা। তাই উভয়ের উপস্থাপনা ও বাচনভংগীও আলাদা ধরনের। কিন্তু বাচনভংগী ও উপস্থাপনা কৌশল আলাদা হলেও উভয় ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের বিপথগামিতা ও না-ফরমানী সম্পর্কে যেসব তথ্য ও ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে, তা মূলত এক ও অভিন্ন। আগামীতে যখন মক্কী সূরাগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা হবে—যার নাযিলের সময় সূরা বাকারা ও অন্যান্য মাদানী সূরার চেয়েও আগে, তখন এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কোরআনের এই অংশে ও মক্কী অংশে যেসব জায়গায় বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, এ কাহিনী তার প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা সে প্রেক্ষিতভুক্ত লক্ষ্য ও নির্দেশাবলীর পরিপূরক। এখানেও সে কাহিনী পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের সাথে সুসমন্বিত। পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হবার কথা, তার অংগীকার ও তা ভুলে যাবার কথা, সর্বকালের মানবজাতির ঐক্যের কথা, সর্বকালে আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃতিগত অভিন্নতার কথা, এবং সর্বকালের রসূলদের মিশনের ঐক্যের কথা। সেই সাথে মানুষের মানবীয় সত্তা তার মনমানসিকতা ও অপরিহার্য গুণ বৈশিষ্ট্যেরও বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যার মজুদ থাকার ওপর পৃথিবীতে তার খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া ও থাকা নির্ভরশীল। এসব অপরিহার্য মৌলিক মানবীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে তার মানবীয় সত্তাকেই হারাবে এবং খেলাফতের জন্যে নিজের সার্বিক অযোগ্যতা প্রমাণ করবে। এভাবে সে কার্যত: মনুষত্বের স্তর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পশুত্বের স্তরে নেমে যেতে বাধ্য হবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। মহাগ্রন্থ কোরআনে যত কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে বনী ইসরাঈলের কাহিনীর উল্লেখই সর্বাধিক। এই গোষ্ঠীটার উত্থান-পতন ও তার শিক্ষার প্রতি এতটা মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবু এটুকু বলা দরকার যে, এ কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ মুসলিম উম্মাতের সাথে আচরণে কি নীতি-কৌশল অবলম্বন করবেন তা আগে-ভাগেই তাদের জানিয়ে দিতে চান এবং বৃহত্তম খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলতে চান।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর এই সংক্ষিপ্তসার আলোচনা করার পর এবার আয়াতগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

'হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলোকে স্মরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের..........যারা জানে একদিন তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং একদিন (সবাইকে) তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে, (তাদের জন্যেও নামায প্রতিষ্ঠা তেমন কঠিন কিছু নয়)।' (সূরা আল বাকারা- ৪০-৪৬)

ইহুদীদের ইতিহাস

বস্তুত বনী ইসরাঈলের ইতিহাস অধ্যয়নকারী মাত্রেই তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের সয়লাব দেখে এবং সে সয়লাবের মোকাবেলায় তাদের ক্রমাগত অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি দেখে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারে না। এখানে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে সেসব অনুগ্রহের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। পরবর্তী অংশে তিনি সেসব অনুগ্রহের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেবেন। এই সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের কৃত অংগীকার পূরণে তাদেরকে আহ্বান করা এবং তাদের প্রতি আরো বেশী অনুগ্রহ বিতরণ করে তার পূর্ণতা দানের পথ খোলাসা করা। 'আমাকে দেয়া অংগীকার পূরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো।'

প্রশ্ন জাগে যে, এখানে কোন অংগীকারের প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে? এটা কি হযরত আদমের দেয়া সেই অংগীকার? এ অংগীকারের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'অতপর তোমাদের কাছে যদি আমার পক্ষ থেকে পথ- নির্দেশ আসে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার পথ- নির্দেশ অনুসরণ করবেন তার কোনো ভয় নেই, তাকে চিন্তিতও হতে হবে না।'

অথবা, এটা কি উক্ত অংগীকারেরও আগে অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়াতে আসার আগে তার কাছ থেকে নেয়া সৃষ্টির আদিমতম অংগীকার? মানুষের সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকৃতিগতভাবে তার কাছ থেকে স্রষ্টা এ অংগীকার আদায় করেছিলেন যে, সে স্বতস্ফূর্তভাবে স্রষ্টাকে চিনবে এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে, অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। এই অংগীকার কোনো যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা মানুষের সহজাত সত্তা স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয়। ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি ছাড়া আর কোনোভাবেই এবং আর কোনো কারণেই সে এই লক্ষ্য থেকে দূরে সরতে পারে না।

অথবা এটা হযরত ইসরাঈলের পিতামহ হযরত ইবরাহীমের কাছ থেকে নেয়া সেই অংগীকার? যার বর্ণনা এই পারার শেষে দিকে রয়েছে যথা, 'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। ইবরাহীম তার সব কয়টিতে উত্তীর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাবো। ইবরাহীম বললো, হে আল্লাহ তায়ালা আমার বংশধরের মধ্য থেকেও কি কাউকে নেতা বানাবে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, যালেমরা আমার প্রতিশ্রুতি ব্যাপারে প্রযোজ্য হবেনা।

অথবা, এটা সেই বিশেষ অংগীকার যা আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন তাদের মাথার ওপর তূর পাহাড় উচিয়ে তিনি তাদের বলেছিলেন, 'আমার নাযিল করা বিধানকে তোমরা শক্ত করে ধরো।' এ বিষয়টা বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত বক্ষমান পর্যালোচনার ভেতরে অনতিবিলম্বেই আসছে।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, উল্লেখিত অংগীকারগুলো মূলত সব কয়টিই। এগুলো একই অংগীকার। এটা সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট বান্দাহদের মধ্যকার অংগীকার,যার মাধ্যমে বান্দাহদেরকে আল্লাহর দিকে একান্তভাবে মন রুজু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং পরিপূর্ণরূপে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। এটা হলো আল্লাহ তায়ালার সেই শাশ্বত ও কালজয়ী জীবন ব্যবস্থা। এটাই ইসলাম, যা সর্বকালের সকল নবী ও রসূলরা বহন করে এনেছেন। এটাই সেই চিরন্তন বিধান যার পতাকা বহন করে চলেছে সর্বকালের সকল ইসলামী কাফেলা।

এই অংগীকার পূরণের তাগিদে তারা যেন একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ তায়ালাছাড়া আর কাউকে যেন ভয় না করে। বলা হয়েছে 'একমাত্র আমাকেই ভয় কর।' এই একই অংগীকারের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি নাযিল করা কেতাব ও বিধানকে মেনে নেয়। কেননা ওটা তাদের নিজেদের কাছে যে আল্লাহর বিধান আছে তারই সমর্থক। তিনি সাবধান করেছেন যে, যেখানে তাদের সবার আগে ঈমান আনার কথা, সেখানে তারা যেন সবার আগে কুফরী না করে,

'আমি যে বিধান নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান আনো। এ বিধান তোমাদের কাছে যে বিধান রয়েছে তার সমর্থক। তোমরা সবার আগে সে বিধানের অগ্রাহ্যকারী হয়োনা।'

এ থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, হযরত মোহাম্মদ যে বিধান নিয়ে এসেছেন সেটা আল্লাহর একই শাশ্বত বিধান। তিনি শুধু-এর শেষ সংস্করণের বাহক। ওটা মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে চালু আল্লাহর অংগীকার ও আল্লাহ তায়ালার মিশনের সম্প্রসারিত রূপ। এ বিধান তার উভয় বাহু-ইহকাল ও পরকালকে, অতীতের সকল বিকৃতি উপেক্ষা করে একই অঙ্গনে একীভূত করে এবং মানব জাতিকে অনাগত কালের পৃথিবীর নেতৃত্বের পথ প্রদর্শন করে। এ

বিধান তাওরাত ও ইঞ্জিলকে সমন্বিত ও সুবিন্যস্ত করে এবং সুদীর্ঘ ভবিষ্যতকালের জন্যে মানব জাতির হিত ও কল্যাণার্থে আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, তার সংযোগ ঘটায়। এভাবে সমগ্র মানব জাতিকে তিনি একই প্লাটফর্মে ভাই ভাই হিসেবে সমবেত করেন। আল্লাহর অংগীকার ও তাঁর বিধানের ভিত্তিতে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। দলে দলে, জাতিতে জাতিতে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়াকে প্রতিরোধ করেন। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই অপরিবর্তনীয় আল্লাহর এই অংগীকার ও চুক্তির অটল আনুগত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর আত্মনিবেদিত বান্দা হিসেবে সংঘবদ্ধ করেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তাদের কাছে আল্লাহর যে বিধান রয়েছে তার সমর্থক ও সত্যায়নকারী হিসেবে নাযিল করা বিধানকে স্বীকার করে নিছক তাদের কায়েমী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান এবং পরকালকে বিসর্জন দিয়ে ইহকালকে বেছে নেয়ার জড়বাদী ও ভোগবাদী মানসিকতাকে যেন প্রশ্রয় না দেয়। বিশেষত তাদের ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর ভয় পোষণ করে সংযত আচরণ অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা তারা আশংকা করতো যে, ঈমান আনলে হয়তো তাদের কর্তৃত্ব আর চলবে না এবং সে কর্তৃত্বের সুবাদে যে বিপুল সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করতো ও উপঢৌকনাদি লাভ করতো তা হয়তো হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

'আমার আয়াতগুলোকে নগণ্য মূল্যে বেচে দিওনা এবং আমার ব্যাপারে সাবধান থাকো।'

পার্থিব স্বার্থ, ধন সম্পদ ও বস্তুগত লাভের আকাংখা ইহুদী জাতির প্রাচীনতম চরিত্র। এখানে এ কথার লক্ষ্য তাদের সমাজপতিদের কার্যকলাপও হতে পারে। যাজক সম্প্রদায়ের দ্বারা ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পাদন, মিথ্যা ফতোয়া আদায় ও তাওরাতের বিধানগুলো বিকৃত করার মাধ্যমে ধনী ও বড় লোকদেরকে ধর্মীয় শাস্তি থেকে রক্ষা করে তারা যে অর্থ উপার্জন করতো, তার সমালোচনাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। এ বক্তব্য কোরআনের অন্যান্য স্থানেও একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। ইহুদী সমাজপতিরা তাদের সমগ্র জাতিকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে এইসব ধর্মীয় কার্যকলাপগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতো। কেননা জাতি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়তো। বস্তুত সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কারো কারো মতে, আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনা এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছে সেই ঈমানের যে মহা প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে, তার অনুপাতে গোটা দুনিয়াই অতি নগন্য বস্তু। এরপর তাদেরকে তাদের আরো একটা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, সেটা হলো সত্যকে মিথ্যা দিয়ে মিশ্রিত করা এবং জানা শোনা সত্যকে চাপা দেয়া ও লুকানো। ইহুদীরা মুসলিম সমাজে চিন্তার নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও সন্দেহ সংশয় ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এই জাতীয় বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ চালাতো, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরিওনা এবং জেনে শুনে সত্যকে চাপা দিও না।'

ইহুদীরা যে কোনো উপলক্ষে সুযোগ বুঝে সত্য-মিথ্যার জগাখিচুড়ি করে ও সত্যকে ধামা-চাপা দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালাতো। কোরআন বহু জায়গায় তাদের এ জাতীয় তৎপরতার বিবরণ দিয়েছে। তারা সবসময় মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা ছড়ানো এবং বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকতো। তাদের এ জাতীয় অপতৎপরতার বহু দৃষ্টান্ত সামনে আসছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সরাসরি আহ্বান জানিয়েছেন মোমেনদের কাফেলায় যোগ দিয়ে ও তাদের কাতারে শামিল হয়ে ফরয এবাদাতসমূহ আদায় করতে এবং ইসলামী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মনোভাব ত্যাগ করতে বলেছেন। বস্তুত, আল্লাহর এসব এবাদাতের অপরিহার্যতা ও ইসলামী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অবৈধতার বিষয় ইহুদীদের প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং অনুগত বান্দাদের কাতারে শামিল হয়ে যাও।'

ইহুদীদের বিশেষত, তাদের যাজক সম্প্রদায়ের একটি বদ অভ্যাস ছিলো, তারা অংশীবাদীদের পরিমণ্ডলে আল্লাহর কেতাবের অধিকারী হওয়া বলে লোকদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানাতো। অথচ একই সময় তারা নিজেদের জাতিকে আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিতো যদিও সে বিধান তাদের নিজেদের পুরানো বিধানেরই সমর্থক। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বদ অভ্যাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, 'তোমরা অন্যদেরকে সততার পথে চলতে বলে থাকো, অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও। আবার তোমরা আল্লাহর কেতাব পড়ে থাকো। তোমাদের কি মোটেই বুদ্ধি বিবেচনা নেই?'

কোরআনের এ ভাষ্য প্রথমাবস্থায় বনী ইসরাঈলের বাস্তব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরই আলোকপাত করেছিলো। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত ইসলামের দাওয়াত বা প্রচারকার্যে নিয়োজিত লোকদের ব্যাপারে এর আবেদন চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও সার্বজনীন। কোনো বিশেষ জাতি বা বিশেষ বংশধরের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়।

মুসলমানদের দুর্দশা ও তার কারণ

ইসলাম প্রচারকদের একটা বড় বিপদ এই যে, ইসলাম যখন তাদের প্রেরণাদায়ক আদর্শ ও আকিদা না হয়ে নিছক পেশা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের কথা ও কাজে এবং কথা ও চিন্তায় আর সামঞ্জস্য থাকে না। তারা মুখে বলে ভালো কথা, কিন্তু কাজের বেলায় তা করে না। তারা মুখে বলে এক কথা, কিন্তু মনে ভাবে অন্য জিনিস। অন্য মানুষকে ভালো কাজ করার আহ্বান জানায় অথচ নিজেরা তা অবহেলা করে। (স্বার্থের টানে) আবার কখনো কখনো আল্লাহর বানীকে বিকৃতও করে এবং অকাট্য ও দ্ব্যার্থহীন বাক্যের ঘোরালো পেচালো অর্থ করে আপন মতলব উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। কখনো কখনো এমন এমন আজগুবী ফতোয়া দেয়, যা হয়তো আল্লাহর ওহীর বানীর সাথে বাহ্যত ও শাব্দিকভাবে মিল খায় কিন্তু তা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রাণসত্তার তা হয় সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা তাদের নিছক মতলববাজী। সমাজে যারা সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কাছ থেকে হীন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই এরা এরূপ করে থাকে। ইহুদী ধর্ম যাজকরাও এই বদভ্যাসে লিপ্ত ছিলো। এখন প্রচারক যখন সৎ কাজ করার জন্যে মানুষকে দাওয়াত দেয় অথচ নিজে তার বিরুদ্ধাচরণ করে তখন এটা সাধারণ মানুষের জন্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা শুধু যে প্রচারককেই সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে, তা নয় বরং সেই সাথে তার প্রচারিত আদর্শের প্রতিও তারা ঘোরতর দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত হয়। এ বৈসাদৃশ্য তাদের মনে ও চিন্তাধারায় অস্থিরতা ও দ্বিধা সংশয়ের জন্ম দেয়। কেননা তারা শোনে ভাল কথা অথচ দেখে মন্দ কারবার। কাজ ও কথার এই ব্যবধান তাদেরকে দিশাহারা করে ফেলে। প্রচারিত আদর্শ তাদের আত্মায় প্রেরণার আগুন জ্বালে এবং অন্তরে ঈমানের জ্যোতি উদ্দীপিত করে। কিন্তু অচিরেই তা নিভে যায়। এর ফলে প্রচারকের ওপর তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই সাথে প্রচারিত আদর্শ বা ধর্মের ওপরও সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। যে আদর্শের প্রতি

আদর্শের প্রবক্তা ও প্রচারক সর্বান্তকরণে বিশ্বাসী হয় না, সে আদর্শের প্রচার যত জাঁকজমকের সাথে ও সুরেলা গলায় করা হোক না কেন এবং যতো আবেগ উদ্দীপনা সহকারেই তা পেশ করা হোক না কেন, তা নির্জীব ও প্রাণহীন থেকে যেতে বাধ্য। আদর্শ প্রচারক তার প্রচারিত আদর্শে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী সাব্যস্ত হবে কেবল তখনই, যখন সে নিজে তার আদর্শের জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারবে, যখন তার কাজ ও চরিত্রে তার কথার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটবে। এরূপ হলেই মানুষ তার প্রতি আস্থাশীল এবং তার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হবে। এক্ষেত্রে আদর্শের প্রচারে যদি তেমন কোন লালিত্য ও চমক নাও থাকে, তাতেও কিছু আসে যায় না। আদর্শ তখন তার জীবন্ত বাস্তবতা থেকেই জীবনী শক্তি লাভ করবে এবং তার জ্বলন্ত সত্যতা তাকে সৌন্দর্য্য সুষমায় মন্ডিত করবে, সুরেলা কণ্ঠ ও জাঁকজমকের তার প্রয়োজন হবে না। সেটা তখন একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। কেননা জীবন্ত ঈমান থেকেই তা উৎপন্ন ও উৎসারিত।

এ কথা সত্য যে, কথা ও কাজের এবং আদর্শ ও চরিত্রের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য অর্জিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এটা অর্জন করতে প্রচুর চেষ্টা সাধনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। আর সেই সাথে প্রয়োজন আল্লাহর সাথে সুগভীর সংযোগ রক্ষা করা এবং তার কাছ থেকে সাহায্য ও হেদায়াত প্রার্থনা করা। কেননা মানুষের নিত্যকার কর্মব্যস্ততা, কর্মক্ষেত্রের নানারকম বাধ্যবাধকতা ও বৈষয়িক প্রয়োজনের নিত্য-নতুন তাগিদ অনেক সময় মানুষকে বাস্তব জীবনে তার মনোনীত আদর্শ ও আকিদা বিশ্বাস থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায়, যে নীতি ও বিধানের প্রতি সে অন্যদেরকে ডাকে, নিজের জীবনে তার প্রতিফলনে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ধ্বংসশীল মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতো ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, মহাশক্তিধর চিরঞ্জীব সত্তার সাথে মিলিত ও সম্পৃক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে দুর্বল ও অক্ষমই থেকে যাবে। কেননা অন্যায় অসত্যের আগ্রাসী শক্তিসমূহ তার চেয়ে অনেক বড় ও পরাক্রমশালী। সে শক্তিগুলোকে সে কখনো কখনো পরাজিতও করতে পারে। কিন্তু সহসা একটি দুর্বল মুহূর্তের পদস্খলনে সে পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সে এক নিমিষে হারিয়ে বসতে পারে। সুতরাং সে যদি সকল শক্তিমানের ওপর যিনি পরাক্রান্ত, সেই চির অজেয় ও চির দুর্বার মাবুদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে এবং তার ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সে নিজের সকল দুর্বলতা, কামনা বাসনা, প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা জয় করতে ও নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে, যেসব শক্তিধর পার্থিব সত্তা তাকে নিরন্তর চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে তাদেরকেও সে বাগে আনতে সমর্থ হবে।

ইসলামী সংগঠনে কর্মীদের প্রস্তুতি

বস্তুত এ উদ্দেশ্যেই কোরআন প্রথমে ইহুদীদেরকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সমগ্র মানব সমাজকে ধৈর্য্য ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করতে বলে। কোরঅনের এ অংশ নাযিলের সময় ইহুদীরা তার মুখোমুখি ছিলো বলেই তাদের প্রতিই ছিলো তার এ নির্দেশ। মদীনাতে তারা যে কেন্দ্রীয় পদমর্যাদার অধিকারী ছিলো তার বিনিময়ে হলেও তাদেরকে তাদের চির পরিচিত সত্যকে গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও তৎপরতার বিনিময়ে প্রাপ্য পার্থিব সুবিধা অথবা সমগ্র দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসকে জলাঞ্জলী দিয়ে হলেও হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর সংগঠনে যোগ দিতে বলা হয়েছে, বিশেষত তারা নিজেরাই যখন অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে থাকে। অবশ্য এই কাজ মোটেই সহজ নয়। এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সাহস, মনোবল ও একমুখী হওয়া প্রয়োজন। আর সে সাহস ও মনোবল নামায ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেন,

'তোমরা ধৈর্য্য ও নামায দ্বারা সাহায্য চাও। অবশ্য তা একটা কঠিন কাজ। তবে যারা আল্লাহর অনুগত এবং যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে ও তার কাছে ফিরে যেতে হবে একথা বিশ্বাস করে তাদের জন্যে কঠিন নয়।'

অর্থাৎ সত্যকে মেনে নেয়ার দাওয়াত বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে খুবই কঠিন ও আয়াস সাধ্য ব্যাপার। তবে যারা আল্লাহর প্রতি নিরংকুশ ও নির্ভেজাল আনুগত্য পোষণ করে, তাকে ভয় করে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্যতায় অবিচল বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে কঠিন নয়।

'ধৈর্যের দ্বারা শক্তি অর্জন' কথাটা কোরআনে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। কারণ ধৈর্যই হলো যে কোন কঠিন অভিযানে অবতীর্ণ হবার অপরিহার্য উপকরণ ও পাথেয়। আর নিছক সত্যের মর্যাদা দান ও সত্যকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে বরণ করে নেয়ার খাতিরে এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে তাকে অনুসরণ করার তাগিদে কায়েমী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিসর্জন দেয়ার মত কঠিন ও আয়াস সাধ্য কাজ আর নেই।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে নামায দ্বারা সাহায্য চাওয়ার তাৎপর্য কি?

এর জবাব এই যে, নামায হলো আল্লাহ তায়ালা ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ ও মিলন ঘটানোর অন্যতম মাধ্যম। এটা এমন একটা যোগসূত্র যা থেকে, মন শক্তি আহরণ করে, আত্মা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বন্ধন অর্জন করে এবং মানস সত্তাও সকল পার্থিব সম্পদ সরঞ্জামের চাইতে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান এক পাথেয় লাভ করে। রসূলুল্লাহ (স.) যখনই কোনো সংকটের মুখোমুখী হতেন তখনই নামাযের আশ্রয় নিতেন। নামাযই হলো আল্লাহর সাথে বান্দাহর সবচেয়ে শক্ত ও অটুট যোগসূত্র। এটা মানুষের আত্মা ও বিবেককে ওহি ও প্রজ্ঞার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে। মোমেন যখনই আল্লাহর পথের পাথেয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে, মধ্যাহ্নের ঝলসানো খরতাপে তপ্ত পিপাসার্ত হয়ে যখনই পানির জন্যে ছটফট করবে, সকল সাহায্য থেকে রিক্ত ও বঞ্চিত হয়ে যখন আল্লাহর সাহায্যের জন্যে হা হুতাশ করবে এবং সকল সঞ্চিত সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেলে যখন দেউলিয়া হয়ে সম্বলের প্রত্যাশী হবে, তখন এই নামাযই তার হতাশা দূর করে তার মনোবাঞ্ছা পূরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এ উৎস থেকে মোমেন ব্যক্তি চিরদিনই উপকৃত হতে সক্ষম।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের অনিবার্যতায় বিশ্বাস রাখা এবং সকল ব্যাপারে এই বিশ্বাসে অবিচল থাকা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং তাকওয়া ও আল্লাহ তায়ালাভীতির একমাত্র উৎস। দুনিয়া ও আখেরাতের যথাযর্থ মূল্যমান নিরূপরও এর ওপরই নির্ভরশীল। এই মূল্যমান নিরূপণের মানদন্ড যখন নির্ভুলভাবে কাজ করবে তখন যথার্থই দেখা যাবে গোটা দুনিয়া একটা নগণ্য তুচ্ছ বস্তু। তখন আখেরাত তার আসল রূপ নিয়ে দেখা দেবে। ফলে কোনো বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ আখেরাতকে অগ্রগণ্য মনে করে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না। এখানে প্রাথমিকভাবে যদিও বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোরআনকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ মূলত সকল যুগের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পরবর্তী অংশে পুনরায় বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে কেয়ামতের ভয়ংকর দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, (পুনরায়) তোমরা আমার

সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছি (আমার সেই নেয়ামতের ....কাউকে ছেড়েও দেয়া হবে না, না তাদের (সেদিন) কোনো রকম সাহায্য করা হবে!' (আয়াত ৪৭-৪৮)

কৃতঘ্ন ইহুদী জাতি

বনী ইসরাঈলকে সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করা তাদের খেলাফত কালীন সময়ের মধ্যে সীমিত। পরে তারা যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে তাঁর নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, তারা আল্লাহর অভিশাপ ও গযবের পাত্র এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমানের শিকার হয়। তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয় এবং তাদের জন্যে আল্লাহর আযাব ও ধিক্কার পাঠানো হয়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দানের কথা মদীনার ইহুদীদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ এই যে, তৎকালে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণ করেছিলেন এবং তাদেরকে যে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মহানবীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সংগঠনে যোগ দিতেও উৎসাহিত করেছেন। কেননা এভাবে তারা পুনরায় সেই সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হবার এবং আল্লাহর অর্পিত সেই দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করতে পারে, যা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এতে করে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও সুযোগ পাবে।

কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতের প্রতি উৎসাহিত করার সাথে সাথে কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন সম্পর্কেও হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হচ্ছে, যেদিনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, 'কেউ কারো কাজে আসবে না।' বস্তুত, আল্লাহর আইনে সব কিছুরই পরিণাম ব্যক্তিগতভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। হিসাব নিকাশও ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মানুষ শুধু তার নিজের ব্যাপারেই জবাবদিহী করবে, অন্য কারো কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এটা ইসলামের এক সুমহান মূলনীতি। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, ভালো-মন্দ বাছ-বিচারের অবাধ ক্ষমতা এবং আল্লাহর পূর্ণ ন্যায়বিচার নীতি থেকেই ব্যক্তিগত জবাবদিহী ও পরিণাম ফল সংক্রান্ত এই মূলনীতির উৎপত্তি। মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্বের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা এবং মর্যাদা সচেতন রাখা আর তার বিবেককে সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও জাগরণ সৃষ্টি করে রাখার ব্যাপারে এ মূলনীতির নিখুঁত ও সুষ্ঠু ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত, মানুষের আত্মমর্যাদা সচেতনতা আত্ম সম্মানবোধ এবং তার বিবেকের সদা জাগ্রতাবস্থা এই দুটো জিনিস সম্মিলিতভাবে মানুষের নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উপাদান। তাছাড়া যেসব মানবিক মূল্যবোধ ও গুণবৈশিষ্টের বলে ইসলাম মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে সম্মানিত বলে গণ্য করে, এটা তারও অন্যতম।

'কারো সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না এবং কাউকে মুক্তিপণ নিয়েও ছাড়া হবে না।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান ও পূণ্য কর্ম নিয়ে হাযির হবে না, তার পক্ষে কোন সুপারিশ কার্যকরী ও লাভজনক হবে না। অনুরূপভাবে কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি মাফ করার জন্যে কোন জরিমানা বা মুক্তিপণও গৃহীত হবে না। 'এবং অপরাধীদের জন্যে কোথাও থেকে কোনো সাহায্যও আসবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না। এখানে তাদের জন্যে বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা অপরাধী হয়ে যারা উপস্থিত হবে তাদের সবার ক্ষেত্রেই কথাটা প্রজোয্য। আয়াতের শুরুতে একবচন ব্যবহার করার পর আয়াতের শেষভাগে বহুবচন

ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, কোরআন নাযিলের সময় যারা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলো এবং পরেও যারা লিপ্ত হবে, তাদের সবাইকে এই বিধির আওতাভুর্ক্ত করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা এক এক করে বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর দেয়া অনুগ্রহসমূহের বিবরণ দিচ্ছেন। কিভাবে সেই অনুগ্রহ সমূহের না-শোকরী করে তারা বিপথগামী হয়েছে তাও এখানে বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের ওপর আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহ ছিলো তাদেরকে ফেরাউনের লোকদের দাসত্ব ও নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। তিনি বলেন,

'(তোমরা সেদিনের কথাও স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদের........আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি, এসব কিছু তো তোমরা নিজেরা নিজেদের চোখেই দেখেছো!' (আয়াত ৪৯-৫০)

এখানে আল্লাহ তায়ালা সমসাময়িক বনী ইসরাঈল বংশধরের মানসপটে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ওপর পরিচালিত নিগ্রহ নির্যাতন ও তা থেকে মুক্তির দৃশ্যকে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন অনেক দূরবর্তী কালের অধস্তন পুরুষ হয়েও তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আয়াতে উল্লিখিত শব্দটি সাধারণত গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আভিধানিকভাবে-এর ধাতুগত অর্থ দাঁড়ায় পশুকে (চরে বেড়িয়ে ঘাষ খেয়ে বাঁচার জন্যে) স্থায়ীভাবে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া। এভাবে আয়াতের বক্তব্যটা এ রকম দাঁড়ায়, স্মরণ করো আমি ফেরাউনের দলবলের কবল থেকে তোমাদেরকে এমন অবস্থায় মুক্ত করেছিলাম যখন তারা তোমাদের ওপর নির্যাতনকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলছিলো এবং সেই নির্যাতনই যেন তোমাদের স্থায়ী খাদ্যে পরিণত হয়েছিলো। অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে নির্যাতন খেয়ে খেয়ে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে বাধ্য করছিলো, যেমন পশুকে চারণ ভূমির ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করা হয়। সেই নির্যাতনের একটা মর্মান্তিক দিক ছিলো এই যে, তারা পুরুষদের যবাই করে খতম করছিলো আর নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখছিলো, যাতে বনী ইসরাঈলের জনবল ও বাহুবল খর্ব হয় এবং দায়-দায়িত্বের বোঝা ভারী হয়।

এরপর মুক্তির দৃশ্য দেখানোর আগে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সে নির্যাতনে আল্লাহর তরফ থেকে কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিলো। এ মন্তব্য করার উদ্দেশ্য তাদেরকে ও অন্যান্য মযলুম মানুষকে অনুধাবন করানো যে, বান্দাহ যে কোনো বিপদেই পতিত হোক, সেটা তার জন্যে পরীক্ষা। যে ব্যক্তি এ সত্য অনুধাবন করে, সে বিপদ দ্বারা উপকৃত হয় ও শিক্ষা গ্রহণ করে। বস্তুত, কোন দুঃখ-কষ্টই ক্ষতিকর হয় না-যদি বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, সে একটা পরীক্ষার মুহূর্ত অতিক্রম করছে যার দ্বারা উপকৃত হতে পারলে পরিণামে কল্যাণ সাধিত হবে। এটা যে ব্যক্তি বুঝতে পারে, যে ব্যক্তি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মত ইহলৌকিক পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে এবং আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান লাভের আশা পোষণ, তাঁর কাছ কাকুতি মিনতি করে অব্যাহত প্রার্থনা, তাঁর পক্ষ থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা আসার অপেক্ষা করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার মাধ্যমে পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করতে পারে সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবত হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। এই পটভূমিতে আল্লাহর এ মন্তব্যের তাৎপর্য সহজেই বুঝা যায়,

'সে নির্যাতনে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিলো।'

এবার নির্যাতন থেকে কিভাবে বনী ইসরাঈলকে পরিত্রাণ দেয়া হলো, তার বর্ণনা আসছে। 'স্মরণ করো, যখন আমি সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছিলাম এবং তোমাদের জন্যে রাস্তা বানিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে পার করিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানেই তোমাদের সামনে ফেরাউনের লোক লস্করকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম।'

এই পরিত্রাণের কাহিনী ইতিপূর্বে নাযিল হওয়া মক্কী সূরাগুলোতে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। বনী ইসরাঈলরা এ কাহিনী ভালো করেই জানতো। এখানে শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ করে তাদেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণনাভংগীর চমৎকারিত্ব লক্ষ্যনীয়। সমসাময়িক বনী ইসরাঈলকে কথাগুলো এমনভাবে বলা হয়েছে, যেন মনে হয়, তারা সমুদ্রের বিদীর্ণ হওয়াকে নিজেরাই স্বচক্ষে দেখছিলো। তারা যেন হযরত মূসার নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের মুক্তি লাভ ও সমুদ্র অতিক্রমের দৃশ্যের এত নিকটে অবস্থান করছে যে, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন স্মৃতিকে জীবন্ত ঘটনার আকারে তুলে ধরার এই বাকরীতি কোরআনের বর্ণনাশৈলীর এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট।

মিসর থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তি লাভ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে। সেই যাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনাও তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে,

'(আরো স্মরণ করো) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে) ৪০ রাতের জন্যে আমার কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তার (চলে যাওয়ার) পর তোমরা একটি....... আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তওবা কবুল করলেন, (কারণ) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (আয়াত ৫১-৫৪)

হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর আমন্ত্রণক্রমে বিশেষ কর্মসূচীতে পাহাড়ে গেলেন তখন তার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈল কিভাবে বাছুরকে পূজার যোগ্য মনে করলো এবং পূজা শুরু করলো, সে কাহিনী সূরা 'ত্বা হায়ে' বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ত্বা'হা মক্কী সূরা এবং তা আলোচ্য সূরার আগেই নাযিল হয়েছিলো। এখানে তাদের জানা কাহিনীকে শুধু মনে করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে– যে নবী তাদেরকে ফেরাউনী নির্যাতন থেকে আল্লাহরই নামে ও অনুগ্রহে বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন, সেই নবীর একটু সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই তারা বাছুর পূজার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এই বাছুর পূজাকে যুলুম বা বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাছুর পূজারীদের অত্যাচার-নির্যাতনের কবল থেকে যিনি রক্ষা করলেন, সেই আল্লাহর এবাদাত ত্যাগ করে ও নবীর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয় তাদের মত যালেম জাতি আর কে হতে পারে? কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তাদের নবীকে তাওরাত দিলেন। এই তাওরাতে হক ও বাতিলের বাছ-বিচারের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো। তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাওরাত দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, হয়তো তারা এ গোমরাহীর পর নতুন করে সুপথে চলতে আরম্ভ করবে।

বনী ইসরাঈলকে এই ক্ষমা লাভ করতে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিলো। তা না করে তাদের উপায়ও ছিলো না। নিষ্ঠুর কাফফারা ও কঠোর শাস্তি ছাড়া তাদের পাপাসক্ত স্বভাব প্রকৃতিকে পবিত্র করার আর কোনো পথ ছিলো না। তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, 'নিজেদের লোকদেরকে তোমরা হত্যা করো।' অর্থাৎ যারা অনুগত ও নিরপরাধ, তারা অপরাধী ও

নাফরমানদেরকে হত্যা করো। এতে করে হত্যাকারী নিজেকে ও অপরাধীকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করতে সক্ষম হবে। বনী ইসরাঈলের সেই ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস থেকে এটুকুই জানা যায়। এটা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর কাজ ছিলো। ভাই কর্তৃক ভাইকে হত্যা করতে হয়েছিলো। স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যা করার মতই তা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু মানুষের স্বভাব ও চরিত্র নষ্ট ও দুর্বল হতে হতে যখন এতটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে, তা আর স্বেচ্ছায় অন্যায় ও অসততা থেকে বিরত থাকতে পারে না, তখন সেই নষ্ট স্বভাবকে শোধরানোর জন্যে এধরনের কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থা নেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। তারা যদি অন্যায় থেকে সংযত থাকতো, তাহলে তাদের নবীর অনুপস্থিতিতে বাছুর পূজায় লিপ্ত হতো না। কথায় যখন আর চরিত্র শোধরানো সম্ভব হয় না তখন তরবারি দিয়েই তা শোধরাতে হয় এবং এমন কঠোর শাস্তি দিতে হয় যা সংশোধনকে নিশ্চিত করে। এভাবে শাস্তি বিধানের পর আল্লাহর রহমত নাযিল হলো এবং তারা ক্ষমা পেলো। সে কথাই আল্লাহ তায়ালা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে,

'অতপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

কিন্তু বনী ইসরাঈল বনী ইসরাঈলই। তারা তাদের চিরাচরিত ও স্বভাবসুলভ গোয়ার্তুমি, স্থূল অনুভূতি, বস্তুবাদী চিন্তা এবং গায়ব বা অদৃশ্য তত্ত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই আকস্মিকভাবে তারা দাবী করে বসলো যে, আল্লাহকে প্রকাশ্য দিবালোকে দেখবার সুযোগ দিতে হবে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা এই দাবী জানালো, তারা ছিলো স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক বিশেষভাবে বাছাইকৃত বনী ইসরাঈলের ৭০ জন প্রতিনিধি। নির্ধারিত সময়ে তার সাথে সিনাই পর্বতে হাযির হয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে পুনরায় অংগীকারাবদ্ধ হওয়ার জন্যে তিনি তাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন। সে ঘটনাও ইতিপূর্বে নাযিল হওয়া মক্কী সূরাগুলোতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে নিজেদের চোখে না দেখে মূসার ওপর ঈমান আনতে অস্বীকার করতে লাগলো। আর কোরআন এখানে মদীনার ইহুদীদের সামনে তাদের পূর্ব-পরুষদের সেই ধর্মদ্রোহিতার বিবরণ তুলে ধরছে, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা রসূল (স.)-এর সাথে যে হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির মনোভাব দেখাচ্ছে, তা তাদের পূর্ব-পুরুষদের একগুঁয়েমির সাথে তুলনীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ। আজ যেমন তারা রসূল (স.)-এর কাছে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চাইছে এবং কিছুসংখ্যক মোমেনকে রসূলের সত্যবাদিতা পরখ করার জন্যে তার কাছে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর দাবী জানাতে প্ররোচিত করছে একদিন তাদের পূর্বপুরুষরাও তা করেছিলো। ৫৫, ৫৬, ও ৫৭ নং আয়াতে এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, স্থূল বস্তুবাদী অনুভূতিই তাদের জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায়। অন্য কথায়, গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতাই তাদের একমাত্র বৈশিষ্ট।

আল্লাহর নিদর্শনাবলী, সহায় সম্পদ ও ক্ষমা ইত্যাদি যতোই দেয়া হোক না কেন, তা ইন্দ্রিয়ানুভূত জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস করে না— এমন স্থূল চেতনাসম্পন্ন লোকদের স্বভাবে কোনো পরিবর্তন আনে না। তারা আল্লাহর যাবতীয় নিদর্শনাবলী ও নেয়ামত ইত্যাদি সত্ত্বেও আল্লাহর রসূলের দাওয়াতে সাড়া দেয়া তো দূরের কথা, নানাভাবে তর্কে লিপ্ত হয়ে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং আল্লাহর শাস্তি সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে সাড়া দেয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউনের গোলামীর কারণে বনী ইসরাঈলের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘস্থায়ী একনায়কত্বের অধীনে যে গোলামীর

মানসিকতার উৎপত্তি হয়, মানুষের স্বভাব চরিত্রকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক কার্যকর জিনিস আর হয় না। একনায়কত্ব মানুষের সকল সদগুণ বিনষ্ট করে দেয় এবং তার স্বভাব চরিত্রে দাসসুলভ বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। দাসসুলভ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, বেত্রাঘাত পড়ার সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করা, বেত ওঠাবার সাথে সাথে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করা এবং কিছু সুখ সমৃদ্ধি ও শক্তি যোগানো হলেই অহংকারে মেতে ওঠা। এ সবই ছিলো বনী ইসরাঈল জাতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের চরিত্র ছিলো চিরকালই অনুরূপ। এ জন্যেই তাদের এই ধর্মদ্রোহিতা ও একগুঁয়েমি, বলা হয়েছে– 'তোমরা যখন মূসাকে বলেছিলে, আমরা আল্লাহকে সরাসরি নিজেদের চোখে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না। তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের........তারা আমার কোনোই ক্ষতি করেনি, (বরং আমার নির্দেশ অমান্য করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।' (আয়াত ৫৫-৫৭)

একারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই নির্দিষ্ট সময়ে তূর পাহাড়ের ওপর থাকাকালেই তাদেরকে বিদ্রোহের শাস্তি দিলেন, 'ফলে এক বিকট শব্দ তোমাদের ওপর আঘাত হানলো (এবং তাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটলো।) এটা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছিলো।'

পুনরায় আল্লাহর রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে বাঁচার সুযোগ দেয়া হয়, যাতে তারা তা মনে রাখে ও শোকর করে। এই নেয়ামতের কথা আল্লাহ তায়ালা এখানে স্মরণ করাচ্ছেন, 'তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম, যেন তোমরা শোকর কর।'

আল্লাহ তায়ালাতাদেরকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে সেই মরু ভূমিতে মজার মজার খাবার সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং মরুভূমির ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও প্রচন্ড রৌদ্র থেকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে তাদের রক্ষা করেছিলেন। সেখানে তাদের নিজেদের কোন চেষ্টা তৎপরতা চালানোর কোনো উপায়ই ছিলো না।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে যাত্রার শুরু থেকেই মেঘ দিয়ে ছায়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। মেঘ বৃষ্টিহীন রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়। আবার সেই একোই মরুভূমি মেঘ ও বৃষ্টি পেয়ে আর্দ্র ও সরস হয়ে জীবন ধারনের উপযোগী হয়ে ওঠে। রেওয়ায়েত থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে 'মান' নামক মধুর মত মিষ্টি এক ধরনের তৈরী খাবার এবং 'সালওয়া' নামক এক ধরনের পাখির ব্যবস্থা করেন। 'মান' থাকতো গাছের ওপর রক্ষিত আর 'সালওয়া' নামক একধরনের পাখি প্রচুর পরিমাণে নাগালের মধ্যেই পাওয়া যেতো। এভাবে তাদের জন্যে উপাদেয় খাদ্য ও আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিলো এবং এসব পবিত্র জিনিস তাদের জন্যে বৈধ করা হয়। কিন্তু বনী ইসরাঈল কি এ জন্যে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ হয়েছে এবং সৎপথ অবলম্বন করেছে? আয়াতের শেষাংশের মন্তব্য থেকে এ কথাই জানা যাচ্ছে যে, তারা অন্যায় ও অসদাচরণ এবং কুফরীর পথই অবলম্বন করেছে। তবে এর কুফল অন্য কাউকে নয়, স্বয়ং তাদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে। তাদের যুলুম তাদের নিজেদের ওপরই পতিত হয়েছে। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেছেন, 'তারা আমার ওপর নয়, বরং নিজেরাই নিজেদের ওপরই যুলুম করেছে।'

বনী ইসরাঈল তথা ইহুদীদের ভ্রষ্টতা, পাপাচার ও অবাধ্যতার আরো বিবরণ নিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলেছে,, '(সে কথাও স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং .... আমিও এরপর যারা যুলম করলো তাদের ওপর আসমান থেকে

গযব নাযিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের নিজেদেরই গুনাহর ফল।' (আয়াত ৫৮-৫৯)

কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে 'জনপদ' দ্বারা এখানে বাইতুল মাকদেসকে বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল মিশর থেকে হিজরত করার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এখানে প্রবেশ করার আদেশ দেন। সেই সাথে সেখানে অবস্থানরত 'আমালেকাদের' উচ্ছেদ করারও নির্দেশ দেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং বলে,

'হে মূসা! আমরা কখনো ওখানে প্রবেশ করবো না, ওরা বেরিয়ে গেলেই আমরা ঢুকবো।'

সেই জনপদ প্রসঙ্গে তারা তাদের নবী হযরত মূসা (আ.) কে আরো বললো, 'ওরা যতক্ষণ ওখানে আছে ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ঢুকবো না। কাজেই তুমি আর তোমার মাবুদ গিয়ে লড়াই করো। আমরা এখানেই বসে রইলাম।' (সূরা আল মায়েদা-২৪)

বনী ইসরাঈলের এই বিদ্রোহ ও গোয়ার্তুমির কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, তারা মরুভূমিতে ৪০ বছরব্যাপী উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলো। অবশেষে বনী ইসরাঈলের পরবর্তী বংশধররা হযরত ইউশা ইবনে নূরের নেতৃত্বে শহরটি জয় করে ও তাতে প্রবেশ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেরূপ সেজদাবনত হয়ে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতে করতে ও গুনাহ মাফ চাইতে চাইতে শহরে প্রবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেভাবে তারা প্রবেশ করেনি। বরঞ্চ কথাটাও তারা পাল্টে ফেলে। যে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার পরিবর্তে অন্য কথা তারা বললো।

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যে যুগটি নিয়ে এখানে আলোচনা চলছে, তাহলো হযরত মূসার যুগ। কিন্তু আলোচনার ধারাবাহিকতায় যে ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা হযরত মূসার পরের আমলের ঘটনা। অথচ বর্ণনা এমনভাবে করা হয়েছে যে দু'টোকে একই যুগের ব্যাপার বলে মনে হয়। এ কারণ এই যে, কোরআন বনী ইসরাঈলের সমগ্র ইতিহাসকে একটি অখন্ড একক ঘটনা রূপে বিবেচনা করে। কি প্রাচীন যুগ, কি মধ্যযুগ কি বর্তমান (অর্থাৎ কোরআন নাযিল হওয়াকালীন) যুগ, তাদের প্রতিটি যুগই একইরকম আল্লাহদ্রোহিতা, ভ্রষ্টতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ।

ঘটনা যাই হোক, সেটা ছিলো মদীনার ইহুদীদের কাছে সুপরিচিত ছিলো এবং সে হিসাবেই কোরআন ইহুদীদেরকে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, আর সেই সাহায্য পেয়েই তারা সেই জনপদে প্রবেশ করেছিলো। তিনি তাদেরকে বিনীতভাবে প্রবেশ করতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আর তা করলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং যারা বাড়তি সৎকর্ম করবে তাদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহে সিক্ত করবেন বলে ওয়াদাও করেছিলেন। কিন্তু ইহুদীদের চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে তারা এ সবই অগ্রাহ্য করে।

'যারা যুলুম করেছিলো, তারা তাদেরকে যে কথা বলতে আদেশ করা হয়েছিলো তা পাল্টে ফেললো এবং অন্য কথা বললো।'

এখানে শুধুমাত্র 'যুলুমকারীদের' কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত, যারা কথা পাল্টে ফেলেছিল ও যুলুম তথা অনাচারে লিপ্ত হয়েছিল, তারা ছিলো তাদের মধ্যকার একটি দল মাত্র, সবাই নয়। দ্বিতীয়ত, এ অপরাধে সবাই লিপ্ত ছিলো এবং এ কাজটাকে যুলুম বলে চিহ্নিত করার জন্যই এ কথা বলা হয়েছে– 'তাই আমি যালেমদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করেছিলাম তাদের অবাধ্যতার পরিণামে।'

'রেজ্য' শব্দটার অর্থ হলো শাস্তি বা আযাব। আর 'ফুসুক' অর্থ অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। এটা ছিল বনী ইসরাঈলের অনেকগুলো অপকর্মের একটি।

মরুভূমিতে খাদ্য সরবরাহ করা ও যাত্রাপথে মেঘের ছায়াদানের মতো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেচের সুবিধাটাও দিয়েছিলেন অলৌকিক পন্থায়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে যে বিপুলসংখ্যক মো'জেযা দান করেছিলেন, এটি ছিলো তারই অন্যতম। তাদেরকে দেয়া এই নেয়ামত এবং এর প্রতিদানে তাদের আচরণ কেমন ছিলো, সে কথা কোরআন এখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে,

'(সে কথাও তোমরা স্মরণ করো) যখন মূসা তার লোকদের পানি সরবরাহের জন্যে আমার কাছে দোয়া করলো, আমি তাকে বললাম, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, ...এরা ক্রমাগত আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন সমূহকে) অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে শুরু করলো, আর এসব কিছুই ছিলো তাদের আল্লাহর সাথে না-ফরমানী ও সীমালংঘন করার পরিণতি!' (আয়াত ৬০-৬১)

হযরত মূসা (আ.) তার জাতির জন্য পানি চেয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সে প্রার্থনা মনযুর করেছিলেন। তিনি তাকে একটা নির্দিষ্ট পাথরে নিজ লাঠি দিয়ে আঘাত করতে বলেছিলেন। আঘাতের সাথে সাথেই ১২টা ঝর্ণার সৃষ্টি হয়ে গেলো। হযরত ইয়াকুবের অপর নাম ছিল ইসরাঈল। তার ১২টি ছেলে ছিল এবং তাদের থেকে ১২টি গোত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। কোরআনে তারা 'আশারাত' নামে পরিচিত এবং তাদের কথা কোরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলে গোত্রীয় ব্যবস্থা চালু ছিলো এবং প্রত্যেক গোত্র তার প্রধান পূর্ব পুরুষের নামে পরিচিত ছিলো। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন, প্রত্যেক গোত্র নিজ, নিজ পানির উৎস চিনে নিলো। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র একটা করে ঝর্ণা বেছে নিলো। অতপর তাদেরকে বলা হলো,

'আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে পানাহার করো এবং পৃথিবীতে অরাজকতা বিস্তার করোনা।'

এ উক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাদেরকে পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি গোলযোগ ও অরাজকতা ছড়ানো ও সীমাতিক্রম করা থেকে সাবধানও করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈল তরুলতাশূন্য প্রান্তরময় মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলছিলো। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল। আল্লাহ তায়ালা এহেন পরিস্থিতিতে পাথর থেকে পানি ও আকাশ থেকে মধুর মত মিষ্ট 'মান' এবং 'সালওয়া' পাখী রূপে খাদ্য নাযিল করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের স্বভাবগত হীনমন্যতা ও অন্যান্য কু-খাসলাত কিছুমাত্র কমলোনা। এগুলো তাদেরকে সেই মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করার যোগ্য হতে দিলোনা যার জন্য তাদেরকে মিশর থেকে বের করে আনা হয়েছিলো এবং উষার মরু অতিক্রম করানো হচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত মূসার নেতৃত্বে তাদেরকে ফেরাউনের গোলামী থেকে মুক্ত করিয়ে এনেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন দখল করবে এবং লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তারা এই উপলব্ধি করতে পারেনি যে, স্বাধীনতার জন্য কত মূল্য দিতে হয় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্য কত দায়িত্ব বহন করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর যে মহান আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলেন তার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা এই উচ্চ মূল্য দিতে এবং দায়িত্ব ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। তারা নিজেদের অভ্যাসগত খাদ্য পানীয়ের লালসা ত্যাগ করতে ও নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেদেরকে

খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। অথচ মান মর্যাদা , প্রভাব প্রতিপত্তি পরাক্রম ও স্বাধীনতা অর্জনে এ সবের প্রয়োজন ছিল। তারা ডাল, পেঁয়াজ, রসূন, শসা ইত্যাদি, যা মিশরে পর্যাপ্তভাবে পাওয়া যেত, তার জন্য লালায়িত ছিল। কোরআন তাদের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কেননা তারা নিজেদের গৌরবময় অতীতের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের সামনে অনেক গলাবাজি করতো। ৬১ নং আয়াতে কোরআন তাদের সেই গলাবাজীর জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে।

মূসা (আ.) তাদের দাবী শুনে হতবাক হয়ে বললেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে চাও।' অর্থাৎ তোমরা নিজেদের অতীতের সেই নিম্নমানের জীবন আঁকড়ে থাকতে চাও? অথচ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করতে চান। তাহলে যে কোনো একটা জনপদে বসবাস করতে শুরু করো। সেখানে তোমাদের ঈপ্সিত জিনিস পাওয়া যাবে।

উল্লেখিত বাক্যের দু'রকম অর্থ হতে পারে, প্রথমত, তোমরা যা চাও, তা যেমন সহজলভ্য তেমনি তুচ্ছ। ওসব জিনিস পাওয়ার জন্য দোয়ার দরকার নেই। যে কোনো জনপদে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। তোমরা যে কোনো জনপদে বসবাস করতে আরম্ভ করো সেখানে তোমরা ওসব জিনিস পাবে। দ্বিতীয়ত যে মিশর থেকে তোমরা বহিষ্কৃত হয়ে এসেছ, সেখানে চলে যাও এবং পুনরায় সে গ্লানিকর দাসত্বের জীবন গ্রহণ করো। সেখানে তোমাদের কাংখিত এসব মশুর পেঁয়াজ-রসূন, শসা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাবে। আর এইসব নগন্য জিনিসের লোভে তোমরা সেই মহৎ উদ্দেশ্য উপেক্ষা করো, যার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং প্রস্তুত করা হচ্ছে। বনী ইসরাঈলের জন্য এটা ছিল হযরত মূসার কঠোর তিরস্কার ও সতর্কবাণী।

উক্ত দুই ধরনের অর্থের মধ্যে শেষোক্তটাই আমার মতে অগ্রগন্য, যদিও অন্যান্য তাফসীরকার ভিন্নমত পোষণ করেন। আমি শেষোক্ত অর্থকে অগ্রগন্য মনে করি এ জন্য যে, উপরোক্ত উক্তিটির পরেই বলা হয়েছে, 'আর তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ জেঁকে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদেরকে ঘিরে ফেললো।'

বনী ইসরাঈলের ওপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর গযব অবতীর্ণ করা আর বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর কাছে পেঁয়াজ-রসুন, মশুর ইত্যাদি দাবী করা ঐতিহাসিক ঘটনা, এগুলো কোন সমকালীন বিষয় নয়। তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ অনেক পরের ঘটনা। এ ঘটনার সময় আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত কুফরী ও নবীদেরকে হত্যা করার মত ভয়ংকর অপরাধে তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'এর কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরীর আচরণ করতো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো, অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ির জন্যই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল।'

জানা কথা, মূসা (আ.)-এর যুগের কয়েক শতাব্দী পরে বনী ইসরাঈল এসব অপরাধে লিপ্ত হয়। তথাপি উল্লিখিত আয়াতে তাদের পেঁয়াজ-রসুন ডাল ইত্যাদি দাবীর অব্যবহিত পরই তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এটা তাদের তৎকালীন আচরণের সাথে মানানসই ছিলো। তারা মিশরে অবমাননাকর জীবন যাপন করছিলো, তারপর আল্লাহ তায়ালা তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিলেন। অথচ অপমান ও নিপীড়নের দেশ মিশরে যে সুস্বাদু খাদ্য তারা খেত আজ আবার তারই লালসায় তারা অস্থির হয়ে উঠেছে। এই কথা স্মরণ করানোর জন্যই তিনি তাদেরকে বলেছেন যে,

'তোমরা মিশরে চলে যাও।'

'অবশ্যই যারা (রসূলের ওপর) ঈমান আনে–খৃস্টান হোক ইহুদী হোক......... তাদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন এবং এসব লোকের যেমন কোনো ভয় নেই, তেমনি তারা চিন্তিতও হবে না।' (আয়াত ৬২)

যে নৃশংসতা ও নির্মমতা নিয়ে বনী ইসরাঈল সত্যের পথে আহ্বানকারীদেরকে হত্যা করেছে তার কোনো নযীর কোনো জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই নরপশুরা একাধিক নবীকে যবাই করেছে এবং তরবারি দিয়ে দিখন্ডিত করেছে। ইসলামের পথিকৃতদের সাথে যতোটা নির্মম আচরণ করা যায়, বনী ইসরাঈলী পাষণ্ডরা তার কিছুই বাদ রাখেনি। তারা জঘন্যতম কুফরি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা চরমভাবে লংঘন করেছে। পাপাচার ও আল্লাহদ্রোহিতায় তাদের মত ঘৃণ্য রেকর্ড কোনো জাতির ইতিহাসেই নেই। তথাপি তারা এত লম্বা লম্বা ও এত উদ্ভট বুলি আওড়াতো যে তার ইয়ত্তা নেই। তারা বড় গলায় দাবী করতো যে, একমাত্র তারাই সত্যের অনুসারী এবং আল্লাহর প্রিয়তম জাতি। শুধু তারাই আল্লাহর পুরস্কার ও দয়া অনুগ্রহ লাভের একচ্ছত্র অধিকারী।

পবিত্র কোরআন এখানে তাদের অসার গলাবাজীর প্রতিবাদ করেছে। সেই এই মৌলিক নীতি ঘোষণা করছে যে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতা সর্বকালে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষ যখন ঈমান এনে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে ও সৎকাজের মাধ্যমে তার স্ফূরণ ঘটাবে, তখন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ সে লাভ করবেই, চাই সে যেই হোক এবং যে যুগেরই মানুষ হোক। আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ কোনো জাতি বা প্রজন্মের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সর্বকালের মোমেনদের জন্য উন্মুক্ত। যারা নিজ নিজ যুগে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী ছিল এবং আল্লাহর একই অবিকৃত দ্বীন নিয়ে আগত পরবর্তী নবীর প্রতিও ঈমান এনেছে, এবং সর্বশেষ নবীর প্রতিও ঈমান এনেছে যার প্রতি ঈমান আনা সকলের জন্য অপরিহার্য, তাদের সকলে আল্লাহর পুরস্কার পাবে। ৬২ নং আয়াতের মর্ম এটাই।

এ আয়াতে 'যারা ঈমান এনেছে' দ্বারা মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর 'যারা ইহুদী হয়েছে' অর্থ যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে অথবা ইহুদীর বংশধর। আর 'নাসারা' হলো হযরত ঈসার অনুসারী। আর সর্বাধিক অগ্রগণ্য মতানুসারে 'সাবেঈন' অর্থ হলো, আরব মোশরেকদের সেই গোষ্ঠী, যারা নবুওত পূর্বকালে আরবদের মূর্তি পুজা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। তারা তাদের পছন্দনীয় মতের সন্ধান করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর একত্বের সন্ধান পেয়ে যায়। তারা হযরত ইবরাহীমের আসল ধর্মের সন্ধান পেয়েছে বলে দাবী করতো এবং তদনুসারে আল্লাহর এবাদাত করতে থাকে। তারা আরবদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল। তবে নিজেদের মতের দিকে কাউকে আহ্বান করেনি। আরব পৌত্তলিকরা তাদেরকে 'সাবী' অর্থাৎ ধর্মত্যাগী বলে অভিহিত করতো। তারা পরে মুসলমানদেরকেও 'সাবী' বলে ডাকতে থাকে। অন্যান্য তাফসীরে যদিও তারকাপূজারীদেরকে সাবী বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এই মতই অগ্রগণ্য।

আয়াতের বক্তব্য এই যে, তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত আছে। তারা কোনো ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তার শিকার হবে না। কারণ আল্লাহর কাছে ঈমানই বিচার্য বিষয়-কোনো বংশ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

এটা অবশ্য রসূল (স.)-এর নবুওতের পূর্বেকার ব্যাপার। নবুওতের পরে ঈমান ও ইসলামের চূড়ান্ত রূপ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

অতপর ৬৩-৬৪ নং আয়াতে লক্ষ্য করুন। এখানে বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন আচরণের বিবরণ এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন, মুসলমানরাও তা শুনতে পায়। এখানে যে প্রতিশ্রুতির বিবরণ দেয়া হয়েছে তা সবিস্তারে অন্যান্য সূরাতেও দেয়া হয়েছে। এই সূরার পরবর্তী অংশেও কিছুটা বিবরণ এসেছে। এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ঘটনার দৃশ্যটা তুলে ধরা, আর প্রস্তরময় তূর পর্বতকে বনী ইসরাঈলের মাথার ওপর উত্তোলন করা এবং তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণের কঠোরতা ও দৃঢ়তার মাঝে যে মনস্তাত্ত্বিক ও ভাষাগত সমন্বয় বিরাজমান তা প্রকাশ করা, আর তাদের কেতাবে যে বিধান দেয়া আছে তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণের নির্দেশ দানে এবং পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে এই পথ অবলম্বনের শক্তির মধ্যে যে ঐক্য ও সাদৃশ্য বিরাজমান তাও তুলে ধরা। বস্তুত আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনোরূপ শিথিলতা ও দুর্বলতা প্রদর্শনের অবকাশ নেই। এটা মোমেনদের সাথে আল্লাহর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এটা অকাট্য সত্য। এতে বাতিলের কোনো দখল নেই। তবে তার সাথে অনেক গুরুদায়িত্ব জড়িত রয়েছে। তা দুনিয়ার সব কিছু থেকে মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহর সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় মোমেনকে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। এ চুক্তির দাবী ও দায়দায়িত্ব কি তা তাকে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হয়। তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হয়। তাকে একথা উপলব্ধি করতে হয় যে, এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে আরাম-আয়েশ ও স্বচ্ছন্দের জীবনকে বিদায় জানাবে। যেমন রসূল (স.) নবুওয়তের দায়িত্ব লাভের পর বলেছিলেন, 'খাদিজা! ঘুমানোর যুগ শেষ হয় গেছে' আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেছিলেন 'আমি অচিরেই তোমার ওপর গুরুভার বানী অবতীর্ণ করবো।' (মোয্যাম্মেল-৫)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে বিধান দিয়েছি, তা মযবুতভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা কিছু আছে সেগুলো স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারো।'

একদিকে যেমন পূর্ণ শক্তি গাম্ভীর্য, সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আল্লাহর সাথে অংগীকারাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি অংগীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে এবং অংগীকারের দাবী ও চাহিদা কি এবং এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য কি। সেই সাথে গোটা দেহ ও মনকে এ দাবী ও বৈশিষ্ট্য মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে, যাতে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি কেবলমাত্র দুঃসাহসিকতা, বীরত্ব ও গৌরবের বিষয় হয়ে থেকে না যায়। বরঞ্চ তা যেন সত্যিকার আল্লাহভীতি, আল্লাহর তদারকী সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতা এবং আখেরাতের পরিণাম ভীতিতে পরিণত হয়। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি স্বয়ং এমন একটা জীবন ব্যবস্থা, যার চিত্র হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, জীবনে একটি সুসমন্বিত ও সুশৃংখল বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তির আল্লাহভীতি ও পরিণাম ভীতি জাগ্রত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বনী ইসরাঈলের ওপর তাদের সহজাত স্বভাবই জয়যুক্ত হয়েছিল এবং তারা প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হয়েছিলো। সে কথাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তারপরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে।' এরপর পুনরায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে এবং তারা চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়,

'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।'

ইহুদীদের হঠকারীতা

কিছু দিন পর পুনরায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওয়াদাভংগ,প্রতিশ্রুতি পালনে শৈথিল্য ও তার দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা আপন প্রবৃত্তির ফাঁদে ও নিকটতম স্বার্থের কাছে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল।

'তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের (ধর্মীয় গুরুত্বকে) লঘংন করেছে। (তাদের এ অপমানকর পরিণামও তোমরা দেখেছো) আমি ....যারা আল্লাহকে ভয় করে এমন লোকদের জন্যেও এ ঘটনাটা ছিলো একটি উপদেশ।' (আয়াত ৬৫-৫৬)

কোরআন অন্য একটি জায়গায় তাদের শনিবারের বিধানলংঘনের ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। সূরা আল আরাফের-১৬৩ নং আয়াত থেকে এ বিবরণ এভাবে শুরু হয়েছে,

'সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো। শনিবারে মাছ পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসতো, কিন্তু অন্যান্য দিন তাদের কাছে আসতো না।'

বনী ইসরাঈল আল্লাহ তায়ালার কাছে এমন একটা দিন চেয়েছিলো যা হবে খুবই পবিত্র অথচ অবকাশের দিন। আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং শনিবারকে তাদের জন্যে পবিত্র ও অবকাশের দিন হিসেবে ধার্য করেন। তিনি এই দিন তাদের জীবিকা উপার্জন নিষিদ্ধ করে দিলেন। এরপর তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শনিবারে প্রচুর মাছ ভেসে উঠতো। কিন্তু অন্যান্য দিন উধাও হয়ে থাকতো। এ পরীক্ষায় ইহুদীরা টিকে থাকতে পারলোনা। কেমন করে টিকে থাকবে? এত সহজলভ্য মাছ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াকে তারা কিভাবে বরদাশত করবে? আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার জন্য এত সহজলভ্য শিকার হাত ছাড়া করা ইহুদীদের স্বভাবের বহির্ভূত ব্যাপার ছিলো। তাই শনিবারের বিধান তারা কূট কৌশলের মাধ্যমে লংঘন করলো। তারা শনিবারে ঘেরাও দিয়ে মাছ আটকে রাখতো এবং সমুদ্রে যেতে দিত না। সে দিন তারা ঠিকই মাছ ধরতো না। আটকে থাকা এই মাছ পরের দিন ধরে আনতো।

'তাই আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।'

আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ভংগের শাস্তি তারা তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে গেল। যেহেতু তারা স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের অধিকারী মানুষের স্তর থেকে নিচে পশুত্বের স্তরে নেমে গিয়েছিল, তাই তাদেরকে পশু বানিয়ে দেয়া হলো। পশুর স্বাধীন ইচ্ছা বলতে কিছু থাকে না। পেটের চাহিদার উর্ধ্বে সে উঠতে পারে না। যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি মানুষকে মানুষ বানায় এবং যার সাহায্যে মানুষ আল্লাহর অংগীকারে অবিচল থাকে। তা থেকে বনী ইসরাইল সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। দৈহিকভাবে বানর হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। তারা তাদের অন্তরাত্মা ও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে যথার্থই বানরে পরিণত হয়েছিল। মানুষের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র ও চেহারার ওপর তার চিন্তাধারা গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মানুষের বানর হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইসলাম বিরোধীদের জন্য হুশিয়ারী এবং মোমেনদের জন্য সর্বকালেই শিক্ষামূলক ঘটনা হিসাবে বিরাজমান। সে কথাই আল্লাহ বলেছেন।

'আমি এ ঘটনাকে সমসাময়িক লোকদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষামূলক এবং মোত্তাকীদের জন্য উপদেশমূলক বানিয়েছি।'

গাভী যবাইর ঘটনা

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'আল বাকারা' তথা গাভী যবাই করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেহেতু এ ঘটনা কোরআনের আর কোথাও বর্ণিত হয়নি তাই এখানে সংক্ষেপে বা ইশারা ইংগিতে নয় বরং খোলাখুলিভাবে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনায় বনী ইসরাঈলের সত্য বিরোধিতা এবং সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে গড়িমসি ও তালবাহানা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো ছিল বনী ইসরাঈলের স্বভাব চরিত্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট।

'(সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নামে) তোমাদের একটি গাভী কোরবাণী করার আদেশ .... যা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন। (আয়াত ৬৭-৭৪)

কোরআনে বর্ণিত এই ক্ষুদ্র ঘটনার বিভিন্ন দিক দিয়ে অনেক চিন্তার বিষয় রয়েছে। এ থেকে তাদের সহজাত স্বভাব ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। তাছাড়া সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতা, পরকালীন জীবনের নিগুঢ় তত্ত্ব এবং জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃতি সেই সাথে এর চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী, সূচনা ও সমাপ্তি এবং পূর্বাপর প্রেক্ষাপটের সাথে যে আলংকারিক সৌন্দর্য রয়েছে, তাও এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

জাতি হিসেবে বনী ইসরাঈলের স্বভাবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো এ ঘটনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাদের হৃদয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই হৃদয় ছিল অদৃশ্যের প্রতি ঈমান, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা এবং নবী রসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর বিধানকে সত্য বলে গ্রহণ করার সৎ প্রবণতার উৎস। হৃদয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পর তাদের অপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও টালবাহানা, নানা রকম কু-যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ, বেপরোয়া মানসিকতা ও অমার্জিত ভাষা জনিত বিদ্রূপ ও উপহাস। তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবাই করার আদেশ দিয়েছেন।' কথাটি এভাবে বলাই তা বাস্তবায়নের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

কেননা তাদের নবী ছিলেন তাদেরকে অপমানজনক নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্তিদাতা। আল্লাহর পরম অনুগ্রহ ও দয়ায় তারই তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় তিনি এই বিরাট কাজ সমাধা করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা তার আদেশ নয় এবং তার মতামতও নয়। বরং এটা স্বয়ং আল্লাহর আদেশ এবং তিনি তাঁরই প্রদর্শিত পথে তাদেরকে পরিচালিত করছেন।

কিন্তু তারা নবীর কথার কি জবাব দিলো? তাদের জবাব ছিল নির্বুদ্ধিতা বে-আদবী ও নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও তামাশার অভিযোগে পরিপূর্ণ। রসূল তো দূরের কথা, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন একজন সাধারণ মানুষও যে আল্লাহ তায়ালার আদেশকে তামাশার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না এই স্থূল ও সাধারণ কান্ড জ্ঞানটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছিল। 'তারা বললো,

মূসা, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো?'

এহেন চরম নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে হযরত মূসা (আ.) শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলেন, অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে এবং আভাস ইংগিতে আল্লাহ তায়ালার সাথে

মার্জিত ও সম্মানজনক আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করলেন, আর তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা তার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছে, তা শুধুমাত্র এমন লোকের পক্ষেই শোভা পায় যে, আল্লাহর সত্যিকার মর্যাদা কি তা জানেনা এবং মার্জিত আচরণ কি তাও বোঝে না। তিনি বললেন,

'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যেন আমি মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাই।'

আল্লাহ তায়ালার নবীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরই তাদের আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর তাদের উচিত ছিল আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাদের নবীর আদেশ বাস্তবায়িত করা। কিন্তু তারা যে ছিল বনী ইসরাঈল! যে কোন একটা গাভী ধরে এনে যবাই করে দিলেই তাদের চলতো। তাতেই তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ মান্যকারী বলে পরিগণিত হতে পারতো। কিন্তু তাদের স্বভাবসুলভ বক্রতা ও বাহানাবাজী তাদেরকে বিপথে চালিত করলো। তারা জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার প্রভুকে বল, গাভীটা কী তা ব্যাখ্যা করে আমাদের জানিয়ে দিক।'

প্রশ্নের এই ভংগীটা থেকেই মনে হয়, মূসা (আ.) তাদের কাছে যে আদেশটি পৌছিয়েছেন, তা আসলেই তাঁর ঠাট্টা ছিল বলে এখনো তারা সংশয়াপন্ন। প্রথমত, তারা বলছে 'তোমার প্রভুকে বলো।' ভাবখানা এই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন কেবল হযরত মূসারই প্রভু, তাদের নয়। আর সমস্যাটা যেন তাদের নয়, কেবল মূসার। দ্বিতীয়ত, তারা হযরত মূসাকে বলেছিল আল্লাহকে অনুরোধ কর যেন তিনি কী গাভী যবাই করা চান তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। এখানে যদিও তাদের আসল জানার বিষয় ছিল 'কেমন গাভী' যবাই করা চান তা ব্যাখ্যা করে যেন বুঝিয়ে দেন। এখানে যদিও তাদের আসল জানার বিষয় ছিল কেমন গাভী', কিন্তু তারা জানতে চেয়েছে 'কী গাভী?' এধরনের প্রশ্ন করাটাই বিদ্রূপ ও অস্বীকৃতিবোধক। অথচ তাদেরকে শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, একটা গাভী যবাই করতে হবে। যে কোন একটা গাভী হওয়া চাই, ব্যাস!

এখানেও হযরত মূসা (আ.) তাদেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা যে ভংগীতে প্রশ্ন করছে, তাঁর জবাবের ভংগীটা তা থেকে ভিন্ন। তাদের প্রশ্নের ভ্রান্ত পদ্ধতিতে তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাননি, যাতে তাকে তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে না হয়। তিনি বরঞ্চ এমনভাবে জবাব দেন, যেভাবে একজন দক্ষ শিক্ষকের পক্ষে বক্র স্বভাবের নির্বোধ ছাত্রকে প্রশ্নের জবাব দেয়া শোভন ও সংগত হয়। আসলে তাদের মাধ্যমে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেটা যেন তিনি বুঝে নিয়েছেন। তাই তিনি গাভীর গুণ বর্ণনার মাধ্যমে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, তা হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয় কুমারীও নয়; বরং মধ্যবয়সী।' অর্থাৎ পুরোপুরি বৃদ্ধাও নয়, আবার খুব অল্প বয়স্কাও নয় বরং এই দুয়ের মধ্যবর্তী বয়সের। অতঃপর চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'তোমাদেরকে যেরূপ আদেশ করা হচ্ছে, সেরূপ কাজ করো।'

এটুকু গুণ বর্ণনায় যে সন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত ছিল, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। বনী ইসরাঈলের জন্যও এটুকু যথেষ্ট ছিল। তাদের নবী তাদেরকে দু'বার বক্র পথ থেকে সোজা পথে ফিরিয়ে এনেছেন। তাদেরকে একটা যে কোন মধ্যবয়সী গাভী যবাই করতে বলেছেন। তা করলে তাতেই তারা আপন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতো। কোনো জটিলতা ও সংকীর্ণতার বেড়াজালে আটকা পড়তোনা। কিন্তু তারা তো বনী ইসরাঈল জাতি। সুতরাং নিজেদের জন্মগত স্বভাব প্রকাশ না করে তারা থাকতে পারেনি। তাই তারা এর পরে প্রশ্ন করলো,

'তোমার মালিককে ডেকে আহ্বান কর যেন গাভীর রং কি রকম হওয়া চাই, তা তিনি আমাদেরকে বলে দেন।' এবারও তারা এভাবে 'তোমার মালিককে আহ্বান কর' বললো। আর এভাবে তারা নিজেরাই যখন বিষয়টাকে জটিল করে তুললো, তখন জবাবে আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তাই মূসা (আ.) বললেন,

'আল্লাহ তায়ালা বলছেন, এটা হলুদ রং-এর গাভী হবে, এর রং এত গাঢ় ও উজ্জ্বল হবে যেন তা দর্শকদেরকে।'

ইতিপূর্বে কাজটা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল। এবার তারা নিজেদের জন্য স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার সীমা সংকীর্ণ করে তুললো। এখন আর যে কোনো গাভী যবাই করলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ থাকলো না। এখন মধ্যবয়সী এবং দর্শকদের পছন্দনীয় হলুদ গাভী যবাই করা অপরিহার্য হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, সেই সাথে গাভীকে হতে হবে হৃষ্টপুষ্ট ও সুদর্শন। কেননা দর্শকদের পুলকিত ও উল্লসিত হবার মত গাভী হৃষ্টপুষ্ট, তরতাজা, চটপটে হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাবই এই যে চটপট্ হৃষ্টপুষ্ট ও সুঠামদেহী গরু দেখলেই খুশী হয়, আর হাড় জিরজিরে দুর্বল প্রাণী দেখে নাক সিটকায় ও অপছন্দ করে।

এ পর্যন্ত যতখানি জটিল ও পেচালো করে থাকনা কেন তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এখানেও থেমে থাকলোনা। ব্যাপারটাকে জটিল থেকে জটিলতর এবং নিজেদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর করতেই থাকলো। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ইচ্ছামত কঠিন থেকে কঠিনতর করে দিতে থাকলেন। তারা পুনরায় প্রশ্ন করলো,

'তারা বললো, হে মূসা, তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, কী গাভী যবাই করতে হবে তা যেন আমাদের ব্যাখ্যা করে দেন।'

এই সাথে তাদের টালবাহানার পক্ষে যুক্তি দেখালো এই বলে যে, ব্যাপারটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে। কারণ, 'গরু আমাদের কাছে সব একই রকম মনে হয়।'

সম্ভবত, এবার তারা বুঝতে পারলো যে, তর্ক বাহাসে তারা অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা চাহে তো আমরা সুপথ প্রাপ্ত হব।'

আগের মত এবারও আল্লাহর আদেশ তাদের ওপর আরো কঠিন হয়ে এলো এবং গাভীর গুণাগুণ আরো বাড়িয়ে দিয়ে তাদের স্বাধীনতার গণ্ডীকে আরো সংকীর্ণ করে দেয়া হলো। ইতিপূর্বে তাদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা ও প্রশস্ততা ছিল। কিন্তু তাদের প্রশ্নের দরুন এবং সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্য হয়ে উঠলো।

'মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তা এমন গরু হবে, যা চাষাবাদে বা ফসলে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি এবং সুস্থ সবল ও নিখুঁত।'

এভাবে সর্বশেষ নির্দেশ অনুসারে গাভীটি শুধু মধ্যবয়সী, সুঠামদেহী, আকর্ষণীয়, নিখুঁত ও সুবর্ণা হলেই চলবে না, বরং সেই সাথে চাষাবাদ ও সেচ কাজে অব্যবহৃত এবং নিষ্কলুষ রং -এরও হতে হবে। এভাবে জটিলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর এবং স্বাধীনতার গন্ডীর চরমভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার পর তারা বললো, হাঁ এবার তুমি সঠিক তথ্য হাযির করেছ।

ভাবখানা এই যে, ইতিপূর্বে তাদেরকে যা কিছু বলা হয়েছে তা সঠিক ছিল না, অথবা এ যাবত মূসার কথিত কোনো ব্যাপারেই তাদের বিশ্বাস আসেনি, এখনই কেবল বিশ্বাস হলো।

'অতপর তারা গাভীটিকে যবাই করলো। অথচ তারা তা করতে চাইছিল না।'

এই সময় আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর এবং বনী ইসরাঈল স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করার পর আল্লাহ এই আদেশ দান ও দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্য তুলে ধরছেন, 'স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে ....তাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।' (আয়াত-৭২)

গাভীর ঘটনার দ্বিতীয় দিকটি এখানে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা, আখেরাতের পুনরুজ্জীবন এবং জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে ও ঘটনায় যে ইংগিত পাওয়া যায়, সেই সবই হচ্ছে এ দিকটার মূল কথা। এখানে এসে আলোচনার ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। ঘটনা বর্ণনা থেকে প্রত্যক্ষ সম্বোধনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

গরু যবাই করার পেছনে কোন্ নিগূঢ় তত্ত্ব লুকিয়েছিল তা আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের সামনে উদঘাটন করেছেন। তারা নিজেদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তারপর প্রত্যেক গোত্র নিজেদেরকে নিরপরাধ দাবী করতে থাকে এবং অন্যদের ওপর দোষ চাপাতে থাকে। অথচ হত্যার কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, খোদ্ নিহত ব্যক্তির মুখ দিয়েই আসল অপরাধীকে তা প্রকাশ করাবেন। এই নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার মাধ্যম হিসেবে এই গরু যবাই এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যবাই করা গরুর অংশ বিশেষ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করলেই সে জ্যান্ত হবে বলে জানানো হয়েছিল। হয়েছিলও তাই। লোকটা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এভাবে সে নিজেই তার খুনী কে তা শুনিয়ে দেয়, তার হত্যা নিয়ে যে সন্দেহ সংশয় দানা বেঁধেছিল তা দূর হয়ে যায় এবং অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তায়ালা তো এমনিতেই মৃতকে জীবিত করতে পারেন। তথাপি এরূপ উপায় অবলম্বনের কি দরকার ছিল? তাছাড়া পুনরুজ্জীবিত মৃত লোকটির সাথে যবাইকৃত গাভীর কি সম্পর্ক?

এর জবাব এই যে, বনী ইসরাঈলী সমাজে গরু কোরবানী করার রেওয়াজ ছিল। একটি যবাই করা গরুর দেহের একটি অংশে কোনো জীবন ও পুনরুজ্জীবনী শক্তি না থাকা সত্তেও তা দ্বারা একজন মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরে পাওয়া আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার দির্শন। আল্লাহর এই সীমাহীন ক্ষমতা কিভাবে কার্যকর হয় তা মানুষ জানে না। মানুষ শুধু তার নিদর্শন দেখে কিন্তু তার নিগূঢ় রহস্য জানে না ও তা কিভাবে কার্যকর হয় তা জানে না।

'এভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে।'

অর্থাৎ এই ঘটনায় তোমরা তা কার্যকর হতে দেখছো কিন্তু কিভাবে তা কার্যকর হয় তা তোমরা জাননা। ঠিক এভাবেই সব সময় মৃতকে জীবিত করার প্রক্রিয়া চলছে। এ কাজ আল্লাহর কাছে একেবারেই সহজ।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৭৫. (হে ঈমানদার লোকেরা, এরপরও) তোমরা কি এই আশা পোষণ করো যে, এরা তোমাদের (সাথে তোমাদের দ্বীনের) জন্যে ঈমান আনবে? এদের একাংশ তো (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কেতাব শুনে আসছে, অতপর তারা তাকে বিকৃত করছে, অথচ এরা ভালো করেই তা জানে। ৭৬. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু এরাই (আবার) যখন গোপনে একে অপরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সে সব কথা প্রকাশ করে দাও যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের নবুওত সম্পর্কে আগেই তাওরাতে) তোমাদের ওপর ব্যক্ত করেছেন; (খবরদার, তোমরা এমনটি কখনো করো না), তাহলে তারা (একদিন) তোমাদের মালিকের সামনে এটা দিয়েই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উত্থাপন করবে, তোমরা কি (এটুকু কথাও) বুঝতে পারো না? ৭৭. এরা কি জানে না, (আল্লাহর কেতাবের) যা কিছু এরা গোপন করে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা) যা প্রকাশ করে, তা (সবই) আল্লাহ তায়ালা জানেন। ৭৮. এদের আরেকটি দল, যারা (একান্ত) অশিক্ষিত (নিরক্ষর), এরা (আল্লাহর) কেতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, (আল্লাহর কেতাব যেন এদের কাছে) একটি নিছক ধ্যান ধারণা (সর্বস্ব পুস্তক) মাত্র, এরা শুধু অমূলক ধারণাই করে থাকে। ৭৯. সে সব লোকের জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য), যারা হাত দিয়ে কিতাব লেখে নেয়, তারপর (দুনিয়ার সামনে) বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ শরীয়তের বিধান), তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তা দিয়ে (দুনিয়ার) কিছু (স্বার্থ) তারা কিনে নিতে পারে; অতপর তাদের হাত যা কিছু রচনা করেছে তার জন্যে তাদের ধ্বংস ও দুর্ভোগ, যা কিছু তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের দুর্ভোগ।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ

كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا

اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا

قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮০. এ সব (নির্বোধ) লোকেরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না, একান্ত (যদি করেও-) তা হবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের (জন্যে) মাত্র, (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো? আল্লাহ তায়ালা তো কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, না তোমরা জেনে বুঝেই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছো যা তোমরা নিজেরাই জানো না। ৮১. হাঁ, যে কোনো ব্যক্তিই (স্বেচ্ছায় অপরাধ করেছে এবং যাকে তার পাপ) ঘিরে রেখেছে, এমন লোকেরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ৮২. (আবার) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তারা বেহেশতবাসী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

রুকু ১০

৮৩. যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে (এ মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজন, এতীম-মেসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষদের সুন্দর কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই অতপর ফিরে গেছো, এভাবেই তোমরা (প্রতিশ্রুতি থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। ৮৪. তোমাদের (কাছ থেকে) আমি এ প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলাম যে, তোমরা কেউ কারো রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছো!

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز

تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ

الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ ع وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ

بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط

৮৫. তারপর এই তো হচ্ছো তোমরা! একে অপরকে তোমরা হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের এক দলকে তোমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে, অন্যায় এবং যুলুম দ্বারা যালেমদের তোমরা তাদের ওপর পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকলে (শুধু তাই নয়), কোনো লোক (যুদ্ধ) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের জন্যে মুক্তিপণ দাবী করো, (অথচ) তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাটাই ছিলো তোমাদের ওপর অবৈধ কাজ (এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লংঘন); তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কেতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো? (সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা) ব্যক্তি (দ্বীনের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনয়নের) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, তাদের পরকালেও কঠিনতম আযাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে; তোমরা (প্রতিনিয়ত) যা করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন। ৮৬. (বস্তুত) এ লোকেরা আখেরাতের (স্থায়ী জীবনের) বিনিময়ে দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবন খরিদ করে নিয়েছে (এরা যেহেতু আযাব বিশ্বাসই করেনি), তাই (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) তাদের আযাব কিঞ্চিৎ পরিমাণও হালকা করা হবে না, আর না তাদের (কোনোদিক থেকে কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

রুকু ১১

৮৭. আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছি, তারপর একে একে আমি আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি এবং (বাপ ছাড়া সন্তান পয়দা করার মতো) সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং (আমার বাণী ও) পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ز

وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لا

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِ ز فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ

يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ ج فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ

করেছি; (অথচ) যখনি তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো নবী আসতো, তোমাদের মনোপূত না হলে তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অস্বীকার করেছো, তাদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, (আবার) তাদের একদলকে তোমরা হত্যাও করেছো। ৮৮. তারা বলে, (হেদায়াতের জন্যে) আমাদের মন (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে, (আসলে) আল্লাহ তায়ালাকে তাদের (ক্রমাগত) অস্বীকার করার কারণে তিনি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, অতপর তাদের সামান্য পরিমাণ লোকই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে। ৮৯. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কেতাব নাযিল হলো যা তাদের কাছে মজুদ কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (তা ছাড়া) এর আগে তারা নিজেরাই (সমাজের) অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে (এ কেতাব ও তার বাহকের আগমন) কামনা করছিলো, কিন্তু আজ যখন তা তাদের কাছে এলো এবং যা তারা যথাযথ চিনতেও পারলো– তাই তারা অস্বীকার করলো, যারা (আল্লাহর কেতাব) অস্বীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হোক। ৯০. কতো নিকৃষ্ট (বস্তু) সেটি, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের মন প্রাণ বিক্রয় করে দিয়েছে, শুধু গোঁড়ামির বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অস্বীকার করেছে (শুধু এ কারণে যে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকেই নবুওত দিয়ে অনুগ্রহ করেন, (তাদের এ কুফরীর ফলে) তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধে আক্রান্ত হলো; আর কাফেরদের জন্যে তো (এমনিই) অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। ৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের (বনী ইসরাঈল জাতির) ওপর নাযিল করা

بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ

مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ

اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ

اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ

اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ

يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

হয়েছে, এর বাইরে যা- তা তারা অস্বীকার করে, (অথচ) তা একান্ত সত্য, তা তাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর কথাগুলোকেও সত্য বলে স্বীকার করে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি বিশ্বাসীই হও তাহলে আল্লাহর নবীদের ইতিপূর্বে তোমরা কেন হত্যা করেছিলে? ৯২. তোমাদের কাছে তো (এক সময়) সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে মূসাও (নবী হয়ে) এসেছিলো, অতপর তার (সামান্য কয়দিনের অনুপস্থিতির) পরই তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদ হিসেবে) গ্রহণ করে নিলে! কতো (বড়ো) যালেম ছিলে তোমরা! ৯৩. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম তোমাদের মাথার ওপর তূর পাহাড় তুলে ধরে (আমি বলেছিলাম), যা কিছু বিধি বিধান আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, (এর জবাবে) তারা (মুখে তো) বললো হ্যাঁ, আমরা (তোমার কথা) শুনেছি, কিন্তু (বাস্তব জীবনে তা অস্বীকার করে বললো,) আমরা তা অমান্য করলাম, (আসলে) আল্লাহ তায়ালাকে তাদের অস্বীকার করার কারণে সেই বাছুরকে মাবুদ বানানো (-এর নেশা দ্বারা তখনো) তাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখা হয়েছিলো, তুমি (তাদের) বলো, যদি তোমরা সত্যিই মোমেন হও তাহলে বলতে পারো, এটা কতো খারাপ ঈমান- যা একজন ব্যক্তিকে এ ধরনের কাজের আদেশ দেয়? ৯৪. যদি (তোমরা মনে করো,) অন্যদের বদলে পরকালের নিবাস আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট- তাহলে (যাও- তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ৯৫. (হে নবী, তুমি জেনে রাখো,) তা (আল্লাহর সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করে) নিজেদের হাত দিয়ে এরা যা কিছু অর্জন করেছে (তার পরিণাম) জানার পর এরা কখনো তা কামনা করবে না, আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

৯৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) তাদেরকেই বরং তুমি দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বেশী লোভী, আল্লাহ তায়ালার সাথে যারা শেরেক করে– এ (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা তাদের চেয়েও (এক কদম) অগ্রসর, এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হাজার বছর জীবিত থাকতে চায়, কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এদের দেয়া হোক না কেন, তা কখনো (এদের) তাঁর (অবশ্যম্ভাবী) আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্ম (পুংখানুপুংখ) পর্যবেক্ষণ করেন।

রুকু ১২

৯৭. (হে নবী,) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রু হতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) বাণীসমূহ তোমার অন্তকরণে নাযিল করে দেয়, (তাও এমন এক বাণী) যা তাদের কাছে মজুদ বিষয়সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, সর্বোপরি এ হচ্ছে মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ (-বাহী গ্রন্থ)। ৯৮. যারা আল্লাহর শত্রু, শত্রু তাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতার ও নবী রসূলের– (শত্রু) জিবরাঈলের ও মীকাঈলের, (তারা একদিন একথাটা বুঝতে পারবে,) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শত্রু। ৯৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন পাঠিয়েছি; পাপী ব্যক্তিরা ছাড়া এসব কিছু কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ১০০. কিংবা যখনি তারা আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করেছে তখনই তাদের এক দল তা ভংগ করেছে; (আসলে) তাদের অধিকাংশই ঈমানদার ছিলো না। ১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসে এবং যে তাদের কাছে (আগের কেতাবে) যেসব কথা মজুদ রয়েছে তার সত্যতা স্বীকার করে, তখনি সেই আগের কেতাবের ধারকদের একটি দল (পূর্ববর্তী

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

কেতাবের) কথাগুলো এমনভাবে তাদের পেছনের দিকে ফেলে দিলো, যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। ১০২. (আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি, যাদুমন্ত্রের) এমন কিছু জিনিসও এরা অনুসরণ করতে শুরু করলো, (যা) শয়তান কর্তৃক সোলায়মান (নবী)-এর রাজত্বের সময় (সমাজে) চালু করা হয়েছিলো, (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান কখনো (যাদুকে আল্লাহবিরোধী কাজে ব্যবহার করে) আল্লাহকে অস্বীকার করেনি, আল্লাহকে তো অস্বীকার করেছে সে সব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে; (যাদুপাগল কিছু মানুষদের পরীক্ষার উদ্দেশে) আল্লাহ তায়ালা হারূত মারূত (নামে যে দু'জন) ফেরেশতাকে ব্যাবিলনে পাঠিয়েছেন, (আল্লাহর) সেই দু'জন ফেরেশতা (কাউকে) যখনই এ বিষয়ের শিক্ষা দিতো, (প্রথমেই) তারা (একথাটা) তাদের বলে দিতো, আমরা তো হচ্ছি (আল্লাহর) পরীক্ষামাত্র, অতএব (কোনো অবস্থায়ই) তুমি (এ বিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো না, (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো, (যদিও) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো দিনই কেউ কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না; তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না; তারা যদি জানতো, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে পরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো! ১০৩. তারা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনতো এবং (তাঁকেই) ভয় করতো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরস্কার পেতো; (কতো ভালো হতো) যদি তারা (এটা) অনুধাবন করতো!

তাফসীর

আয়াত ৭৫-১০৪

সূরার পূর্ববর্তী অংশে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং সেই অব্যাহত অনুগ্রহের প্রতি তাদের অস্বীকৃতি ও না-শোকরীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই অনুগ্রহ বিতরণ ও তার অস্বীকৃতির কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। সে সবের কোনটা ছিল সংক্ষিপ্ত, কোনটা বিস্তৃত। সবশেষে বলা হয়েছে যে, তাদের এই অপকর্মের দরুন তাদের মন নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও অনুর্বরতায় পাথরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এখন ৭৫-১০৩ নং আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা এসেছে, তাতে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো মুসলমানদেরকে ইহুদীদের চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশৃংখলা সৃষ্টির ধরণ ও পন্থাসমূহ সম্পর্কে সচেতন করেছে এবং তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বভাবপ্রকৃতির আলোচনা তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ও প্রতারণা থেকে সাবধান করছে, যাতে তারা ইহুদীদের লম্বা লম্বা বুলিতে ও শঠতাপূর্ণ আচরণে বিভ্রান্ত না হয় এই বিস্তীর্ণ আলোচনায় ইহুদীদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারাবাহিকতায় কোথাও কোথাও ইহুদীদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। মুসলমানদের গোচরীভূত করেই ইহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কি অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছিল, কিরূপ ঔদ্ধতের সাথে তা লংঘন করেছিল এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য আগত নবীদের তারা কিভাবে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং হত্যাও করেছে। কেননা তারা এদের কুপ্রবৃত্তির সহযোগী হতে রাযী হননি। তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শরীয়তের বিরোধিতা করেছে। অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহর কেতাবের শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি ঘটিয়েছে।

ইহুদীরা মনে করতো যে, আল্লাহর কাছে তাদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং সেই সুবাদে তাদের দু'চার দিনের বেশী দোযখে থাকার প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ তায়ালা রসূল (সঃ)কে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যেন এর জবাবে বলেন,

'তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করেছো যে, তিনি সেই চুক্তি কিছুতেই লংঘন করবেন না? না কি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে যা জানোনা তাই বলছো?' (আয়াত-৮০)

ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে তারা বলতো, 'আমাদের ওপর যে কেতাব নাযিল হয়েছে তার প্রতি আমরা ঈমান রাখি...... তার সমর্থক।' (আয়াত ৯১)

এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা রসূল (সঃ) কে শেখাচ্ছেন যে, তারা যে তাদের কাছে নাযিল করা কেতাব মানে সে দাবীও যেন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর পূর্বের নবীদেরকে কেন তোমরা হত্যা করতে!' (আয়াত ৯১-৯৩)

তারা দাবী করতো যে, বেহেশ্‌ত অন্য কোন জাতির জন্য নয় এবং কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে শিখিয়ে দেন যে, তিনি যেন তাদেরকে 'মোবাহালার' চ্যালেঞ্জ দেন। মোবাহালা হলো এই যে, ইহুদী ও মুসলমান উভয় জাতি একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যেন তিনি মিথ্যাবাদীর মৃত্যু ঘটান।

'বলো আখেরাতে বেহেশ্‌ত যদি আল্লাহর কাছে কেবল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকে অন্য কারো তাতে কোন অধিকার না থাকে, তাহলে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে মৃত্যু কামনা করো।' (আয়াত ৯৪)

এর পরবর্তী আয়াতেই আবার বলা হয় যে,

'তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।'

বাস্তবেও তাই ঘটলো। তারা মোবাহালার জন্য প্রস্তুত হলো না। কারণ তারা জানতো যে, তারা নিরেট মিথ্যা দাবী করেছে।

এভাবেই আলোচনা এগিয়ে চলেছে। এতে বনী ইসরাঈলের সাথে আলাপ বিনিময় তাদের মনে লুকানো দুরভিসন্ধির উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করা বা দুর্বল করা, তাদের ধোঁকাবাজি ও নাশকতামূলক তৎপরতা উন্মোচন করা এবং ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে তাদের ধড়িবাজি ও গলাবাজি বুঝতে মুসলমানদের সাহায্য করাই এ সবের উদ্দেশ্য।

মুসলিম উম্মাহ সর্বকালেই ইহুদী চক্রান্তের শিকার হয়ে আসছে। তাদের পূর্বসূরীরাও অনুরূপ ইহুদী দুরভিসন্ধীর শিকার হতো। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, পূর্বসূরীরা যেরূপ কোরআনের নির্দেশাবলী ও আল্লাহর হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন এবং মদীনার সেই প্রথম মুসলিম সংগঠন ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগেই ইহুদী চক্রান্তের মোকাবেলা করে তাদেরকে পরাভূত করেছিলেন, পরবর্তীকালের মুসলিম উম্মাহ আর তেমন কোরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে তার মোকাবেলা করছে না। ইহুদীরা আজও তাদের কূটিল চক্রান্ত দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে তার দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত ও কোরআন থেকে বিপথগামী করে চলেছে। মুসলমানরা যাতে কোরআন থেকে তাদের অব্যর্থ অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম আর হস্তগত করতে না পারে সে জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। মুসলিম উম্মাহ যতদিন তাদের প্রকৃত শক্তি নির্ভুল ও নির্ভেজাল জ্ঞানের উৎস থেকে দূরে থাকবে, ততদিন ইহুদীরা নিরাপদে থাকবে। যে ব্যক্তিই মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ও কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে, জেনে হোক বা না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সে নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের ক্রীড়নক। মুসলিম উম্মাহ তার অস্তিত্ব, শক্তি ও বিজয় একটিমাত্র জিনিস থেকে অর্জন করেছে। সেটি হলো তার ঈমান, তার দ্বীন ও তার শরীয়ত। এই জিনিসটাই তার টিকে থাকা ও বিজয়ী হওয়ার একমাত্র উপায়। এই দ্বীন ও ঈমান থেকে যতদিন তাকে বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে ততদিনই ইহুদী শক্তি তার দিক থেকে নিরাপদ থাকবে।

৭৫-১০৩ আয়াতের বক্তব্য নিয়ে এই সামগ্রিক আলোচনার পর এবার একে একে আমি এর তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

তৎকালীন মোমেনদের অবস্থা

ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা, রুক্ষতা ও বন্ধাত্যের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন যে, তা জমাট পাথরের মত যা থেকে এক ফোঁটা পানিও বের হয় না, যা ধরার কোন কোমলতা অনুভূত হয় না এবং যাতে কিছুমাত্র জীবনের স্পন্দন নেই। এই তুলনা দ্বারা একথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এমন কঠিন, ফাঁপা ও জমাট স্বভাবের কাছে কোন পরিবর্তনই আশা করা যায় না। এই চিত্র ও এই শিক্ষার প্রেক্ষাপটে আলোচনার দ্বারা মোমেনদের দিকে পরিচালিত হয়েছে, যারা বনী ইসরাঈল তথা ইহুদীদের হেদায়াতের ব্যাপারে খুবই উদগ্রীব ছিল। তাদের কাছে হতাশাব্যঞ্জক সুরে প্রশ্ন করা হয়েছে,

'তোমরা কি আশা করছো যে তারা ঈমান আনবে, অথচ তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করেছিল এবং জেনে বুঝে তা বিকৃত করেছিল।'

'অর্থাৎ এ ধরনের মানুষের ঈমান আনার ব্যাপারে কোনই আশা করা যায় না। ঈমান আনার জন্য কয়েকটি ভিন্ন ধরনের স্বভাব ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। মোমেনের স্বভাব থাকে উদার ও কোমল। তার ভেতরে ঈমানের আলো প্রবেশের জন্য জানালা থাকে খোলা। আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত উৎসের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টির যোগ্যতা থাকে। কারণ তার হৃদয় আর্দ্রতা, কোমলতা ও স্বচ্ছতার গুণে গুণান্বিত হয়। উপরন্তু তার মধ্যে তীব্র সংবেদনশীলতা, আল্লাহভীরুতা এবং সতর্কতা থাকে। এই আল্লাহভীতি, তাকে আল্লাহর বাণী শোনার ও বুঝার পর তাকে সজ্ঞানে বিকৃত করা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং মোমেনের স্বভাব থাকে সরল ও সোজা। ওলটপালট করা ও বিকৃত করা থেকে তা হামেশাই বিরত থাকে।

যে দলটির প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে তারা ছিল ইহুদী জাতির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী ও সচেতন গোষ্ঠী। যে নিগূঢ় তত্ত্ব তাদের কেতাবে অবতীর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা ছিল সর্বাধিক পারদর্শী।

তারা হচ্ছে তাদের সমাজের যাজক ও ধর্মীয় পুরোহিত। তাদের নবী হযরত মূসার কাছে নাযিল করা কেতাব তাওরাতে যে বাণী তারা শুনতো, তাকে নির্দিষ্টস্থান থেকে সরিয়ে তার অর্থ এমনভাবে বিকৃত করতো যে, আসল অর্থের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও থাকতো না। এসব কাজ তারা করতো জেনে শুনেই, অজ্ঞাতসারে নয়। নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় ও স্বার্থের লালসায়ই তারা এরূপ করতো। নিজেদের নবী হযরত মূসার কাছে আগত কেতাবের সাথে যারা এরূপ আচরণ করতো, তারা যে হযরত মোহাম্মাদের কাছে আগত কেতাবের সাথে অনুরূপ আচরণ অধিকতর উৎসাহ ও স্বচ্ছন্দে করতে পারবে এবং সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধ হবে জেনেও ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। শুধু বিরোধিতা কেন, তার ওপর যত মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যায় তাও তারা করবে।

যখন তারা মোমেনদের সাথে মিলিত হতো তখন বলতো, 'আমরা ঈমান এনেছি......... তোমরা কি বুঝতে পারো না?'

অর্থাৎ তারা অংগীকার ভংগ, সত্য গোপন ও আল্লাহর কালাম বিকৃত করার পাশাপাশি লোক দেখানো কাজ, মোনাফেকী ও ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কথায় ঈমান আনবে বলে কি তোমরা আশা করছ? অথচ তাদের কতেকের অবস্থা এই যে, তারা মোমেনদের সাথে দেখা হলে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। অর্থাৎ মোহাম্মদ (সঃ) একজন রসূল একথা মেনে নিয়েছি। কেননা একে তো তাওরাতে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তদুপরি তারা তাঁর অপেক্ষায়ও ছিল। আর তাঁর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শত্রুর ওপর বিজয়ী করুন এই মর্মে তারা দোয়াও করতো। এটাই এই উক্তির মর্ম যে,

'ইতিপূর্বে তারা কাফেরদের ওপর বিজয় কামন করতো।'

কিন্তু তারা পরস্পরে নিভৃতে মিলিত হলেই একে অপরকে এই বলে তিরস্কার করতো যে, মোহাম্মদের (সঃ) নবুওতের সত্যতার সপক্ষে তাদের কেতাব ও তাওরাতে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, তা মুসলমানদের কাছে কেন ফাঁস করা হলো? তারা পরস্পরকে বলতো,

'আল্লাহ যে সত্য তোমাদের কাছে উদঘাটন করেছেন, তা কি তোমরা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিচ্ছ? তাহলে তো তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি পেয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে তা তুলে ধরতে পারবে।' (আয়াত ৭৬)

এখানেই তারা তাদের স্বভাবের হাতে ধরা পড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা যে গুণাবলী এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় রকমের জ্ঞানের অধিকারী সে পরিচয় থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তারা ধারণা করতো যে, মুসলমানদেরকে তারা যদি তাওরাতের তথ্য জানায় তাহলেই কেবল তারা আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে, আর যদি গোপন করে রাখে ও চুপচাপ থাকে, তাহলে আর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করার মত কোন দোষ খুঁজে পাবেন না। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তারা পরস্পরকে বলতো!–

'তোমরা কি বুঝতে পারোনা?'

তাদের এসব বাক্যালাপ আসলে বিবেক ও বোধশক্তির প্রতি এক নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্যই তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করার আগে পরবর্তী আয়াতেই তাদের এই চিন্তাধারায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এই বলে,

'তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন?'

ইহুদী প্রসংগ

এরপর কোরআন পুনরায় বনী ইসরাঈলের ইতিবৃত্ত আলোচনা রেখেছে। তারা ছিলো দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, একটি হলো নিরক্ষর ও নিরেট মূর্খ। তাদের ওপর যে কেতাব নাযিল হয়েছে, তাতে কি আছে না আছে তার তারা কিছুই জানতো না। এ কেতাব সম্পর্কে কিছু কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ছাড়া আর কিছুই তাদের ছিল না। বড়জোর এতটুকু জনশ্রুতি তাদের মধ্যে ছিল যে, তারা নাকি আল্লাহর প্রিয় জাতি, তারা যত গুনাহ ও পাপের কাজ করুক সবই মাফ হয়ে যাবে এবং সকল আযাব থেকে মুক্তি তাদের সুনিশ্চিত। আরেকটি শ্রেণী ছিল, যারা এই অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে পুঁজি করে আল্লাহর কেতাবকে বিকৃত করতো। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর কেতাবের শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করা, ইচ্ছামত কিছু কিছু বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলা, কিছু কিছু কথা প্রকাশ করা অথবা নিজের পক্ষ থেকে কিছু মনগড়া কথা রচনা করে তাকে আল্লাহর কেতাবের অংশ বলে জনসমক্ষে প্রচার করা এসবই ছিল এই শ্রেণীটির নিত্যকার অভ্যাস। এ সবের উদ্দেশ্য ছিল আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্ব কবজা করা। একথাই ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়েছে, এমতাবস্থায় উক্ত দুই শ্রেণীর লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করবে, হেদায়াতের পথে অবিচল থাকবে, আর তাদের অপকর্মের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী তাওরাতের উক্তিগুলোকে বিকৃত করার কাজ থেকে বিরত থাকবে এমন আশা কি করে করা যায়? বস্তুত, মুসলমানদের কথা শুনে তারা ঈমান আনবে সে আশা আর নেই। আল্লাহর কেতাবকে বিকৃত করা, জাল করা ও মনগড়া কথা রচনা করে তাকে আল্লাহর কেতাবের অংশ বলে চালানোর চেষ্টার কারণে তাদের জন্যে যা অপেক্ষা করছে তা ধ্বংস ও বিনাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহর ন্যায়বিচারের নীতি তার বিশ্ব ব্যবস্থাপনার রীতি ও নিয়ম এবং কর্ম ও কর্মফলের ব্যাপারে তার প্রবর্তিত ও অনুসৃত সঠিক ও নির্ভুল পন্থার একেবারেই বিপরীত ও বেখাপ্পা যেসব আশা ভরসা ও আকাংখা তারা পোষণ করতো, তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা মনে করতো, তাদের কাজকর্ম চালচলন ও স্বভাব চরিত্র যেমনই হোক না কেন, আযাব থেকে তারা মুক্তি পাবেই এবং নিদেনপক্ষে দোযখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করলে মাত্র কয়েক দিনের জন্যই করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা বেহেশতে প্রবেশের অধিকার পাবে। কিসের ভিত্তিতে তাদের এই আশা আকাংখা? কিসের ওপর নির্ভর করে তারা তাদের দোযখ বাসের সময়টাকে এভাবে নির্দিষ্ট করে ফেলতো, যেন তা একটা সুনির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক চুক্তির ফল? একমাত্র অজ্ঞ জনগণের আকাশ

কুসুম বাসনা এবং ফন্দিবাজ আলেমদের মিথ্যা প্রচারণা ও অসার আশ্বাস ছাড়া এর আর কোন ভিত্তি ছিলো না। একমাত্র সেইসব লোকেরাই এ ধরনের আশ্বাস নির্ভর করে যারা সঠিক আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েও দীর্ঘ আশা পোষণ করে এবং প্রকৃত ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কাছে ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কাছে ইসলামের শুদ্ধ নাম ও আকৃতিই অবশিষ্ট থাকে, তার প্রকৃত বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব উপস্থিত থাকে না। আর তা সত্ত্বেও তারা এটা ভাবে যে, এটুকুই তাদের আখেরাতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তারা যে নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী বলে মৌখিক দাবী করে থাকে, সে কারণেই তারা মুক্তি পাবে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে যে অকাট্য যুক্তি শেখাচ্ছেন তা হলো,

'তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করেছো যে, তিনি কখনো নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না? তাহলে দেখাও তো কোথায় সেই প্রতিশ্রুতি, নাকি তোমরা নিছক আন্দাযেই বলে দিচ্ছো যা জানোনা?'

বস্তুত, সেটাই আসল ঘটনা। প্রশ্নের মাধ্যমে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার ও ধমক প্রদান।

এখানেই তাদের কাছে এই দাবীর চূড়ান্ত ও অকাট্য জবাব এসে যাচ্ছে এবং তা আসছে ইসলামের একটি অকাট্য ও চিরন্তন মূলনীতি ঘোষণার মাধ্যমে। এ মূলনীতি হলো জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ও সামগ্রিক চিন্তাধারার ফসল। বস্তুত, কর্মফল আসলে কর্মের প্রকৃতি অনুসারেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

'(ন্যায় ও ইনসাফের দাবী তো হচ্ছে) যে কোনো ব্যক্তিই অপরাধ করবে এবং যাকে তার পাপ ঘিরে রেখেছে এমন লোকেরা জাহান্নামের........ বেহেশতবাসী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।' (আয়াত ৮১-৮২)

ব্যক্তির পাপপুণ্যই একমাত্র বিচার্য

এখানে ক্ষণেকের জন্যে আমাদের জানতে হবে এবং যে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক অবস্থার শৈল্পিক চিত্র আঁকা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আল্লাহর যে অকাট্য ফায়সালা এখানে ঘোষিত হয়েছে তার কিছু কারণ ও রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। বলা হয়েছে,

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কোন পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে ঘেরাও করে ফেলেছে।'

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, পাপ কি যথার্থই কোন উপার্জিত বা উপার্জনযোগ্য জিনিস? যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটা এখানে বুঝানো হয়েছে তাহলো পাপ উপার্জন করা। কিন্তু যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তা একটা সুবিদিত মানসিক অবস্থার প্রতি ইংগিত করছে। সেই অবস্থাটা এই যে, যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে সে তা অভ্যাসের বশে আনন্দের সাথে করে। এ কারণেই তাকে সে একটা অর্জন বলে মনে করে। আর যদি পাপ কাজ তার অপছন্দ হতো, বিস্বাদ লাগতো, তাহলে তা করতো না। আর যদি সে অনুভব করতো যে, পাপ কাজ ক্ষতিকর তবে তা সে আবেগ ও আগ্রহের সাথে করতো না। আর পাপ কাজ তার সমগ্র দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলুক এটাও সে হতে দিতো না। সে যদি পাপ কাজকে অপছন্দ করতো এবং তার ক্ষয়ক্ষতি উপলব্ধি করতো তাহলে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া তো দূরে থাকো, তার ছায়া দেখলেও ভয়ে সে পালাতো। এমনকি পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হলেও সে পাপের কাছে নতি স্বীকার করতে চাইতো না। আর সর্বদা ক্ষমা

চাইতো এবং যেখানে গেলে গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে সেখানে চলে যেত। এ রকম পরিস্থিতিতে পাপে তার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারতো না এবং তার তাওবা ও কাফফারার পথ রুদ্ধ হতো না। আয়াতে বলা হয়েছে–

'এবং পাপ যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।'

এ উক্তিটিতে আসলে উপরোক্ত অর্থ প্রতিফলিত করছে। এটা কোরআনের একটা বিশেষ বর্ণনাভংগী। এরূপ বর্ণনাভংগীতে মানুষের অনুভূতির ওপর যে গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা নিছক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব থেকে ভিন্ন। মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কোনো স্থায়ী আবেদন থাকে না এবং কোনো গতিও থাকে না। বস্তুত পাপী যখন নিজেকে পাপাচারে নিমজ্জিত ও আচ্ছন্ন দেখতে পায়, তখন তার যে মানসিক অবস্থা হয়, তার চেয়ে সুন্দর চিত্র আঁকা যেতে পারে না যে, সে নিজের পাপের কারাগারে বন্দী। এই বন্দী দশায় সে জীবন যাপন করে, এই পরিবেশে সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং তার ভেতরেই সে বেঁচে থাকে।

পাপী যখন পাপের কারাগারে বন্দী থাকে এবং তার তাওবার সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত ও ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়,

'তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'

এর সাথে সাথেই এর পরবর্তী বিপরীত সিদ্ধান্তটি এসে যায়।

'আর যারা ঈমানদার এবং সৎ কাজ করে, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'

বস্তুত, ঈমানের স্বাভাবিক দাবী এই যে, হৃদয়ে তার বীজ সুপ্ত হয়ে সৎ কাজের আকারে তার বৃক্ষ গজাবে। যারা ঈমানের দাওয়াত দেয় তাদের এ সত্যটা ভালোভাবে উপলব্ধি করা কর্তব্য। আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি, তাদের এ বিষয়ে মজবুত বিশ্বাস রাখা উচিত। যে ঈমান থেকে সৎ কাজ উৎসারিত হয় না, তা ঈমানই নয়। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তারপর পৃথিবীতে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য ছড়ায় এবং দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর জীবন ব্যবস্থাকে, আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করা তথা–সমাজে ইসলামী নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার সংস্কারমূলক আন্দোলনের বিরোধিতা ও শত্রুতা করে, তাদের ভেতরে ঈমান বলতে কিছু নেই এবং আল্লাহর কোনো শুভ প্রতিদান পাওয়ার তাদের কোনো অধিকারও নেই। ইহুদীদের মতো তারা যতই উচ্চাশা পোষণ করুক যে, তাদের কোন আযাব হবে না–তাদেরকে আযাব থেকে রেহাই দেবার কেউ নেই।

এরপর আলোচনার ধারা পুনরায় ইহুদীদের চরিত্রের বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। কিভাবে তারা আল্লাহর না-ফরমানী, আল্লাহর কেতাবের বিকৃতি সাধন, বিপথগামিতা ও প্রতিশ্রুতি লংঘনে লিপ্ত হতো তা আল্লাহ মুসলমানদেরকে অবহিত করেছেন। এসব বিষয় ইহুদীদেরকে এমনভাবে স্মরণ করিয়েছেন যেন মুসলমানরাও তা জানতে পারে।

'যখন আমি বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে (এই মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে না, মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ....মনোপুত না হলে (কিংবা তোমাদের ইচ্ছা ও প্রবণতার বিরোধী হলে) তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অস্বীকার করেছো। এদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, আবার এদের একদলকে তোমরা (বিনা কারণে) হত্যাও করেছো।' (আয়াত ৮৩-৮৭)

ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভংগ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের প্রতিশ্রুতি ভংগের প্রতি কিছু ইংগিত দিয়েছেন। আর এখানে আল্লাহ তায়ালা সেই প্রতিশ্রুতির সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা উল্লেখ করে কিভাবে তা লংঘন করা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রথম আয়াত (৮৪ নং) থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মাথার ওপর আস্ত পাহাড় উত্তোলন করে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে যে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন, যে অংগীকারকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে ও তার প্রতিটি কথা স্মরণ রাখতে বলেছিলেন। সে অংগীকারে আল্লাহর দ্বীনের শাশ্বত নীতি ও বিধিমালাসমূহ বিধৃত ছিলো, যা শেষ নবীর আনীত শরীয়তেরও অংগীভূত হয়েছে। কিন্তু তারা সেসব বিধি ও নীতিমালাকে শুধু অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরঞ্চ এমনভাব দেখিয়েছে যেন তা কখনো তারা জানতোই না।

আল্লাহর এই অংগীকারনামায় এ কথা ছিলো

যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো হুকুম ও আইনের আনুগত্য তারা করবে না এবং কারো এবাদাত উপাসনা করবে না। এটা হলো শাশ্বত তাওহীদের পয়লা মূলনীতি। এরপর এসেছে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতীম ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় আচরণ। সাধারণ মানুষের সাথে ভালো ভালো কথা বলার আদেশও এর আওতাধীন। আর এই ভালো কথা বলার আবার প্রথম বিষয় হলো, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। অনুরূপভাবে নামায ও যাকাতের ন্যায় ফরয কাজের আদেশও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে এসবই হচ্ছে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধি ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত।

এখান থেকে দু'টো বিষয় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। একটি হলো, আল্লাহর বিধানের একত্ব এবং সর্বশেষে মোহাম্মদ (স.)-এর নিকট যে শরীয়ত এসেছে তার পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার প্রতি সমর্থন। দ্বিতীয়ত, ইহুদীরা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ ছিলো

এই সর্বশেষ আসমানী দ্বীনে অবিকল তারই আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ইহুদীরা চরম হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়েছে।

এখানে এই বিব্রতকর ও লজ্জাকর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে অতীতের ঘটনা বর্ণনায় সাময়িক বিরতি দিয়ে বনী ইসরাঈলের উপস্থিত প্রজন্মকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে তাদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের সাথে কথা বলা হয়েছে। এখানে পুনরায় ইহুদীদের দিকে সম্বোধন করা হলেও এটা অধিকতর অবমাননাকর ও ভর্ৎসনামূলক। যথা,

'অতপর মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সবাই অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।'

এই বিস্ময়কর মহাগ্রন্থে কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্বোধনের ঘন ঘন পরিবর্তনের কিছু কিছু নিগূঢ় রহস্য এখানে উদ্ঘাটিত হয়।

আলোচনার ধারায় বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে কথা বলা অব্যাহত রয়েছে। তারা কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'এবং স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা নিজেদের লোকদের রক্তপাত করবে না এবং তাদেরকে তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা যে তা স্বীকার করে নিলে তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী।'

এভাবে তারা সশরীরে উপস্থিত এবং নিজেরাই সাক্ষী থেকে যে অংগীকার করলো সে অংগীকারের সাথে তারা কি আচরণ করলো? এর জবাব পাওয়া যাবে পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায়।

এখানে ইহুদীদের যে আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিলো আওস ও খাযরাজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কিছুকাল পূর্বের ঘটনা। মদীনার এই দুটি গোত্র আওস ও খাযরাজ ছিলো পৌত্তলিক এবং আরবের অন্য সকল গোত্রের চেয়ে পরস্পরের প্রতি বেশী শত্রুভাবাপন্ন। মদীনার ইহুদীরা তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিলো এবং তারা এই দুই পৌত্তলিক গোত্রের কোনো না কোনোটার সাথে নানা রকমের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো। বনু কাইনুকা ও বনু নযীর ছিলো খাযরাজের এবং বনু কোরাইযা ছিলো আওসের মিত্র। যখনই তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধতো, প্রত্যেক ইহুদী গোত্র তার মিত্র পৌত্তলিক গোত্রের পক্ষে যুদ্ধ করতো। ইহুদী তার মিত্রের শত্রুকে হত্যা করতো। ফলে কখনো কখনো এক পক্ষের ইহুদী অপর পক্ষের ইহুদীকেও হত্যা করতো। অথচ আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার অনুসারে এটা তাদের জন্যে হারাম ছিলো। একইভাবে মিত্র পক্ষ বিজয়ী হলে শত্রুপক্ষীয় ইহুদীদেরকে তারা বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করতো তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতো এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করতো। এসব কাজও আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার অনুসারে তাদের ওপর হারাম ও অবৈধ ছিলো। তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বন্দীদের মুক্তি দিতো। যে সব ইহুদী বন্দী হয়ে তাদের নিকট তাদের মিত্র পক্ষের নিকট অথবা মিত্রপক্ষের শত্রুদের নিকট আসতো তাদেরকে মুক্ত করে নিতো। কারণ তাদের ব্যাপারে তাওরাতের নির্দেশ ছিলো, 'তোমরা বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তিকে গোলাম অবস্থায় পেলে তাকে মুক্ত করবে।' পবিত্র কোরআন তাদের এই পরস্পর বিরোধী কর্মকান্ডের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং বিস্ময় প্রকাশ করছে যে,

'তোমরা কি কেতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ মানোনা?'

এটা ছিলো আল্লাহর সাথে করা অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ। এই অংগীকার লংঘনের পরিণাম যে দুনিয়ার জীবনে অবমাননা ও লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে আরো ভয়ংকর শাস্তি, সে কথাও এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এই সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ নন এবং তা তার চোখ এড়িয়েও যায় না।

এই আয়াতে মুসলমান ও সমগ্র মানব জাতির প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সে সব ইহুদীর পরিণাম ও তাদের কর্মকান্ডের স্বরূপ জানানো হচ্ছে।

'তারাই সেই সব লোক যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরিদ করে নিয়েছে। ফলে তাদের আযাব কিছুমাত্র কমানো হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।'

এ থেকে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, 'দোযখের আগুন তাদেরকে কয়েক দিনের জন্যে ছাড়া স্পর্শই করবে না।' কেননা কোরআন জানাচ্ছে যে, তারা দোযখে যাবে এবং সেখানকার আযাব তাদের জন্যে মোটেই কমানো হবে না বা তাদের কোনোরকম সাহায্যও করা হবে না।

আর তারা যে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে কিনে নিয়েছে, এর মর্মার্থ এই যে, তারা মোশরেকদের দ্বীন ও কেতাবের বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার লংঘন না করে গত্যন্তর থাকে না। তাদের দুই দলে বিভক্ত হওয়া এবং দুই মৈত্রী শিবিরের সাথে যুক্ত হওয়াটাই হলো ইসরাঈলীদের ঐতিহ্যগত স্বভাব। তারা লাঠির মাঝখানে ধরতো, যাতে যখন যে দিক ইচ্ছা আঘাত করা যায়। বিবাদমান পক্ষগুলোর প্রত্যেকের সাথে গোপন যোগাযোগ রেখে

তারা একদিকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো, অপরদিকে যে পক্ষই বিজয়ী হোক তার থেকে কিছু না কিছু লাভবান হতো এবং ইহুদী জাতির স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হতো। আর আল্লাহর প্রতি যার আস্থা ও নির্ভরশীলতা নেই এবং তাঁর সাথে কৃত অংগীকারের প্রতিও আনুগত্য নেই এটা হচ্ছে তার স্বভাব। তাদের যাবতীয় আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিলো

চালাকি ও কূটনীতির ওপর, পার্থিব অংগীকারের ওপর এবং আল্লাহর সাহায্যের পরিবর্তে তাদের মতো অন্য মানুষের ওপর। অথচ ইসলামের প্রতি ঈমান আনা মাত্রই এমন যে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম হয়ে যায়, যা আল্লাহর সাথে করা অংগীকারের বিরোধী এবং স্বার্থ ও নিরাপত্তার নামে যা শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী কাজ করতে বাধ্য হতে চায়। বস্তুত ইসলামের চূড়ান্ত কথা হলো, ইসলামের বিধান মেনে চলাতেই মুসলমানের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়। আর আল্লাহর সাথে করা চুক্তি সংরক্ষণেই মুসলমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

এরপর আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে নবুওত ও নবীদের প্রতি বনী ইসরাইলের আচরণের বিবরণের মধ্য দিয়ে। তাদের নবীরা যখনই তাদের কাছে এমন মহা সত্য নিয়ে এসেছেন, যে সত্য তাদের কু-প্রবৃত্তির সাথে আপোষ করতে ও মাথা নোয়াতে প্রস্তুত ছিলো না সেই সত্য তখন তারা তাদের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম এবং তারপরে ধারাবাহিকভাবে আরো অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম। ঈসা ইবনে মারইয়ামকে অকাট্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম এবং তাকে পবিত্র আত্মা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। যখনই তোমাদের কাছে কোনো রসূল তোমাদের খেয়ালখুশীর বিরোধী বক্তব্য নিয়ে এসেছে, তখনি তোমরা কি অহংকারী হয়ে যাওনি এবং কতক রসূলকে মিথ্যুকে সাব্যস্ত ও কতেক রসূলকে হত্যা করোনি?' (আয়াত ৭৭)

ইসলামকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে বনী ইসরাঈল এই যুক্তি প্রদর্শন করতো যে, তাদের কাছে নবীদের শিক্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রয়েছে এবং তারা তাদের শরীয়ত ও উপদেশ মেনে চলছে। এখানে কোরআন তাদের মুখোশ্ উন্মোচন করে দেয় এবং তারা তাদের নবীদের প্রতি, নবীদের উপদেশবাণী ও শরীয়তের প্রতি কেমন অনুগত এবং তাদের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর পরিপন্থী সত্যের মুখোমুখী হয়ে তারা কেমন চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এসেছে, কোরআন তা সম্পূর্ণ নগ্নভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেছে।

ইতিপূর্বে তারা আল্লাহর কেতাবপ্রাপ্ত মূসা (আ.)-এর সাথে কি আচরণ করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আরো জানানো হচ্ছে যে, তাদের নবীরা হযরত মুসার পরেও ক্রমাগতভাবে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষে আসেন ঈসা (আ.)। আল্লাহ তায়ালা তাকে অকাট্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী দিয়েছিলেন এবং তাকে পবিত্র আত্মা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন। এই বিপুলসংখ্যক রসূল এবং তাদের সর্বশেষ রসূল হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে? কোরআন তাদের এই আচরণের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং তারা নিজেরাও তা অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি স্বয়ং তাদের কেতাবেই তার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। সে সাক্ষ্য হলো এই যে, যে সব নবী তাদের খেয়াল খুশী মত কথা বলেনি, তাদের কাউকে তারা অস্বীকার এবং কাউকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আল্লাহর পথ প্রদর্শকদের ও আল্লাহর প্রেরিত শরীয়তকে প্রবৃত্তির খায়েশ এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ভাবাবেগের অনুগত করার অপচেষ্টা এমন একটা খারাপ বৈশিষ্ট, যা মানুষের

জন্মগত সৎ প্রবৃত্তি ও বিবেককে এবং ন্যায়ভিত্তিক যুক্তিপ্রিয়তাকে বিকৃত করে দেয়। মানুষের এই সহজাত ন্যায়নীতি প্রবণতা ও সৎ প্রবৃত্তির দাবী এই যে, মানুষ যে আইন ও শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপন করবে তার উৎপত্তি যেন একটা চিরস্থায়ী উৎস থেকে হয়। নিত্য পরিবর্তনশীল মানুষের ভাবাবেগ, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক প্রবণতা যেন তার উৎস না হয়। তার গোড়ায় যেন একটা অটল মানদন্ড থাকে, যা সাময়িক ক্রোধ বা তুষ্টি, রোগ বা সুস্থতা এবং ঝোঁক আবেগের সাথে পরিবর্তিত হয় না এবং মানুষ সেই মানদন্ডকে নিজের প্রবৃত্তির বশীভূত না করে বরং নিজেই তার বশীভূত অনুগত শরণাপন্ন হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পতিত হওয়া থেকে মুসলমানরা যাতে সাবধান হয় এবং পৃথিবীর খেলাফত ও শাসনের যে দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন তা কেড়ে নেবার মত অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে বনী ইসরাঈলের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যখন বনী ইসরাঈলের মত পরিস্থিতিতে পতিত হলো আল্লাহর বিধান ও ইসলামী শরীয়তকে বর্জন করে নিজেদের খেয়ালখুশী মোতাবেক চলতে লাগলো এবং সত্যের পথ প্রদর্শনকারীদের কাউকে প্রত্যাখ্যান ও কাউকে হত্যা করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বনী ইসরাঈলেরই পরিণতি ভোগ করালেন। তাদেরই মত বিভেদ, দুর্বলতা, লাঞ্ছনা, অবমাননা, দুঃখ ও দুর্ভোগ তাদের ঘাড়ে চেপে বসলো। এ ভয়ংকর ও শোচনীয় পরিণতি থেকে তাদের উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় যদি থেকে থাকে, তবে সেটা শুধু আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের বিধানকে মেনে নেয়া, আল্লাহর কেতাব ও শরীয়তের সামনে নিজেদের কামনা বাসনা ও খেয়াল খুশীকে বিসর্জন দেয়া ও অনুগত করা, আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পালন করা। সেই অংগীকারকে শক্তভাবে ধারণ করা ও তার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে স্মরণ রাখা। একমাত্র এভাবেই আশা করা যায় যে, মুসলিম জাতি তার ইপ্সিত সত্য ন্যায় ও কল্যাণের পথ ফিরে পাবে।

মোহাম্মদ (স.)–এর সাথে ইহুদীদের প্রতারণা

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো সেটা ছিলো বনী ইসরাঈলের আপন নবীদের সাথে তাদের অনুসৃত নীতি। কোরআন এখানে তাদের সেই ভ্রান্ত নীতির বর্ণনা দিয়েছে। তারপর পরবর্তী কতিপয় আয়াতে নবাগত রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে তাদের অনুসৃত নীতি ও ভূমিকার বর্ণনা দিচ্ছে। এখানেও দেখা যাচ্ছে, তারা সেই চিরাচরিত চরিত্রেরই পরিচয় দিচ্ছে। তারা যেন হুবহু আগেকার সেই বনী ইসরাঈল, যারা ইতিপূর্বে নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে,

'(নবী আগমনের পর) তারা বলে, (হেদায়াত গ্রহণের জন্যে) আমাদের মন (ও তার যাবতীয় দরজা) বন্ধ হয়ে আছে। (আসল কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালাকে তাদের (এই ভাবে) অস্বীকার করার কারণে ....এটা কোন্ পর্যায়ের ঈমান–যা একজন ব্যক্তিকে এ ধরনের (খারাপ) কাজের আদেশ দেয়?' (আয়াত ৮৮-৯৩)

এখানে কোরআনের বর্ণনাভংগী অত্যন্ত কঠোর ও তীব্র আকার ধারণ করেছে। কোথাও কোথাও উত্তপ্ত বাক্যবাণ বর্ষণ এবং হুমকি ধমকি ও হুংকার পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলের আচরণ ও কথাবার্তার জবাবে কোরআন অত্যন্ত কড়া বাক্য উচ্চারণ করেছে। যে সকল আপত্তি ও ওজুহাতের মাধ্যমে তারা সত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অংহকারী ভূমিকাকে আড়াল করতো তা ছিন্ন করে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তারা ছাড়া আর কেউ ইসলামের কল্যাণকর ব্যবস্থা লাভ করুক, তা ছিলো তাদের ভীষণ অপছন্দ এবং এর বিরুদ্ধে ছিলো তাদের ঘোরতর ঈর্ষা, হিংসা ও আক্রোশপূর্ণ ভ্রূকুটি। ইসলাম ও ইসলামের মহান নবীর বিরুদ্ধে তাদের যে

অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা ছিলো তার শাস্তিস্বরূপই তারা এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা বলে, আমাদের হৃদয়দুয়ারবদ্ধ। বরঞ্চ তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।'

অর্থাৎ তারা বলে যে, আমাদের হৃদয় তালাবদ্ধ থাকায় তার ভেতরে নতুন কোনো দাওয়াত ঢুকছে না এবং নতুন কোনো আহবায়কের আহ্বান এই কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। আসলে তারা এভাবে বলতো শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, রসূল (স.) ও মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিক অথবা কি কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারছে না, তার ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ কথা বলতো। আল্লাহ তায়ালা তাদের কথার জবাবে বলছেন যে, বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে হেদায়াতের পথ থেকে দূরে হটিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে তারাই কুফরীর পথ অবলম্বন করে ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দূরে হটিয়ে দিয়ে ও সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যাখ্যানের শাস্তি দিয়ে 'তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।'

অর্থাৎ তাদের অগ্রিম কুফরী ও প্রাচীন বিভ্রান্তির শাস্তি হিসাবে বিতাড়িত হওয়ার কুফলস্বরূপ তাদের কপালে ঈমান খুব কমই জুটে থাকে। অথবা এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, তারা এমন কট্টর কুফরী করেছে যে, ঈমান তাদের ভাগ্যে খুব কমই জোটে। উপরোক্ত দুটো অর্থই এখানে বক্তব্য ও প্রেক্ষাপটের সাথে প্রযোজ্য।

তাদের কুফরী অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির ছিলো এ জন্যে যে, যে নবীর জন্যে তারা অপেক্ষমান ছিলো, যিনি আসলে তাঁর সাহায্যে তারা সকল অ-ইহুদী গোষ্ঠীগুলোর ওপর বিজয় লাভ করবে বলে আস্ফালন করতো এবং যিনি তাঁদের কেতাবের সমর্থক একখানা কেতাব নিয়েই এলেন, সেই নবীকেই তারা প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করলো। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তাদের কাছে তাদের কেতাবের সমর্থক একখানা কেতাব নিয়ে নবী এলো, অমনি তারা তাদের কাছে আগত সুপরিচিত সত্যকে অস্বীকার করলো। অথচ ইতিপূর্বে তার সাহায্যে আরবের সকল পৌত্তলিক গোষ্ঠীগুলোকে পদানত করার আশায় তারা বিভোর ছিলো।'

এ আচরণটি সত্যিই এত খারাপ ছিলো, তা ধিক্কার ও ক্রোধের উপযুক্ত ছিলো। তাই তাদের ওপর অভিশাপ করা হয়েছে এবং তাদেরকে এভাবে কাফের বলে অভিহিত করা হয়েছে,

'অতপর কাফেরদের ওপর অভিসম্পাত।'

পরের আয়াতটি তাদের এই ঘৃণ্য ভূমিকার জন্যে ভর্ৎসনা করছে এবং তাদের এই ক্ষতিকর ব্যবসার মুখোশ খুলে দিয়েছে। যথা, 'আল্লাহর নাযিল করা কেতাবকে অস্বীকার করার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে যেভাবে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা বড়ই ন্যক্কারজনক।'

অর্থাৎ এই অস্বীকৃতি তথা কুফরী যেন তাদের নিজেদেরই বিনিময় মূল্য। মানুষ নিজেকে কম কিংবা বেশী যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে থাকে। তবে কুফরীর বিনিময়ে বিক্রি করলে সেটা হয় সবচেয়ে শোচনীয় ও ক্ষতিজনক ব্যবসা। এটি একটি উপমা হিসাবে পেশ করলেও এটাই হচ্ছে এখানে বাস্তব ঘটনা। দুনিয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা এভাবে মহা সম্মানিত ঈমানী কাফেলায় যোগ দেয়নি। তারা আখেরাতে অপমানজনক আযাবের যোগ্যতা অর্জন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এ সবের বিনিময়ে তারা কোন্ জিনিসটা পেলো? শুধু কুফরী। এটাই তাদের একমাত্র উপার্জন ও একমাত্র প্রাপ্তি।

যে জিনিসটি তাদেরকে এতবড় ভয়ংকর ক্ষতি মেনে নিতে প্ররোচিত করেছে তা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে তাদের প্রচন্ড ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা নতুন নবী তাদের ভেতরে আসবে বলে তারা প্রতীক্ষায় ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল বানালেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে কোনো বান্দাকে তাঁর অনুগ্রহ বিতরণের জন্যে বাছাই করতে পারেন। অথচ এর বিরুদ্ধেই ছিলো তাদের ক্ষোভ ও হিংসা। এটা ছিলো তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ি। এই যুলুমের ফলে তারা আল্লাহর সীমাহীন ক্রোধ ও আক্রোশের শিকারে পরিণত হলো, তদুপরি আখেরাতে অপমানজনক শাস্তি তো বাড়তি প্রাপ্য হিসাবে রয়েছেই, এ সবই তাদের অহংকার ঈর্ষা হিংসা ও ঘৃণ্য বাড়াবাড়ির করুণ পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে ইহুদীদের যে স্বভাবটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা হলো তাদের মজ্জাগত অকৃতজ্ঞতা, অহংকার ও স্বার্থপরতা, যা প্রচন্ড ধরনের গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের পরিবেশেই বেঁচে থাকে। এই স্বভাবের বৈশিষ্ট এই যে, তা কোনো ভালো জিনিস অন্যের হস্তগত হয়েছে দেখলেই মনে করে যে, তা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েই অন্যকে দেয়া হয়েছে। যে ব্যাপক মানবীয় বন্ধন সমগ্র মানবজাতিকে ঘনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে তারা অনুভবই করে না। এভাবেই ইহুদী জাতি চিরদিন বিচ্ছিন্নভাবে জীবন ধারণ করে এসেছে। তারা সব সময় নিজেদেরকে গোটা মানব জাতির একটা বিচ্ছিন্ন শাখা বলে অনুভব করে। তাই সব সময় অন্যান্য জাতির অমংগল কামনা করে থাকে। তাদের অন্তকরণ সকল মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আক্রোশে পরিপূর্ণ। অন্য জাতির বিরুদ্ধে অন্তরে এই নিরন্তর ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণের কারণে তারা এ ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকে। আর এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকেও তারা নানা রকমের আভ্যন্তরীণ বিভেদে অস্থির করে রাখে এবং যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে। তাদের নিজেদের অন্তরে যে বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে, অন্যদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত লাগিয়ে এবং তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে তার খানিকটা উপশম ও তৃপ্তি অনুভব করে। এভাবে তারা অন্য জাতিগুলোরও সর্বনাশ ঘটায় এবং অন্যদের দ্বারা নিজেদেরও সর্বনাশ সাধনের ব্যবস্থা করে। আর এই সর্বব্যাপী অমংগল সাধিত হয় শুধুমাত্র তাদের উগ্র আত্মম্ভরিতা ও বিজাতি-বিদ্বেষের কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কারণ তারা এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহমুখর ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই নিজের অনুগ্রহ দ্বারা কেন সিক্ত করবেন।' আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর নাযিল করা এই কেতাবের ওপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমাদের ওপর যা ....তার সমর্থক হওয়া সত্তেও অস্বীকার করে। তুমি বলো, তোমরা যদি সত্যিই ঈমানদার হতে, তবে কী কারণে তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীদের হত্যা করতে?' (আয়াত ৯১)

যখনই তাদেরকে কোরআন ও ইসলামের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হতো, তখনই তারা বলতো যে, 'আমরা আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে, তার ওপর ঈমান রাখি।'

তাদের বক্তব্য ছিলো এই যে, আমাদের যা আছে সেটাই যথেষ্ট এবং একমাত্র সেটাই সত্য। তাছাড়া অন্য সব আসমানী কেতাব ও শরীয়তকে তারা অমান্য ও অস্বীকার করতো। এভাবে হযরত ঈসা ও হযরত মোহাম্মদ (স.) উভয়ের আনীত কেতাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করতো। কোরআন তাদের এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করছে। বিস্ময় প্রকাশ করছে তাদের পরবর্তী সময়ে আগত আসমানী কেতাবকে অস্বীকার করতে দেখে। অথচ ওটাও তো তাদের নিজেদের আসমানী

কেতাবের সমর্থক। আসলে কথা হলো সত্যের সাথে তাদের সম্পর্কই বা কি? আর তাদের কেতাবের সমর্থক হয়েছে, তাতেই বা তাদের কি আসে যায়? আল্লাহর নির্দেশকে যতক্ষণ তারা অকাট্য, চূড়ান্ত ও একমাত্র সত্য বলে মেনে না নেয় ততক্ষণ তাদের ঈমানের স্বার্থকতা কি? তারা তো নিজেদের দাসত্ব করে। নিজেদের হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও আত্মম্ভরিতার পুজা করে। তারা আল্লাহর কেতাব ও তার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদেশের নয় বরং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার আনুগত্য করে। তার প্রমাণ এই যে, তারা তাদের কাছে আগত পূর্বতন নবীদের হেদায়াত ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতো। আর এই অকাট্য সত্যটিকে তাদের কাছে তুলে ধরার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবী মোহাম্মদ (স.)-কে এভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন,

'তুমি বলো, তোমরা যদি সত্যই ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে তোমরা ইতিপূর্বে আগত আল্লাহর নবীদের হত্যা করতে কেন?'

অর্থাৎ তোমরা যদি সত্যিই তোমাদের কাছে আগত সত্যের প্রতি ঈমানদার ও অনুগত হয়ে থাকো, তবে সেই সত্যের ধারক ও বাহক নবীদেরকে হত্যা করার কারণ কি? তোমরা তো তোমাদের প্রথম নবী এবং সর্বোচ্চ নির্বাহী হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আগত সত্যকেও অস্বীকার করেছ। এভাবে কোরআন তাদের মোমেন হবার গালভরা দাবীর মুখোশ খুলে দিয়েছে এবং আসমানী কেতাবের প্রতি তাদের চিরাচরিত অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতির মনোভাব প্রকাশ করে দিয়েছে।

অতপর ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলো। তা সত্ত্বেও তোমরা বাছুরকে পুজা করার জন্যে গ্রহণ করে নিলে, তখন তোমরা অন্যায় আচরণ করেছিলে।'

হযরত মূসা (আ.) সুস্পষ্ট বিধান নিয়ে আসার পর তার বেঁচে থাকা অবস্থাতেই এভাবে বাছুর পুজায় লিপ্ত হওয়াটা কি তোমাদের ঈমানদারীর পরিচায়ক ছিলো? এ দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের নিজেদের কেতাবের প্রতি ঈমান রাখার এই দাবী সত্য? শুধু এখানেই শেষ নয়। পাহাড়ের নিচে বসেও একটা অংগীকার নেয়া হয়েছিলো। তারা সে অংগীকারও ভেংগে বিদ্রোহ করেছে। আল্লাহ তায়ালা সেই কথাই তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

'আর যখন আমি তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম ও তোমাদের মাথার ওপর তূর পর্বত উচিঁয়ে করে বলেছিলাম যে..........তবে তোমাদের ঈমান তো তোমাদেরকে বড়ই খারাপ নির্দেশ দিয়ে থাকে!' (আয়াত ৯৩)

এ আয়াতের বক্তব্যের ধারা সম্বোধন থেকে সহসাই তথ্য সরবরাহের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। শুরুতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তাদের আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরেই মোমেনদেরকে এবং সকল মানুষকে তাদের আচরণের কথা জানানো হয়েছে। শেষাংশে রসূল (স.) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের দাবী করা এই অদ্ভুত ধরনের ঈমানের নিকৃষ্টতা ও হীনতা তাদের মুখের সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এটা কি ধরনের ঈমান, যা এমন সুস্পষ্ট কুফরীর নির্দেশ দেয়।

এখানে আমাদেরকে দুটো বিস্ময়কর দৃশ্য চিত্র অংকনকারী দুটো বাক্যের সামনে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। একটি হলো,

'তারা বললো, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।'

অপরটি হলো,

'তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে বাছুরের নেশা পান করানো হয়েছে।'

আসলে তারা 'শুনলাম' কথাটাই শুধু বলে ছিলো। 'অমান্য করলাম', একথা তারা মুখ দিয়ে বলেনি। তাহলে তাদের ব্যাপারে একথা উদ্ধৃত করার কারণ কি? আসলে এটা একটা নিঃশব্দ বাস্তবতার জীবন্ত চিত্র। এ জীবন্ত চিত্র এমন ভাষায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যে তা একটি সোচ্চার ও সরব ঘটনা বলে মনে হয়। তারা মুখে বলে ছিলো

'শুনলাম।

' আর কাজের মাধ্যমে বলে দিলো

'অমান্য করলাম।' কাজের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত বাস্তবতা মুখের কথাকে যে তাৎপর্য দান করে, তা উচ্চারিত ভাষার চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। বাস্তবতার এই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ইসলামের একটি চিরন্তন ও ব্যাপক মূলনীতির দিকে ইংগিত দেয়। সেই মূলনীতি এই যে, কর্ম ছাড়া কথার কোনো মূল্য নেই। কর্মই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। অন্য কথায়, কর্ম হলো মুখ থেকে উচ্চারিত বক্তব্য ও বাস্তব জগতে সংঘটিত ঘটনার মাঝে সমন্বয়কারী উপাদান এবং এর ওপরই সব কিছুর মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল।

আয়াতের অপর অংশে যে বীভৎস ও ন্যক্কারজনক দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে তা হলো, 'তাদের অন্তরে বাছুরের নেশা পান করানো হয়েছে।'

এ একটা বিরল ও নযীরবিহনী দৃশ্য। তাদেরকে পান করানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কারো ক্রিয়া দ্বারা তাদেরকে পান করানো হয়েছে। কি পান করানো হয়েছে? বাছুর অর্থাৎ বাছুরের নেশা পান করানো হয়েছে। কোথায় পান করানো হয়েছে? তাদের অন্তরে পান করানো হয়েছে। এরপর কল্পনা শক্তি সেই বিভৎস ও নিকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করতে থাকে। সেই জঘন্য বিদ্রূপাত্মক ছবিটিকে চিত্রিত করতে থাকে। ছবিটি এরকম যেন একটি বাছুরকে জোর করে হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঢুকানো হচ্ছে। এই বর্ণনাভংগী এত শক্তিশালী যে, এর আসল যে মর্মার্থকে ব্যক্ত করার জন্যে এই বিমূর্ত চিত্র অংকন করা হয়েছে, সেই মর্মার্থই দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সেই আসল মর্মার্থ হলো, বাছুর পূজার প্রতি বনী ইসরাঈলের অদম্য আকর্ষণ ও দুর্নিবার প্রেম। এখানে আরো একধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, বাছুর পূজার প্রেমসুধা তাদেরকে এমনভাবে পান করানো হয়েছে যেন তা অন্তরের অন্তস্থলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানেই কোরআনের বর্ণনাভংগীর অপরূপ বৈশিষ্ট প্রকাশ পায়। এটা নিছক মানসিক মর্ম বিশ্লেষণ নয় বরং একটি দৃশ্য চিত্রায়ন ও ছবি উপস্থাপন। কোরআনের চমকপ্রদ বর্ণনাভংগীর এটা প্রধানতম বৈশিষ্ট।

ইহুদীদের ন্যাক্কারজনক গলাবাজী

এখানেই শেষ নয়। ইহুদীরা গালভরা বুলি আওড়াতো যে, তারা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মনোনীত এবং একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত জাতি, আখেরাতে একমাত্র তারাই সফলকাম হবে এবং তারা ছাড়া আর কেউ পরকালের সাফল্যের কিছুমাত্র অংশ পাবে না বলেও তারা দাবী করতো।

এই দাবী করে তারা একথাই বুঝাতে চাইতো যে, যারা মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনবে তারা আখেরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে না। এর পয়লা উদ্দেশ্য হলো রসূল (স.) ও কোরআন মুসলমানদেরকে আখেরাতের যে সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার প্রতি তাদের বিশ্বাস টলিয়ে দেয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে 'মোবাহালার' চ্যালেঞ্জ দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ উভয় পক্ষ এক জায়গায় অবস্থান নেবে এবং যে পক্ষ মিথ্যাবাদী সে ধ্বংস হোক–এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

'যদি (তোমরা মনে করো যে,) পরকালের নিবাস শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট-(পৃথিবীর আর) কোনো মানুষের (এতে কোনো পাওনা) নেই, তাহলে তো (পরকালের সেই পাওনা পাবার জন্যে) তোমরা (খুব তাড়াতাড়িই) মৃত্যুকামনা করো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও! (তাহলে তাই তোমাদের করা উচিত)।' (আয়াত ৯৪)

এই মোবাহালার নির্দেশ সম্পর্কে কোরআন সাথে সাথেই মন্তব্য করছে যে, তারা কখনো এই মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে না এবং কখনো নিজেদের মৃত্যু চাইবে না। কেননা তারা জানে যে, তারাই মিথ্যুক। তাই তাদের ভয় হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করেও বসতে পারেন এবং তাদের প্রাণ সংহার করে ফেলতে পারেন। তারা এও জানে যে, তারা এ যাবত যে কর্মকান্ড করে এসেছে, তা তাদেরকে আখেরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী করবে না। বরং নিজেদের মৃত্যু চেয়ে দুনিয়ার জীবনটাও খোয়াবে, আর নিজেদের কৃত অপকর্ম দ্বারা আখেরাতটাকে তো ব্যর্থ করেই রেখেছে। তাই তারা এ চ্যালেঞ্জ কখনো গ্রহণ করবে না। কারণ জীবনের জন্যে তারাই সবচেয়ে বেশী লালায়িত। আর এ দুর্বলতার ক্ষেত্রে তারা ও মোশরেকেরা সমান।

'(হে নবী, তুমি জেনে রাখো) এরা কখনোই নিজেদের মৃত্যু কামনা করবে না, (যুগ যুগ ধরে আল্লাহর সাথে যে আচরণ এরা করেছে) এবং নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদের (পরবর্তী জীবনের জন্যে) এরা যা (পাপ) অর্জন করেছে (তার ফলাফল জানার পর) সে ....তা কখনো (এদের) তাঁর অবশ্যম্ভাবী আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্মের পুংখানুপুংখ পর্যবেক্ষণ করেন।' (আয়াত ৯৫-৯৬)

মৃত্যুকে আসলেই তারা কখনো কামনা করবে না, এটাই স্বাভাবিক। কেননা তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে আখেরাতের কোন শুভ প্রতিদানের আশ্বাস দেয়ার মত নয়। তা তাদেরকে শাস্তি থেকেও রক্ষা করার যোগ্য নয়। তাদের সকল কৃতকর্মের রেকর্ড সেখানে সুরক্ষিত। আর অপরাধীদের নিজেদের ও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত রয়েছেন।

ইহুদীদের আরো একটা জঘন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট রয়েছে। তাদের সেই বৈশিষ্টকে কোরআন এখানে এমন নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করেছে যে, তাতে তাদের হীনতা ও নীচতা খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সেটি হলো, জীবনের জন্যে সর্বাধিক লালায়িত হওয়া। কেমন জীবন? কোন সম্মানজনক বা বৈশিষ্টমন্ডিত জীবন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, জীবন একরকম হলেই হলো। সাধারণ, তুচ্ছ ও মানবেতর হলেও চলে। এমনকি পোকামাকড় ও কীটপতংগের জীবন হলেও তাদের চলে। যে কোন মানের জীবনেই তারা সন্তুষ্ট। এই হলো ইহুদীদের খাসলাত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সর্বকালেই তাদের খাসলাত একই রকম। চোখের সামনে থেকে হাতুড়ি সরে গেলই তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর হাতুড়ি দেখা মাত্রই মাথা নোয়ায়। তখন তাদের কপালে কাপুরুষতার লক্ষণ ফুটে ওঠে আর ফুটে ওঠে জীবন ধারণের একটু অবকাশ দানের জন্যে করুণ আকুতি। সেটা যে কোনো রকমের জীবন হোক না কেন!

মোশরেকদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ কামনা করে যে, আহা, যদি এক হাজার বছর বাঁচতে পারতাম! তারা এরূপ বাসনা পোষণ করে এজন্যে যে, তারা আল্লাহর মুখোমুখী হতে হবে এমন কথা কল্পনাও করে না। দুনিয়ার জীবন ছাড়া কোন জীবন আছে তা তাদের ধারণারও অতীত। আর মানুষের মন যখন এরূপ অনুভব করে যে, দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কেনো জীবনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ও যোগাযোগ নেই এবং পার্থিব জীবনের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সময়টুকু ছাড়া আর কোথাও কোনো সময় তাকে কাটাতে হবে না, তখন জীবন সংক্রান্ত ধারণা যে কত

সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। বস্তুত আখেরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস একটা অমূল্য সম্পদ বটে। ঈমান আনার মাধ্যমে মানুষ তার হৃদয়কে এই সম্পদে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এ অমূল্য সম্পদ আল্লাহ তায়ালা যখন নশ্বর ক্ষণস্থায়ী অথচ উচ্চাভিলাষী মানুষকে দান করেন, তখন এক চিরস্থায়ী ও শাশ্বত জীবনের সাথে তার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংযোগের বাতায়ন কেবল তখনই বন্ধ হয়, যখন তার মনমগযে জীবন সম্পর্কে সংকীর্ণ বা বিকৃত ধারণা শেকড় গেড়ে বসে। বস্তুত আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু যে আল্লাহর সর্বাত্মক সুবিচার ও কর্মফল দানের গুণটির প্রতি ঈমান আনা তাই নয়, উপরন্তু-এর অর্থ মানব সত্ত্বাকে এমন জীবনী শক্তি দিয়ে ভরে দেয়া যা তাকে পার্থিব জীবনের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনের সীমাহীন প্রশস্ততা ও ব্যাপ্তি দান করে। সেই প্রশস্ততা ও ব্যাপ্তি যে কত বড় ও বিরাট, তার সঠিক সীমারেখা ও পরিধি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই ঈমান মানব সত্ত্বাকে এতো উন্নত ও মহিমান্বিত করে যে, তা তাকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে সমগ্র মানব জাতির সামনে সোচ্চার ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জ প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন,

'(হে নবী , তাদের) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রু হতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর বাণীসমূহ তোমার ....রসূলের-শত্রু হয় জিবরাঈলের ও মিকাইলের (তারা একদিন অবশ্যই এটা জানতে পারবে যে,) স্বযং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের বড়ো শত্রু।' (আয়াত ৯৭-৯৮)

তাদের জঘন্য চরিত্র

এই চ্যালেঞ্জের মূলে যে ঘটনাটা রয়েছে, তার ভেতর দিয়ে আমরা ইহুদীদের আরেকটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট জানতে পারি। সেটা যথার্থই একটা অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা নিজের পছন্দমাফিক তাঁর এক বান্দার ওপর অনুগ্রহ (অর্থাৎ আল্লাহর বিধান) নাযিল করেছেন বলে ইহুদী জাতির ঈর্ষা ক্রোধ সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে ছিলো। এ কারণে তারা এত স্ববিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলো, যা যে কোনো স্বাভাবিক বিবেকবান মানুষের পক্ষেই ছিলো একেবারে বেমানান। তারা শুনেছিলো যে, জিবরাঈল আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন। অতপর যখন মোহাম্মদ (স.) এর প্রতি তাদের শত্রুতা চরম ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পর্যায়ে উপনীত হলো তখন তারা একটা ভিত্তিহীন কাহিনী ও অসার যুক্তি প্রচার করতে শুরু করলো। সেটি ছিলো এই যে, জিবরাঈল তাদের দুশমন। কেননা তিনি আযাব, গযব ও দুর্যোগ দুর্বিপাক নাযিল করে থাকেন। আর যেহেতু এই জিবরাঈল মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে আসেন, তাই তারা ঈমান আনতে পারছে না। জিবরাঈলের পরিবর্তে যদি মীকাইল ওহী আনতেন, তাহলে তাদের ঈমান আনতে আপত্তি থাকতো না। কেননা মীকাইল পৃথিবীতে বৃষ্টি, উর্বরতা ও স্বচ্ছলতার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

এটি ছিলো আসলে একটা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ খোঁড়া যুক্তি। কিন্তু হিংসা ও ঈর্ষা মানুষকে নির্বুদ্ধিতার বড় নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। নচেত জিবরাঈলের সাথে তাদের শত্রুতার কী যুক্তি থাকতে পারে? তিনি তো কোনো মানুষ নন যে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কাজ করবেন। তিনি তো নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় কিছুই করেন না। তিনি আল্লাহ তায়ালার এক বান্দা মাত্র। আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন তিনি শুধু তাই করেন এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে,'জিবরাঈল আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই তোমার হৃদয়ের ওপর ওহী নাযিল করেছে।'

অর্থাৎ তোমার অন্তরের ওপর ওহী নাযিল করতে গিয়ে তিনি শুধু আল্লাহর ইচ্ছাকেই কার্যকর করে থাকেন। অন্তর হচ্ছে ওহী গ্রহণের স্থান। ওহী গ্রহণের পর অন্তর তা উপলব্ধিও করে। আল্লাহর কেতাব অন্তরের ভেতরেই অবস্থান করে ও সংরক্ষিত হয়। কোরআন 'কলব' বা হৃদয় শব্দটি দ্বারা গোটা বোধশক্তিকেই বুঝায়। এ দ্বারা শুধু দেহের সুপরিচিত অংগ হৃৎপিন্ডকেই বুঝায় না। আয়াতে বলা হয়েছে,-

'এই কেতাবকে জিবরাঈল তোমার অন্তরের ওপর নাযিল করেছে যা আগের সকল কেতাবের সমর্থক এবং মোমেনদের হেদায়াত ও সুসংবাদ।'

বস্তুত, কোরআন সাধারণভাবে তার পূর্বে নাযিল হওয়া সকল আসমানী কেতাবের সমর্থন করে। কেননা সকল আসমানী কেতাবে এবং আল্লাহর দেয়া সকল বিধানের মূল কথা একই। কোরআন তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী সকল মানুষের মনকে সুসংবাদ দেয় ও সঠিক পথ দেখায়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা প্রয়োজন। কেননা কোরআনের বক্তব্য মোমেনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করে, জ্ঞানের দ্বারোদঘাটন করে এবং তাকে বহু সুপ্ত ও সূক্ষ্ম ইংগিত ও অনুভূতি প্রদান করে। যে ঈমান আনে না তার হৃদয়ে এ সবের কিছুই সৃষ্টি হয় না। মোমেন এর মাধ্যমে হেদায়াত ও সুসংবাদ লাভ করে, কোরআনে এ কথা একাধিকবার বলা হয়েছে যে, 'কোরআন আল্লাহভীরু ও সংযমীদের জন্যে পথ নির্দেশক'.........বিশ্বাসীদের জন্যে পথনির্দেশক.......... মোমেনদের জন্যে রোগ নিরাময় ও করুণাস্বরূপ)।' এসব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, হেদায়াত লাভ কেবল ঈমান আল্লাহভীতি ও অটল বিশ্বাসের ফলেই অর্জিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল ঈমানদারও ছিলো না, আল্লাহভীরুও ছিলো না এবং দৃঢ় বিশ্বাসীও ছিলো না। তারা যেমন নবীদের মধ্যে ও তাদের নিয়ে আসা আল্লাহ তায়ালার বিধানের মধ্যে মনগড়া পার্থক্য তৈরী করে নিতো, তেমনি ফেরেশতাদের মধ্যেও তারা বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করতো। বিভিন্ন ফেরেশতার বিভিন্ন নাম ও দায়িত্বের কথা শুনে তারা এরূপ করতো। তারা বলতো! 'মীকাইলের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু জিবরাঈলের সাথে নেই।' এজন্যে পরবর্তী আয়াতে জিবরাঈল মীকাইল এবং আল্লাহ তায়ালার সকল ফেরেশতা ও রসূলের কথা এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ভেতরে কোনো ভেদাভেদ করা যায় না তা বুঝানোই এর উদ্দেশ্য। এ দ্বারা এ কথাও জানানো হয়েছে যে, তাদের কোনো একজনের বিরুদ্ধেও শত্রুতা পোষণ করলে সকলের সাথেই শত্রুতা পোষণ করা হয়, এমনকি সেটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাথেও শত্রুতার শামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ধরনের লোক আল্লাহরও শত্রু এবং কাফের।

এরপর ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং আয়াতে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁর ওপর নাযিল করা সত্য বাণী ও আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এগুলোকে ফাসেক ও আল্লাহদ্রোহীরা ছাড়া কেউ অমান্য করে না এ কথা বলা হয়েছে। এখানে বনী ইসরাঈলের কঠোর নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা কোনো কালেও কোনো ওয়াদা ও অংগীকার রক্ষা করেনি-চাই তা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে, কিংবা তাদের নবীদের সাথে কিংবা মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালরা কেতাবকে তারা যেভাবে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেছে, তারও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন কী কারণে বনী ইসরাঈল তাঁর নাযিল করা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার ও অমান্য করতো। এ কারণটি ছিলো

তাদের না-ফরমানী, অবাধ্যতা এবং স্বভাবের বিকৃতি। কেননা সুস্থ বিবেক ও অবিকৃত স্বভাব আল্লাহর বাণীকে ও আয়াতসমূহকে না মেনে পারে না। সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ও অন্তরে এসব আয়াত আপনা থেকেই গৃহীত হয়ে যায়। ইহুদীরা যদি আল্লাহর আয়াতমূহকে অমান্য ও অস্বীকার করে তবে তার কারণ এটা নয়, এসব আয়াতে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণকারী কোনো যুক্তি নেই। বরং এর কারণ এই যে, তাদের স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে এ কারণটি বুঝিয়ে বলার পর সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে ইহুদীদের সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের একটা জঘন্য স্বভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি এই যে, ইহুদী সমাজ কলহ কোন্দলে জর্জরিত একটি বহুধা বিচ্ছিন্ন সমাজ। তাদের ঘৃণ্য বিজাতি বিদ্বেষ সত্তেও তারা নিজেরা কখনো কোনো একটি বিষয়েও একমত হয় না এবং কোনো একটি পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিও তারা পালন করে না। তারা পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনও রক্ষা করে না। যদিও তারা স্বজাতির আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের অন্ধ গর্বে মাতোয়ারা এবং কোনো অ-ইহুদীকে আল্লাহ তায়ালা কোনো গৌরব বা অনুগ্রহে ভূষিত করুন এটা কোনো মতেই পছন্দ করে না, তথাপি তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নয় এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা অংগীকার রক্ষা করে না, জাতি হিসাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের মধ্যে কোনো না কোনো উপদল তা ভংগ করে। এ কথাই বলা হয়েছে ১০০ নং আয়াতে,

'তাদের এ কি দশা যে, যখনই তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়, তখনই তাদের কোন না কোনো উপদল তা ভংগ করে? আসলে তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন নয়।'

এ কথা সুবিদিত যে, ইহুদীরা তূর পর্বতের পাদদেশে বসে যে প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে দিয়ে ছিলো, তা তারা ভংগ করেছিলো। তারপর তারা নিজেদের নবীদের সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়ে ছিলো, তাও তারা লংঘন করেছিলো। সর্বশেষে বিশ্ব নবী (স.) মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পর তাঁর সাথে তারা যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাও তারা ভংগ করে। সে চুক্তি তিনি তাদের সাথে করেছিলেন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। এই চুক্তি লংঘন করে তারাই সর্বপ্রথম তার শত্রুদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে ও সাহায্য করে, তাঁর প্রচারিত দ্বীনে তারা নানারকমের খুঁত ধরার অপচেষ্টা করে এবং মুসলমানদের সমাজে বিভেদ, অনৈক্য ও কোন্দল বাধাবার ষড়যন্ত্র করে।

কী জঘন্য ইহুদীদের এই চরিত্রটি! অথচ মুসলমানদের চরিত্র ঠিক এর বিপরীত। সে চরিত্রের বর্ণনা রসূল (স.) নিম্নোক্ত হাদীসে দিয়েছেন, 'মুসলমানদের সকলের রক্ত ও প্রাণের মর্যাদা সমান। তারা অমুসলিমদের সহায়। তাদের একজন নগণ্য ব্যক্তিও অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে।' অর্থাৎ একজন সাধারণ মুসলমানও যদি কোনো অমুসলিমকে নিরাপত্তা দেয়ার ওয়াদা করে, তবে তার সেই ওয়াদা কোনো মুসলমানই ভংগ করে না এবং যখন কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন কোনো ব্যক্তিই তা লংঘন করে না। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত কালে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হযরত আবু ওবাইদা তাঁকে চিঠি লেখেন যে, একজন মুসলিম ক্রীতদাস ইরাকের একটি শহরের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানান। হযরত ওমর (রা.) তাকে লেখেন,

'আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি পূরণের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তোমরা এই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে তোমাদেরকে বিশ্বাসভাজন ও ওয়াদাপালনকারী বলে গণ্য করা হবে না। তাই সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূরণ করো এবং সে শহরবাসীর ওপর আক্রমণ না করে অন্যত্র সরে

যাও।' এটি হলো একটি ভদ্র, সুলভ্য, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসভাজন জাতির লক্ষণ। আর এটাই অপরাধপ্রবণ ইহুদী জাতির ও ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিম জাতির চরিত্রের পার্থক্য।

অতপর ১০১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন একজন রসূল এলো, যে তাদের কাছে বিদ্যমান কেতাবের সমর্থনকারী, তখন কেতাবপ্রাপ্তদের একটি দল আল্লাহর কেতাবকে এমনভাবে পেছনে ফেলে দিল, যেন তারা তাঁর কথা জানেই না।'

বস্তুত, ইহুদীদের সম্পাদিত যে কোনো চুক্তি তাদের মধ্যকার কোনো না কোনো দল যে লংঘন করতে অভ্যস্ত, এখানে তারই একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে যে অংগীকার আদায় করেছিলেন, তার মধ্যে এ প্রতিজ্ঞাও ছিলো যে, তিনি পরবর্তী সময়ে যখন যে রসূলকে পাঠাবেন তাঁর প্রতি তারা ঈমান আনবে এবং তাঁকে তারা সাহায্য ও সম্মান করবে। কিন্তু যখনই আল্লাহ তায়ালা একজন নবীকে কেতাবসহ পাঠালেন, অমনি তারা সেই প্রতিজ্ঞা ভংগ করলো এবং আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ফেলে দিলো। অর্থাৎ উপেক্ষা ও অমান্য করলো। তাদের এই উপেক্ষা ও অমান্যতার শিকার হলো তাদের কাছে বিদ্যমান পূর্বতন কেতাবও, যাতে নতুন নবীর সুসংবাদ রয়েছে, আর নতুন নবীর কাছে আগত নতুন কেতাবও।

আয়াতটির ভেতরে একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য লক্ষণীয়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, যারা কেতাবপ্রাপ্ত হয়েছে তারাই আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ফেলে দিলো। অর্থাৎ তারা যদি অজ্ঞ মোশরেক হতো, যারা কখনো কোনো কেতাব পায়নি, তাহলে তারা আল্লাহর কেতাবকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করলে তা বোধগম্য হতো। অথচ তারা কেতাবপ্রাপ্ত জাতি। আল্লাহর রসূলরাও তাদের সম্পর্কে অবহিত। হেদায়াত ও জ্যোতির সাথে তাদের যোগাযোগ ছিলো। তা সত্ত্বেও তারা কি করলো? তারা আল্লাহর কেতাবকে অবজ্ঞা করলো। তাকে অমান্য করলো ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করলো। তাকে তারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের ময়দান থেকে নির্বাসিত করলো। 'আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই বাক্যটি তাদের আচরণকে একটি চরম বে-আদবী, কৃতঘ্নতা, প্রত্যাখ্যান, নির্বুদ্ধিতা, গোয়ার্তুমি ও ধৃষ্টতা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এর বর্ণনাভংগী এমন শাণিত ও বৈচিত্রময় যে, তা একটি কল্পনার বিষয়কে বাস্তবের জগতে এনে তুলে ধরেছে কল্পনা শক্তি ও উপলব্ধি করতে পারে এ কাজটি কত হিংস্র।

ইহুদীদের মাঝে যাদু প্রীতি

এরপর তাদের নিজেদের কেতাবকে সমর্থনকারী আসমানী কেতাবকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের কী লাভ হয়েছে? তারা কি এর চেয়ে মহৎ ও উৎকৃষ্ট কিছুর সন্ধান পেয়েছে? কোন সন্দেহাতীত অকাট্য সত্যের কাছে কি তারা আশ্রয় নিতে পেরেছে, কোরআন তাদের যে কেতাবের সমর্থক হয়ে এসেছে, সেই কেতাবকে কি তারা আঁকড়ে ধরেছে? কখনো নয়। এর একটিও তাদের কপালে জোটেনি। আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তারা এমন ভিত্তিহীন অলীক কুসংস্কারের পেছনে ছুটে চলেছে, যার সাথে শাশ্বত সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ তারা তাদের কেতাবের সমর্থনকারী আল্লাহর নাযিল করা কেতাবকে ত্যাগ করে। শয়তানেরা হযরত সোলায়মানের শাসনকাল সম্পর্কে যে সব অলীক কিচ্ছা কাহিনী শুনাতো এবং যে সব মনগড়া মিথ্যা গুজব রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো সেগুলোরই অনুসরণ করতো। তারা বলতো, হযরত সোলায়মান একজন যাদুকর ছিলেন

এবং তিনি নিজের শেখা সেই যাদুমন্ত্রের বলেই প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসকে নিজের বশীভূত ও অনুগত করে নিয়েছিলেন।

অথচ কোরআন এ গুজবকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে, তিনি যাদুকর ছিলেন না। কোরআন বলছে, 'সোলায়মান কুফরীতে লিপ্ত হয়নি।' অর্থাৎ কোরআন যাদুকে কুফরী গণ্য করছে এবং এ জিনিস আয়ত্ত করা ও ব্যবহার করা কোরআনের মতে সোলায়মানের কাজ নয় বরং শয়তানের কাজ।

'শয়তানরাই কুফরতে লিপ্ত হয়েছিলো, তারা মানুষকে যাদু শেখাতো।'

কোরআন এ গুজবও অস্বীকার করছে যে, বাবেল নগরীতে বসবাসকারী দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যাদুমন্ত্র নাযিল করা হয়েছিলো।

'বাবেল নগরীতে হারূত ও মারূত ফেরেতাদ্বয়ের ওপর তো (যাদুমন্ত্র) নাযিল করা হয়নি।'

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই দুই ফেরেশতা সম্পর্কে কোনো কিংবদন্তীর গল্প প্রচলিত ছিলো। ইহুদীরা বা শয়তানরা এ কথা রটনা করতো যে, তারা উভয়ে যাদু জানতেন ও তা জনগণকে শেখাতেন এবং প্রচার করতেন যে, তাদের ওপর যাদু নাযিল হয়েছে। কোরআন এই গুজবকেও অস্বীকার করেছে যে, তাদের ওপর যাদু নাযিল করা হয়েছিলো। কোরআন এখানে আসল ঘটনা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এই ফেরেশতাদ্বয়কে সেখানে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। কেন এটা করা হয়েছে তার কারণ অজ্ঞাত। তারা মূলত যাদু শেখানোর জন্যে নয় বরং তা থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্যেই সেখানে গিয়েছিলেন। তাই যখনই কেউ তাদের কাছে যাদু শেখার আবদার করতে যেত, তাকে তারা এই বলে নিরুৎসাহিত করতেন যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, তুমি কুফরী করো না।'

এখানে আরেকবার দেখতে পাই যে, কোরআন যাদুকে এবং যাদু শেখানো ও তার ব্যবহারকে কুফরী বলে ঘোষণা করছে। আর এ কথা হারূত ও মারূত নামক দুই ফেরেশতার মুখ দিয়ে বলিয়েছে। কিছু লোক তাদের কাছ থেকে যাদু শিখতে চাইতো যদিও তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন ও সতর্ক করতেন। এভাবে তাদের সতর্কতাকে উপেক্ষা করে কিছু লোক যাদু শিখে সমাজের কিছু লোকের বিপর্যয়ের কারণ ঘটাতো। আল্লাহ তায়ালা একথাই বলছেন! 'অতপর তারা তাদের উভয়ের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখতো যা দিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাতো।' এই অকল্যাণ ও অশুভ জিনিসটা থেকেই ফেরেশতারা তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। এখানে কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামের এই মূলনীতিটা তুলে ধরছে যে, এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না! 'তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ক্ষতি করতে পারতো না।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও উপাদান দ্বারা যা কিছুই সংঘটিত ও সম্পাদিত হয় এবং যে ফলাফলই প্রকাশিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই হয়। এটি ইসলামের এমন একটি মৌলিক বিষয়, যা প্রত্যেক মোমেনের সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেয়া জরুরী। এখানে সবচেয়ে সহজবোধ্য একটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, আপনি আগুনে হাত দিলে তা পুড়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু এই পুড়ে যাওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া সম্পন্ন হবে না। আল্লাহই আগুনের মধ্যে পোড়ানোর যোগ্যতা এবং আপনার হাতের মধ্যে পোড়ার অবস্থা নিহিত রেখেছেন। তবে কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করলে এই যোগ্যতাকে তিনি নিষ্ক্রীয় করে দিতে সক্ষম, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ক্ষেত্রে তিনি আগুনকে নিষ্ক্রীয় করে দিয়েছিলেন। স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটানো যাদুমন্ত্রের ব্যাপারটাও তদ্রূপ।

এই বিচ্ছেদ এমন একটি প্রতিক্রিয়া যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে যাদুর ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। আবার কখনো তিনি তাকে নিষ্ক্রীয় ও অচলও করে দিতে পারেন, যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তেমনটি তিনি চান। বাদ বাকী অন্যান্য যেসব জিনিস সম্পর্কে আমরা জানি যে, একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের কারণ ও ফল, সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য যে, প্রত্যেক জিনিসের যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও ফল, সেটা আল্লাহরই সৃষ্টি করা জিনিস। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছাতেই এই ফল বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন সেই ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া বন্ধও করে দিতে পারেন।

এরপর কোরআন তাদের শেখা সেই যাদুমন্ত্রের প্রকৃতি বর্ণনা করছে যে, তাদের জন্যে ক্ষতিকর উপকারী নয়,

'তারা এমন জিনিস শেখে যা তাদের ক্ষতি সাধন করে কোনোই উপকার করে না।'

আর এই অশুভ ও অকল্যাণকর জিনিসটাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করাই এ কথা বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট যে, যাদুমন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর, তাতে আদৌ কোনো উপকারিতা নেই।

'তারা জানতো যে, যে ব্যক্তি এটা খরিদ করে তার জন্যে আখেরাতে কোনো পাওনা নেই।'

'অর্থাৎ আখেরাতে সে নিরেট হতভাগা, সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ও দেউলে হয়ে যাবে। এই বেচাকেনার প্রকৃত তাৎপর্য যদি তারা জানতো তাহলে দেখতে পেতো– যে যাদুমন্ত্রের বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, তা কত খারাপ জিনিস! বলা হয়েছে, 'তারা যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতো, তবে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান পাওয়া যেতো, তা যে কতো উত্তম, তা যদি তারা জানতো।' (আয়াত ১০৩)

আল্লাহ তায়ালার এই উক্তি বাবেলের উক্ত ফেরেশত দ্বয়ের কাছ থেকে যারা যাদু শিখতো এবং যারা সোলায়মানের রাজত্ব সম্পর্কে গাজাখুরী গল্প রটনা করতো, তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর তারা যে ইহুদী জাতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তারাই আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ছুড়ে ফেলতো অর্থাৎ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করতো এবং ভয়ংকর অকল্যাণকর এই বাতিল জাদু বিদ্যার ভক্ত ছিলো।

যাদু প্রসংগে আরো কিছু কথা

প্রসংগত, এখানে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন, এর দ্বারা ইহুদীরা স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাতো, যার তারা ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলো এবং যার জন্যে তারা আল্লাহর কেতাবকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতো।

সকল যুগেই দেখা যায় যে, কিছু লোক এমন কিছু রহস্যময় বিদ্যা বা যোগ্যতার অধিকারী হয়, যার কোনো কূল কিনারা বিজ্ঞান এখনো করতে পারেনি। এ সব রহস্যময় বিদ্যার মধ্যে কোনো কোনটার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে বটে। তবে তার নিগূঢ় রহস্য ও নির্দিষ্ট প্রয়োগ প্রণালী আজও জানা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ টেলিপ্যাথির কথাই ধরা যাক। দূর থেকে একাধিক ব্যক্তির মানসিক ভাব বিনিময়কে টেলিপ্যাথি বলা হয়। কিন্তু সেটা কি জিনিস? কিভাবেই বা তা ঘটে? কিভাবে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এত দূরবর্তী স্থান থেকে কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়া ডাকতে বা কিছু বলতে পারে, যা মানুষের স্বাভাবিক আওয়ায বা দৃষ্টিসীমার বাইরে! আর এই হিপনোটিজম বা সম্মোহন বিদ্যাটিই বা কি জিনিস? কিভাবেই তা কাজ করে। একজনের ইচ্ছা আরেক জনের ইচ্ছার ওপর কিভাবে কর্তৃত্বশীল হয় ও তাতে প্রধান্য বিস্তার করে? কিভাবে একজনের চিন্তা আর একজনের চিন্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং সেই সংযোগের সূত্র ধরে

নিজের মনের কথা তার মনে ঢুকিয়ে দেয়? আর কিভাবেই বা একজন অপরের কাছ থেকে কোনো কথা বা ভাব এমনভাবে গ্রহণ করে যেন একটা উন্মুক্ত বই থেকে সে পড়ছে?

বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত তার স্বীকৃত এসব শক্তি সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বক্তব্য দিতে সমর্থ হয়েছে যে, এক একটা শক্তির এক একটা নাম সে দিয়েছে। কিন্তু সে কখনো এ কথা বলতে পারেনি অমুক জিনিসটা আসলে কী এবং তা কিভাবে ঘটে বা অস্তিত্ব লাভ করে।

এ ছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে বিজ্ঞান এখনো বিতর্কে লিপ্ত। এর কারণ এটা হতে পারে যে, সে ওগুলো সম্পর্কে সে এখনো যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করে সারতে পারেনি কিংবা ওসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় এমন কোনো উপায়ের সন্ধান সে এখনো পায়নি। ভবিষ্যতের পূর্বাভাসদানকারী স্বপ্নের কথাই ধরা যাক। ফ্রয়েড তো অতীন্দ্রীয় ও আধ্যাত্মিক কোনো বিষয়কে মানতো চাইতো না। তবুও সে এ জিনিসটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। একজন মানুষ ভবিষ্যতের একটা অজানা ব্যাপার স্বপ্নে দেখে এবং তার কিছুকাল পর সত্যি সত্যি তাই ঘটে যায়। এটা কিভাবে হয়? কিছু গোপন অনুভূতি সময় সময় মানুষের মনে ভীড় জমায়, আজও সে সবের কোন সুনির্দিষ্ট নামকরণ করা হয়নি। কিভাবে একজন মানুষ অনুভব করে যে, কিছুক্ষণ পরে একটা ঘটনা ঘটবে বা কোন ব্যক্তির আগমন আসন্ন? তারপর সেই প্রত্যাশা বা ধারণা কোনো না কোনোভাবে দেখা যায় সত্যি সত্যি ঘটেই যায়।

মানুষের ব্যক্তি সত্তায় এসব অজানা শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে এ কথা নিছক বিজ্ঞানের কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষায় এখনো প্রমাণিত হয়নি এই অজুহাতে সরাসরি অস্বীকার করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে তার মানে এ নয় যে, যে কোনো কাল্পনিক ব্যাপারকে মেনে নিতে হবে এবং যে কোন কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি সিদ্ধ কল্পকাহিনীকে বিশ্বাস করতে হবে। এ সব অজানা রহস্যের ব্যাপারে মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ ও সতর্ক প্রতিক্রিয়া এটাই হতে পারে যে, সে উদার মনোভাব পোষণ করবে। সরাসরি মেনেও নেবে না, সরাসরি অস্বীকারও করবে না। আজকে যেসব উপকরণ তার হস্তগত, তার সাহয্যে যে সব জিনিসকে সে উপলব্ধি করতে পারছেনা, এমনও হতে পারে যে, সেসব উপকরণ আগামীতে আরো উৎকর্ষ লাভ করলে সে তা উপলব্ধি করতে পারবে। এসব অজানা বিষয়কে সে নিজের আয়ত্তের বাইরের জিনিস বা বিশ্বজগতের আরো অনেক অজানা জিনিসের অন্তর্গত মনে করে নীরবতাও অবলম্বন করতে পারে।

যাদু এ ধরনেরই একটি জিনিস। শয়তান কর্তৃক মানুষকে তা শেখানোর বিষয়টাও তদ্রূপ। এর একটা উপায় এই হতে পারে যে, শয়তান তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার অথবা কোনো বিশেষ চিন্তা বা ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই প্রভাব সে মানুষের অনুভূতিতে বা চিন্তা শক্তিতেও বিস্তার করতে পারে, আবার কোনো বস্তু বা দেহের ব্যাপারেও করতে পারে। আর কোরআনে ফেরাউনের যাদুকরদের দ্বারা সংঘটিত যে যাদুর কথা বলা হয়েছে, যাদু বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে তাই হয়, তবে সেটা নিছক কল্পনা শক্তিকে প্রভাবিত করা বা সম্মোহন জাতীয় একটি প্রক্রিয়া মাত্র। বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কোরআনেই বলা হয়েছে যে, 'তাদের যাদুর প্রভাবে মুসার মনে হচ্ছিলো যেন রশীগুলো দৌড়াচ্ছে।' এ ধরনের প্রভাব বিস্তার দ্বারা স্বামী স্ত্রীতে বা বন্ধুতে বন্ধুতে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করাও সম্ভব। কেননা

প্রভাব বিস্তার করার ফলেই বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। অবশ্য সকল উপায়-উপকরণ ও কার্যকারণেরও কার্যকরিতা চূড়ান্তভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির ওপর নির্ভরশীল, আমি ইতিপূর্বে তা বলেছি।

আবার ফিরে আসা যাক হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রসংগে। তারা কারা এবং কখন তারা বাবেলে গিয়েছিলেন? এ ব্যাপারে যে কথাটা নিসন্দেহে বলা যায় তা এই যে, এ কাহিনীটা ইহুদীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলো। এর প্রমাণ হলো, কোরআনে প্রদত্ত এই বর্ণনায় তারা কোনো আপত্তি তোলেনি বা অস্বীকার করেনি। যে সব ঘটনা শ্রোতাদের জানা থাকতো, সেগুলো সম্পর্কে কোরআন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতো। কেননা উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট ছিলো। এর চেয়ে বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলোনা। কারণ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া কোরআনের উদ্দেশ্য নয়। এই দুই ফেরেশতা সম্পর্কে যেসব কেসসা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সেগুলোর বিবরণ দেয়া আমার মনোপুত নয়। কেননা সেগুলোকে সমর্থন করে এমন একটিও বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

মানব জাতির পরীক্ষার জন্যে তার ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সেই যুগ ও ইতিহাসের সেই পর্যায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ ও তৎকালীন মানুষের অনুধাবনযোগ্য বিভিন্ন রকমের অলৌকিক ও পরীক্ষামূলক ঘটনাবলী ঘটেছে। এ উদ্দেশ্যে দুইজন ফেরেশতা অথবা ফেরেশতার মত পুণ্যবান দু'জন মানুষের আবির্ভাব ঘটানো যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে সেটা মোটেই বিরল ও বিচিত্র কিছু নয়। বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের রাজপথ ধরে মানব জাতি যখন ক্রমান্বয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে, তখন তার এই পথ পরিক্রমায় এ জাতীয় ঘটনাবলী ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে যে সুস্পষ্ট ও অকাট্য শিক্ষা পাওয়া যায় আমাদের সেটাই যথেষ্ট মনে করা উচিত। সেই ঘটনার সুদীর্ঘকাল পরে আজকের যুগে আমরা যে পরিবেশে আছি, তার সাথে মিলিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এ আয়াতের কিছু অংশ আদতেই 'মোতাশাবেহ' অর্থাৎ দুর্বোধ্য শ্রেণীভুক্ত। এ বিবরণ থেকে আমাদের শুধু এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহর অকাট্য ও সুনিশ্চিত কেতাব নিজেদের কাছে থাকতে অলীক কল্প-কাহিনীর পেছনে ছুটতে গিয়ে বনী ইসরাঈল জাতি গোমরাহীর কী অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছিলো। এ বিবরণ থেকে আমাদের জন্যে এটুকু শিক্ষা গ্রহণই যথেষ্ট যে, যাদু বিদ্যা পুরোপুরি একটা শয়তানী বিদ্যা তাই এটা সুস্পষ্ট কুফরী। এই কুফরীতে লিপ্ত হলে মানুষের পরকালের সকল কল্যাণ বিনষ্ট হতে বাধ্য।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

রুকু ১৩

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ধৃষ্টতার সাথে কখনো) বলো না (হে নবী), 'তুমি আমাদের কথা শোনো', বরং (তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে) বলো (হে নবী),'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো'। তোমরা সর্বদা তার কথা শুনবে (মনে রাখবে), যারা (তার কথা) অমান্য করে তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ১০৫. (আসলে) এই আহলে কেতাব কিংবা যারা আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য শেরেক করে তারা কেউই এটা পছন্দ করে না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের মতো) কোনো ভালো কিছু নাযিল হোক, কিন্তু (তারা জানে না,) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর অনুগ্রহে বিশেষভাবে বেছে নেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ১০৬. আমি যখন কোনো আয়াত বাতিল করে দেই বা (বিশেষ কারণে মানুষদের) তা ভুলিয়ে দিতে চাই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মতো কোনো আয়াত এনে হাযির করি, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। ১০৭. তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও। ১০৮. তোমরা কি তোমাদের নবীর কাছে সে ধরনের (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে চাও– যেমনি তোমাদের আগে মূসাকে করা হয়েছিলো; কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, অবশ্যই সে ব্যক্তি সোজা পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا

مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ

اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن

كَانَ هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

صٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ص

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى

عَلٰى شَيْءٍ ص وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَهُمْ يَتْلُونَ

الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ

১০৯. আহলে কেতাবদের অনেকেই বিদ্বেষের কারণে চাইবে তোমাদের ঈমানের বদলে আবার সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে, (এমনকি) সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এপথ থেকে বিরত হবে না), অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। ১১০. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে তাঁর কাছে (এর সবই) তোমরা (মজুদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান। ১১১. তারা বলে, ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া আর কেউই বেহেশতে যাবে না, (আসলে) এটা হচ্ছে তাদের একটা মিথ্যা কল্পনা; তুমি (হে নবী,) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলিল প্রমাণ নিয়ে এসো! ১১২. (তবে হ্যাঁ,) যে কোনো ব্যক্তিই (আল্লাহর সামনে) নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে এবং সে হবে অবশ্যই একজন নেককার মানুষ, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় রয়েছে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তান্বিতও হবে!

রুকু ১৪

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃস্টানরা (সত্য জাতির) কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, খৃস্টানরা বলে ইহুদীরা কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ এরা (উভয়েই আল্লাহর) কেতাব পাঠ করে, আদৌ আল্লাহর কেতাবের কোনো কিছুই জানে না এমন লোকেরা (আবার

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ

مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ۭ اُولٰۗئِكَ مَا كَانَ

لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۗئِفِيْنَ ڛ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى

الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۤ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ

وَجْهُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ

بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ۭ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۭ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۭ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

এদের উভয়ের সম্পর্কে) তাদের কথার মতো একই ধরনের কথা বলে, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন। ১১৪. সে ব্যক্তির চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘর) মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তার ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হয়, এ ধরনের লোকদের (বস্তুত) তাতে ঢোকার কোনো যোগ্যতাই নেই, তবে একান্ত ভীত সন্ত্রস্তভাবে (ঢুকলে তা ভিন্ন কথা), তাদের জন্যে পৃথিবীতে যেমন অপমান লাঞ্ছনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরকালে কঠিনতম শাস্তি। ১১৫. (এরা কেবলা বদলের ব্যাপারেও মতবিরোধ করেছিলো, অথচ) পূর্ব পশ্চিম সবই তো আল্লাহ তায়ালার, (তাছাড়া) তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই তো আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী এবং জ্ঞানী। ১১৬. (খৃস্টান) লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে) নিজের সন্তান (-রূপে) গ্রহণ করেছেন, পবিত্রতা একান্তভাবে তাঁর, (তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে); আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই তাঁর জন্যে, এর প্রতিটি বস্তুই তাঁর একান্ত অনুগত। ১১৭. আসমানসমূহ ও যমীনের তিনিই স্রষ্টা, যখন তিনি কোনো একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, সে ব্যাপারে শুধু (এটুকুই) বলেন 'হও', আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। ১১৮. যারা (সঠিক কথা) জানে না তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, অথবা এমন কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে কেন পাঠান না (যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে দেখতে পারবো); এদের আগের লোকেরাও এদের মতো করেই কথা বলতো; এদের সবার মন (আসলে) একই ধরনের; (আল্লাহকে) যারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে দিয়েছি।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১১৯. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ পাঠিয়েছি, পাঠিয়েছি আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো), তোমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের (দায় দায়িত্বের) ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না। ১২০. ইহুদী ও খৃস্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, হাঁ, তুমি যদি (কখনো) তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করো (তখনই এরা খুশী হবে), তুমি তাদের বলে দাও, আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতই হচ্ছে একমাত্র পথ; (সাবধান,) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তুমি কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২১. আহলে কেতাবদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এ (কোরআন)-কে যেভাবে (নিষ্ঠার সাথে) পড়া দরকার সেভাবেই পড়ে; তারা তার ওপর ঈমানও আনে; যারা (একে) অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

রুকু ১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সে নেয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি, (সে নেয়ামতের অংশ হিসেবে) আমি তোমাদের দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ১২৩. তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন একজন মানুষ আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, (সেদিন) তার কাছ থেকে কোনোরকম বিনিময়ও নেয়া হবে না, আবার (একের পক্ষে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবে না, (সেদিন) এসব লোকেরা কোনোরকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ

وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ

إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

১২৪. (আরো স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কতিপয় বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন, অতপর তা পুরোপুরি সে পুরন করলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নেতা বানাতে চাই; সে বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে)? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি যালেমদের কাছে পৌঁছবে না। ১২৫. (স্মরণ করো,) আমি যখন মানুষদের মিলনস্থল ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (এ কাবা) ঘরটি নির্মাণ করেছিলাম; (আমি তাদের আদেশ দিয়েছিলাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো; আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘর (কাবা)-কে (হজ্জ ও ওমরার) তাওয়াফকারীদের জন্যে, আল্লাহর এবাদাতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে, (সর্বোপরি তাঁর নামে) রুকু সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে। ১২৬. ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে মালিক, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে আহারের যোগান দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপায় উপকরণ সরবরাহ করতে থাকবো, অতপর অচিরেই আমি তাদের আগুনের আযাব ভোগ করতে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান। ১২৭. ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাচ্ছিলো (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো), হে আমাদের মালিক, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল করো, একমাত্র তুমিই সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

১২৮. (তারা আরো বললো,) হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কে তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে মালিক,) তুমি আমাদের (তোমার এবাদাতের) আনুষ্ঠানিকতাসমূহ দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, কারণ অবশ্যই তুমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের মালিক, তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি (এমন) একজন রসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের তোমার কেতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে, উপরন্তু সে তাদের পবিত্র করে দেবে (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দোয়া কবুল করো); কারণ তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

রুকু ১৬

১৩০. (জেনে বুঝে) যে নিজেকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে, যে ইবরাহীমের (আনীত) জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অথচ তাকে আমি দুনিয়ায় নবুওতের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছি, শেষ বিচারের দিনেও সে (আমার) নেক লোকদের মধ্যে শামিল হবে। ১৩১. যখন আমি তাকে বললাম, তুমি (আমার অনুগত) মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম। ১৩২. (যে পথ ইবরাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো,) সে পথে চলার জন্যে সে তার সন্তান সন্ততিকেও ওসিয়ত করে গেলো, ইয়াকুবও (তার সন্তানদের ওসিয়ত করে বললো); হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এই দ্বীন (ইসলাম) মনোনীত করে দিয়েছেন, অতএব কোনো অবস্থায়ই এ (জীবন) বিধানের আনুগত্য স্বীকার ব্যতিরেকে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ

مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا

أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ

النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

১৩৩. (হে ইহুদী জাতি,) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে (তার) মৃত্যু এসে হাযির হলো এবং সে যখন তার ছেলেমেয়েদের বললো (বলো), আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদাত করবে? তারা বললো, আমরা (অবশ্যই) তোমার মাবুদ- (তোমার পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবুদের এবাদাত করবো, (এ) মাবুদ হচ্ছেন একক, আমরা তাঁর আত্মসমর্পণকারী বান্দা হয়েই থাকবো। ১৩৪. এরা ছিলো এক (ধরনের) জাতি, যারা (আজ) গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের নিজেদের জন্যে, (আবার) তোমরা যা করবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের (কিছু) জিজ্ঞেস করা হবে না। ১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে; (হে নবী,) তুমি বলো, (আমাদের কাছে তো) বরং ইবরাহীমের একনিষ্ঠ মতাদর্শই রয়েছে; আর সে কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ১৩৬. তোমরা বলো, আমরা তো আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর, (আমাদের আগে) ইবরাহীম, ইসমাঈল ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের (পরবর্তী) সন্তানদের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাও (আমরা মানি, তাছাড়া), মূসা, ঈসা সহ সব নবীকে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও আমরা ঈমান এনেছি, আমরা এদের কারো মধ্যেই কোনো তারতম্য করি না, আমরা তো হচ্ছি আল্লাহরই অনুগত (বান্দা)।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ
تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৩৭. আর এরা যদি তোমাদের মতোই আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো তাহলে তারাও সঠিক পথ পেতো, তারা যদি (সে পথ থেকে) ফিরে আসে তাহলে তারা অবশ্যই (উপদলীয়) অনৈক্যের মাঝে পড়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট (প্রমানিত) হবেন, তিনিই শোনেন, তিনিই জানেন। ১৩৮. (হে নবী, তাদের তুমি) বলো, আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তায়ালারই, এমন কে আছে যার রং তাঁর রঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে? (আমরা ঘোষণা করছি,) আমরা তাঁরই এবাদাত করি। ১৩৯. (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি (যেমন) আমাদের মালিক, (তেমনি) তিনি তোমাদেরও মালিক, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে, আমরা সবাই তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। ১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃষ্টান? (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জানো না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে মজুদ আল্লাহর কাছ থেকে (আগত) সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তাহলে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই গাফেল নন। ১৪১. এরাও ছিলো এক (ধরনের) সম্প্রদায়, যারা (আজ) গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের জন্যে, আর তোমাদের কর্মফল হবে তোমাদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

তাফসীর

আয়াত ১০৪-১৪১

এ আয়াতগুলোতে ইহুদীদের দুরভিসন্ধি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাদের কুটিল চক্রান্ত থেকে তাদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিহিত বিদ্বেষ ও আক্রোশ থেকে, দিবারাত্র তাদের মুসলিম বিরোধী ফন্দিফিকির ও তাদের ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানদেরকে কথায় কিংবা কাজে শেষ নবীর (স.) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী এসব ইহুদী ও খৃস্টানদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইহুদীদের মুসলিম বিদ্বেষী ও ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সর্বোপরি মুসলিম সমাজের ভেতরে বিবাদ বিসম্বাদ ও কোন্দল সৃষ্টির জন্যে তাদের প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র পাকানোর পেছনে আসল কারণ কী, তাও এ আয়াতগুলোতে উন্মোচন করা হয়েছে।

মুসলিম উম্মার নতুন প্রজন্মের প্রয়োজন অনুসারে এবং তাদের সমকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশের তাগিদে যখন শরীয়তের কিছু কিছু নির্দেশ রহিত করা হলো, তখন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতে লাগলো। এসব নির্দেশের উৎস সম্পর্কে তারা তাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেবার প্রয়াস চালাতে লাগলো। তারা মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, এসব নির্দেশ যদি আল্লাহর কাছ থেকে আসতো, তাহলে তা রহিত হতো না এবং আগের বিধি পরিবর্তন বা বাতিল করে নতুন বিধি জারী করা হতো না।

কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে এ ক্ষেত্রে তারা একটা বিশেষ অজুহাত হিসাবে কাজে লাগালো। হিজরতের ষোল মাস পরে যখন বাইতুল মাকদেসের পরিবর্তে পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান জারী হলো, তখন তাদের সেই প্রচারণা অভিযান আরো জোরদার হলো। বাইতুল মাকদেস আহলে কেতাবের (ইহুদী ও খৃস্টানদের) কেবলা ছিলো। রসূল (স.) হিজরতের পর মক্কার মত এই কেবলা অভিমুখে নামায পড়তে থাকেন। তাই সেটাকে তারা এই মর্মে একটা প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরতে থাকে যে, তাদের ধর্মই হলো আসল ধর্ম এবং তাদের কেবলাই সঠিক কেবলা। ইহুদীদের এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দেখে রসূল (স.) মনে মনে বাইতুল মাকদেস থেকে আল্লাহর মহাসম্মানিত ঘর কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তা কারো কাছে বললেন না। এই বাসনা তার মনে ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তার মনোপুত, কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার আদেশ দেন। সূরার পরবর্তী অংশে যথাস্থানে এ বিষয়ের বর্ণনা আসছে। এই কেবলা বদলের আদেশ দ্বারা যেহেতু বনী ইসরাইলের উল্লিখিত যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হচ্ছিল, তাই কেবলা পরিবর্তনটা তাদের কাছে অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এমন মোক্ষম যুক্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তাই শেষ পর্যন্ত তারা এই পরিবর্তনকে উপলক্ষ করে মুসলমানদের মধ্যে এক বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারণা চালানো শুরু করে দিল। যে উৎস থেকে রসূল (স.)-এর কাছে বিভিন্ন নির্দেশ আসে তার বৈধতা এবং যে প্রক্রিয়ায় তিনি এসব আদেশকে ওহি থেকে গ্রহণ করেন তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির জন্যে তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। অর্থাৎ মুসলিম গণমানসে নিহিত ইসলামী আকীদা

বিশ্বাসের ভিত্তিমূলেই তারা কুড়াল চালাতে উদ্যত হলো। তারা বলতে লাগলো, বাইতুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়া যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তো তোমাদের এতদিনের নামায ও যাবতীয় এবাদাত নষ্ট হয়ে গেছে। আর যদি বাইতুল মাকদেসের দিকে নামায পড়া শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা রহিত করার কারণ কী? এর মানে দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর কাছ থেকে অর্জিত ও সঞ্চিত পুণ্যকর্মের পুঁজি এবং সর্বোপরি মোহাম্মাদ (স.)-এর নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে ভরসা ও আস্থা ছিলো, তার ওপর তারা কুঠারাঘাত করতে লাগলো।

এই ন্যক্কারজনক ও ঘৃণ্য প্রচারাভিযানের কিছু অশুভ প্রতিক্রিয়া কোন কোন মুসলমানের মনে দেখা দিয়েছিলো বলে মনে হয়। তাই তারা গভীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সহকারে রসূল (স.)-কে এ সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো এবং তার কাছে এ আদেশের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ চাইতে লাগলো। অথচ নবীর নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য থাকলে এবং ইসলামী আকীদার উৎসের প্রতি অটল আস্থা থাকলে এই জিজ্ঞাসা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হতেই পারে না। তাই কোরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়ে মুসলমানদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, যে সূক্ষ্ম জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে সর্বাধিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নির্বাচন করেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী তা জ্ঞাত হন, সেই নির্ভুল ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অনুসারেই তিনি কিছু আদেশ ও আয়াতকে রহিত করে থাকেন। কোরআন এই সাথে তাদেরকে এই মর্মেও সতর্ক করে দেয় যে, ইহুদীদের মূল লক্ষ্য মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার একেবারে কাফের বানিয়ে ফেলা। এর একমাত্র কারণ আল্লাহ তায়ালা কেন ইহুদীদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে শেষ নবী, শেষ কেতাব, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান এবং বিশ্ব পরিচালনার এই মহান দায়িত্ব দিয়ে ভূষিত করলেন–সে জন্যেই তাদের যাবতীয় ঈর্ষাবোধ। আর ইহুদীদের এসব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারণার মূলে কি গোপন অসদুদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তাও এখানে উন্মোচন করা হয়েছে। এখানে ইহুদীদের এই দাবীও খন্ডন করা হয়েছে যে, বেহেস্ত একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য এবং ইহুদী ও খৃস্টান এই উভয় গোষ্ঠী কিভাবে পরস্পরকে বলতো যে, তাদের ধর্ম কোন ধর্মই নয়। অনুরূপভাবে মোশারেকরাও সকল ধর্মাবলম্বীকেই বলতো যে, আসল ধর্ম তাদের কাছেই রয়েছে, অন্যদের ধর্ম কোন ধর্ম নয়।

এরপর মুসলমানদের সামনে ইহুদীদের সেই ভয়াবহ দুরভিসন্ধি উন্মোচন করা হয়েছে, যা কেবলা পরিবর্তনের ঘটনার পেছনে তারা লুকিয়ে রেখেছিলো। ইহুদীদের সেই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ঘর ও প্রথম কেবলা কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া থেকে বিরত রাখা, আর এটি মসজিদে আল্লাহর নাম উচ্চারণ বন্ধ করা ও তাকে ধ্বংস করার নামান্তর।

এভাবে আলোচনা করতে গিয়ে কোরআন একপর্যায়ে ইহুদী ও খৃস্টানদের আসল মতলব মুসলমানদের সামনে ফাঁস করে দিয়েছে। সেটি হলো, মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে পুনরায় ইহুদী বা খৃস্টানে পরিণত করা। বলা হয়েছে যে, রসূল (স.) যতক্ষণ তাদের ধর্ম অনুসরণ না করবেন, ততক্ষণ তারা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে না। আর তখন তারা চালাবে কুটিল ষড়যন্ত্র ও চাপিয়ে দেবে যুদ্ধ। এটাই হলো বাতিল ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারণার মূল কারণ, যা আপত, দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় তাদের যুক্তিসমূহের পেছনে এটাই লুকিয়ে আছে।

ইহুদীদের শীষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ

প্রথমে ১০৪ থেকে ১১০ পর্যন্ত এই ছয়টি আয়াত লক্ষ্য করুন। এখানে সর্বপ্রথম 'হে মোমেনরা' বলে তাদের বৈশিষ্টপূর্ণ গুণবাচক নামটি দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ শুধু যে তাদেরকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক করে তা নয় বরং তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সাথে ও তাদের নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। এ সম্বোধন তাদের মনে আদেশ গ্রহণ ও মান্য করার উৎসাহ সৃষ্টি করে দেয়।

এই গুণ বৈশিষ্টের কারণেই মোমেনদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন রসূল (স.) কে কখনো 'রায়েনা' (আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন) না বলে 'উনযুরনা' (আমাদের দিকে দৃষ্টি দিন) বলে। তারপর তাদেরকে রসূলের আদেশ শ্রবণের অর্থাৎ অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং কাফেররা যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে তা থেকে সতর্ক করে।

' হে মোমেনরা! তোমরা 'রায়েনা' বলোনা, 'উনযুরনা' বলো ও শোনো। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।'

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, (রায়েনা' ও 'উনযুরনা' সমার্থক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও) 'রায়েনা' বলতে নিষেধ করার পেছনে একটি গুরুতর কারণ রয়েছে। একশ্রেণীর অসভ্য ও দুশ্চরিত্র ইহুদী রসূল (স.) কে 'রায়েনা' শব্দটা বলার সময় এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতো যে, এটি 'রু'য়ুনাত্' ধাতু থেকে নির্গত একটা খারাপ অর্থবোধক শব্দের মত শোনা যেত। শেষোক্ত এই ধাতু থেকে নির্গত হলে 'রায়েনা' শব্দের অর্থ হয় 'ওহে বোকা' বা 'ওহে হাবা!' তারা রসূল (স.)-কে সরাসরি মুখের ওপর গাল দিতে ভয় পেতো। তাই এ রকম বিকৃত ও সুচতুর পন্থায় গাল দেয়ার ফন্দি উদ্ভাবন করতো। ইহুদীদের অল্প বয়স্ক বখাটেরাই এরূপ করতো। তাই মোমেনদেরকে এ শব্দটিই ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এটা ইহুদীরা ব্যবহার করতো। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে এর সমার্থক এমন একটি শব্দ ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, যা দুশ্চরিত্র লোকেরা বিকৃত করতে পারবে না এবং ইহুদীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পন্ড হয়ে যাবে।

ইহুদীদের এরূপ নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন থেকে বুঝা যায় রসূল (স.)-এর প্রতি তাদের অন্তরে কি সাংঘাতিক আক্রোশ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলতো, তারা কেমন জঘন্য বেআদব ও দুরাচার ছিলো এবং তার সাথে তাদের আচরণ কত ইতরামি ও কুরুচিপূর্ণ ছিলো। আর এই নিষেধাজ্ঞা থেকে অনুমান করা যায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী (স.) ও মুসলিম জামায়াতকে এবং নিজের প্রত্যেক বন্ধুকে তার শত্রুদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কত যত্নবান ছিলেন।

এরপর '১০৫ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে ইহুদীদের অন্তরে লালিত ঘোরতর শত্রুতা ও দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তাদের মনে যে হিংসা ও বিদ্বেষ লুকিয়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করার কারণে তাও অবহিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরা যেন তাদের শত্রুদের থেকে সাবধান হয়, যে ঈমানের জন্যে তারা ইহুদীদের বিদ্বেষের শিকার হয়েছে, তা যেন তারা আঁকড়ে ধরে রাখে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহকে যেন সংরক্ষণ ও তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আহলে কেতাব ও মোশারেকদের মধ্য থেকে যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা এটা পছন্দ করে না যে, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর ভালো কিছু নাযিল হোক। আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহকে যার নামে ইচ্ছা বরাদ্দ করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সুমহান অনুগ্রহকারী।' (আয়াত ১০৫)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কোরআন আহলে কেতাব ও মোশরেকদেরকে সমভাবে কুফরীর দায়ে অভিযুক্ত করেছে। তারা শেষ নবীর নবুওয়তকে অস্বীকার করার কাজে সমান অংশীদার। এদিক থেকে তারা সমান। উভয়ের মনে মোমেনদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিহিত এবং কেউই তাদের জন্যে কল্যাণ কামনা করে না। আর মুসলমানদের যে জিনিসটাকে তারা সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করে তা হলো তাদের এই নতুন বিধানটি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই কল্যাণকর ও মহোপকারী ধর্ম কেন দিলেন, কেন তাদের ওপর কোরআন নাযিল করলেন, কেন তাদেরকে এই মহান নেয়ামতে ভূষিত করলেন, কেন তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন, যার চেয়ে বড় ও মর্যাদাবান দায়িত্ব পৃথিবীতে আর নেই।

আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজের অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করতে পারেন এই বিষয়টাই ইহুদীরা তাদের ঈর্ষা ও আক্রোশের বশে সহ্য করতে পারে না। এমনকি তাদের এই ঈর্ষা ও আক্রোশ এত দূর গড়িয়েছে তারা জিবরাঈল (আ.)-এর বিরুদ্ধেও নিজেদের শত্রুতার কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। কারণ তিনি রসূল (স.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

'আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহ যার ইচ্ছা করেন বরাদ্দ করেন।'

কেননা রেসালাতের মত অনুগ্রহ কোথায় নাযিল করা উচিত, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এটাকে তিনি যখন মোহাম্মদ (স.)-এর জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদেরকে তার সেবক হওয়ার গৌরবে ভূষিত করেছেন তখন বুঝতে হবে যে, তাদেরকে তিনি এ দায়িত্বের যোগ্য বলেই জানতেন।

'আল্লাহ তায়ালা মহান অনুগ্রহের মালিক।'

বস্তুত, নবুওত রেসালাত এবং ঈমান ও ঈমানের দাওয়াতের চেয়ে বড় নেয়াতম আর নেই, এই ইংগিতটি মোমেনদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, তারা যে ইসলাম ও ঈমানের নেয়ামত লাভ করেছেন তা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আর এর আগের আয়াতে জানানো হয়েছে কাফেররা মোমেনদের বিরুদ্ধে কিরূপ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং মোমেনদের উচিত তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা। উক্ত সতর্কতার অনুভূতি আর এ আয়াতে বর্ণিত অনুভূতি এই উভয় অনুভূতি ইহুদীদের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচারাভিযান রুখে দাঁড়ানোর জন্যে জরুরী। কেননা তারা মোমেনদের বিশ্বাস দুর্বল করে দিতে চায়। এই বিশ্বাস বা ঈমানই হলো সেই মহোত্তম সম্পদ, যার জন্যে তারা মুসলমানদেরকে হিংসা করে থাকে ।

'নাসেখ' 'মানসুখ' সম্পর্কে কোরআনের ব্যখ্যা

আগেই বলেছি যে, এই প্রচারাভিযানে ইহুদীদের মেতে ওঠার উপলক্ষ ছিলো কতিপয় আদেশ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রহিত করন। বিশেষত, কেবলা পরিবর্তনের বেলায় যা মুসলমানদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিকে ভন্ডুল করে দিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন,

'আমি যখনই কোন আয়াত বাতিল করি বা ভুলিয়ে দেই, তখনই তার চেয়ে ভালো অথবা তদ্রূপ আরেকটা আয়াত নিয়ে আসি।'

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষটি কেবলা পরিবর্তনই হোক–যেমন এই সূরার পরবর্তী অংশের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় অথবা অন্য কোন ঘটনা হোক, যেমন কোন কোন আইন বা বিধিকে সংশোধন করা যা মুসলিম সমাজের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল প্রয়োজন ও অবস্থার

তাগিদে আবশ্যক হয়ে উঠেছিলো, অথবা তাওরাতের কিছু নির্দেশকে কোরআন দ্বারা সংশোধন করার ঘটনা হোক যা তাওরাতকে সাধারণভাবে সমর্থন দেয়া সত্ত্বেও করা জরুরী হয়ে পড়ে ছিলো। এ সব যেটাই হোক না কেন বা এর সবকটাই হোক ইহুদীরা একে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের মূল উৎস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির কাজে ছুতা হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এই রহিত করা বা সংশোধন করার বিষয়টি সম্পর্কে এখানে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে ইহুদীদের সৃষ্টি করা সন্দেহের দাঁতভাংগা জবাব দিয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে ভন্ডুল করে দিয়েছে।

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে যে কোন খুঁটিনাটি পরিবর্তন ও সংশোধন করা হোক না কেন, তা মানবতার কল্যাণের জন্যেই করা হয়েছে এবং মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা একদিকে যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা অপর দিকে তেমনি কোরআন নাযিলকারীও এবং রসূল প্রেরণকারীও। কাজেই কখন কোন পরিবর্তন প্রয়োজন তা তিনিই নির্ধারণ করবেন। তাই যখন তিনি কোন আয়াতকে রহিত করেন, তখন তাকে বিস্মৃত করে দেন। সে আয়াত শরীয়তের বিধি সম্বলিত কোন পঠিতব্য আয়াতও হতে পারে, অথবা কোন অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত আয়াতও হতে পারে, যা সমকালীন কোন ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে এবং যার প্রয়োজন পরে শেষ হয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তদ্রূপ অথবা তার চেয়ে উত্তম অন্য কোন আয়াত নাযিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যাপারে অক্ষম নন। তিনি সব কিছুর মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টির পরিচালক ও প্রভু। সর্বত্র কেবল তার নির্দেশই বলবৎ রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান? তুমি কি জানোনা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব বিরাজমান এবং তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। (আয়াত ১০৬-১০৭)

এ আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে আভাস- ইংগিতে সতর্ক করা হয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। এই সতর্কবাণী ও স্মরণিকার কারণ সম্ভবত এই যে, মোমেনদের কেউ কেউ ইহুদীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারাভিযান দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছিল এবং তাদের প্রতারণাময় যুক্তিতে তাদের চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। এর পেছনে এ কারণও থাকতে পারে যে, মোমেনরা রসূল (স.)-এর কাছে এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলো, যা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংগতিশীল নয়। পরবর্তী আয়াতে খোলাখুলিভাবে যে সতর্কবাণী ও বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তা দ্বারা বিষয়টি আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা কি নিজেদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন করতে চাও, যে ধরনের প্রশ্ন ইতিপূর্বে মূসাকে করা হয়েছিলো? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয়ই সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।' (আয়াত ১০৮)

মূসা (আ.)-এর জাতি তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিলো, তার কাছে যেভাবে কথায় কথায় দলীল প্রমাণ ও মোজেযা দেখানোর দাবী করতো এবং যখনই তিনি তাদেরকে কোন কাজের আদেশ দিতেন তখনই তার সাথে অসদাচরণ করতো, মোমেনদের কারো কারো মধ্যে সেই আচরণের বিবরণ কোরআনে একাধিক জায়গায় রয়েছে।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

এখানে তাদেরকে সবাধান করা হয়েছে যে, নবীর সাথে এ ধরনের আচরণের শেষ পরিণাম চূড়ান্ত গোমরাহী এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরীতে নিমজ্জিত হওয়া। বনী ইসরাঈলের এই পরিণামই হয়েছিলো। ইহুদীদের বড়ই আশা ছিলো মুলমানদেরও যদি তারা এই পরিণতি ঘটাতে পারতো। এ বিষয়টি পরবর্তী আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে,

'আহলে কেতাবের বেশীর ভাগ লোক তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়, নিছক নিজেদের ঈর্ষা চরিতার্থ করার .... সিদ্ধান্ত কার্যকর না করা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।' (আয়াত ১০৯)

বস্তুত, হিংসা বিদ্বেষ ও ঈর্ষা মানুষকে এ ধরনের আচরণেই প্ররোচিত করে থাকে। অন্যেরা যে ভালো জিনিসের সন্ধান পেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার প্ররোচণা দেয়। এসব দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞতার কারণে এরূপ করে না বরং জেনে শুনে সচেতনভাবেই করে।

'তাদের ঈর্ষার কারণে এবং সত্য কি তা প্রকাশিত হওয়ার পরেও।'

বস্তুত, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী জাতির মন প্রচন্ড হিংসা ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ছিলো। এ অবস্থা আজও বিদ্যমান। এই ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা থেকেই তাদের যাবতীয় ফন্দিফিকির ও ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি। কোরআন এই বিষয়টিই স্পষ্ট করে দিতে চায়, যাতে মুসলমানরা তা অবহিত হয়। তারা যেন জেনে নেয় যে, ইহুদীরা তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরাতে যত অপচেষ্টা চালাচ্ছে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামের প্রতি ঈমান এনে যে কুফরী থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ইহুদীরা যত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, সে সবের গোড়ায় রয়েছে তাদের এই প্রতিহিংসা। যে বিরাট নেয়ামত মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে, তার জন্যেই ইহুদীরা তাদের প্রতি এত হিংসায় জর্জরিত। আর এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এই ইহুদীদের দুরিভসন্ধি ও হিংসার মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার পর কোরআন মোমেনদেরকে মহানুভবতার শিক্ষা দিচ্ছে এবং হিংসা দ্বারা হিংসার জবাব না দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাদের অপতৎপরতা উপেক্ষা করার আহবান জানচ্ছে। কোরআন এই নীতি ততক্ষণ পর্যন্ত অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছে যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন। তাই কোরআন বলছে,

'অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও ভালো ব্যবহার করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন, আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর মনোনীত পথে চলতে থাকো, তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করতে থাকো এবং তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহর কাছে জমা রেখে নিশ্চিন্ত থাকো।

১১০ নং আয়াতটি লক্ষণীয় 'তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ অগ্রিম পাঠিয়ে রাখবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।'

এভাবেই কোরআন মুসলিম জাতির চেতনা জাগ্রত করে, তাকে বিপদের উৎপত্তি স্থল ও ষড়যন্ত্রের উৎস সম্পর্কে সতর্ক এবং ইসলামের শত্রুদের অসদুদ্দেশ্য, দুরভিসন্ধি ও প্রতিহিংসা সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেয়। তারপর তাদের সুপ্ত শক্তিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার ও তার অনুমতির প্রতীক্ষায় থাকার উপদেশ দেয়। আর যতক্ষণ আল্লাহর সেই নির্দেশ না আসে ততক্ষণ ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়, যাতে তাদের

হৃদয় প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার নোংরামি থেকে মুক্ত থাকে এবং মহান আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় তা যেন সুস্থ ও সবল থাকে।

এরপর কোরআন আহলে কেতাবের তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই দাবী খন্ডন করে যে, শুধু তারাই সঠিক ধর্মের অনুসারী এবং বেহেস্ত একমাত্র তাদের জন্যে বরাদ্দ হয়ে আছে, সেখানে তারা ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না। এই উভয় গোষ্ঠী একে অপরকে বলে যে, তোমাদের ধর্ম কোন ধর্মই নয়। এইসব দাবীর জবাবে সে কর্ম ও কর্মফল সংক্রান্ত যে প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য ঘোষণা করে পরবর্তী আয়াতগুলো লক্ষণীয়, ...তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো। (আয়াত ১১১)

মদীনায় ইহুদীরাই ছিলো মুসলমানদের প্রতিপক্ষ। সেখানে কোন খৃষ্টান গোষ্ঠী ছিলো না, যারা ইহুদীদের মত ভূমিকা অবলম্বন করতো। কিন্তু এখানে কোরাআন উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলে ধরেছে। এক সম্প্রদয়ের মুখ দিয়ে অপর সম্প্রদায়ের দাবী খন্ডন করিয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে মোশরেকদের মতামত তুলে ধরেছে।

ইহুদী নাসারাদের গলাবাজী

'আর তারা বলে, ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

এখানে উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীরা বলতো যে, বেহেশতে কেবল ইহুদীরা প্রবেশাধিকার পাবে, আর খৃষ্টানরা বলতো যে, খৃষ্টান ছাড়া কেউ বেহেশতে পা রাখতে পারবে না।

এই দুটো কথাই যুক্তি প্রমাণবিহীন গালভরা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি তাদেরক চ্যালেঞ্জ দেন এবং তাদের কাছে প্রমাণ চান।

'তুমি বলো, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।'

এখানে কোরআন ইসলামের একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছে। সেটি এই যে, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাতে কোন ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য বা স্বজনপ্রীতির অবকাশ থাকবে না। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, আল্লার প্রতি যথার্থ আত্মসমর্পণ ও আন্তরিকতার সাথে সৎকর্ম করা হয়েছে কিনা। এখানে কোন নাম ধামের কোন গুরুত্ব নেই।

'শুনে রাখ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে এবং একনিষ্ঠভাবে সৎ কাজ করবে। তার জন্যে তার মালিকের কাছে রয়েছে যথোচিত প্রতিদান তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।' (আয়াত ১১২)

ইতিপূর্বে শাস্তির ব্যাপারে এই মূলনীতি ঘোষণা করে তাদের অসার উক্তি খন্ডন করা হয়েছিলো।

'তারা বলতো, আমাদেরকে আগুন স্পর্শই করবে না, মাত্র কয়েক দিন ব্যতীত।'

তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং তার গুনাহ তাকে ঘেরাও করে ফেলেছে, সে দোযখের অধিবাসী হবে এবং সেখানে সে চিরদিন বাস করবে।'

বস্তুত, শাস্তি কিংবা পুরস্কার উভয় ব্যাপারে এই একই মূলনীতি নির্ধারিত। পাপী তার পাপের হাতেই বন্দী হবে। পাপ ছাড়া তার অন্য কিছুই বিচেনায় আসবে না অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে ও নিষ্ঠার সাথে সৎ কাজ করবে, অর্থাৎ যে নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর কাছে নিবেদন করবে তার সকল চিন্তা-চেতনা আবেগ ও অনুভূতি আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত হবে, সে অপর ব্যক্তির ঠিক বিপরীত, যে পাপের মধ্যে পুরোপুরি ঘেরাও হয়ে আছে। এখানে ইসলামের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরা হয়েছে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটির মধ্য দিয়ে। তারপর বলা হয়েছে এহসান তথা একনিষ্ঠভাবে সৎকাজ করার কথা। বস্তুত, ইসলামের বৈশিষ্টই হলো চিন্তা ও আচরণে ঐক্য, বিশ্বাস ও কর্মের ঐক্য, আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মগত নিষ্ঠার ঐক্য। এভাবে একটি আকীদা ও বিশ্বাস গোটা জীবনের বিধানে পরিণত হয়। এভাবে মানবীয় ব্যক্তিসত্তা তার সকল তৎপরতায় ও ধ্যান-ধারণায় একীভূত সত্তায় পরিণত হয়। আর এভাবেই মোমেন এই সকল পুরস্কারের যোগ্য হয়, যার কথা আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার জন্যে তার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনায়ও লিপ্ত হবে না।

সুরক্ষিত পুরস্কার কখনো নষ্ট হয় না। সুনিশ্চিত নিরাপত্তা কখনো কোন ভীতি দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। অঢেল আনন্দ ও তৃপ্তি কোন দুশ্চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এই মূলনীতির ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে কোন বৈষম্যও নেই, কোন স্বজনপ্রীতিও নেই।

ইহুদী খৃষ্টানদের ঝগড়া

ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেমন বেহেস্তের ওপর নিজ নিজ গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার দাবী করতো, তেমনি একে অপরকে বলতো তোমাদের কোন ভিত্তি নাই। মোশরেকরাও একই ধরনের কথা বলতো।

'ইহুদীরা বলতো, খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই। আর খৃষ্টানরা বলতো, ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা উভয়েই আসমানী কেতাব পাঠ করে। অপরদিকে যারা (আসমানী কেতাবে) একেবারে কিছুই জানে না, সেই (মোশরেক) জনগোষ্ঠীও অনুরূপ বলে থাকে। কাজেই যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত, তার মীমাংসা কেয়ামতের দিন আল্লাহই করবেন।' (আয়াত-১১৩)

'যারা একেবারে কিছুই জানে না' এই উক্তি দ্বারা আরবের কেতাবহীন জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, পরস্পরকে দোষারোপ, পৌত্তলিকতা ও আল্লাহ তায়ালার ছেলে মেয়ে থাকা সংক্রান্ত কল্পকথা ও কুসংস্কারাদি দেখে পৌত্তলিক জনগণ তাদেরকে নিজেদের চেয়ে উচ্চতর ও অভিজাত কোন ধর্মের অনুসারী বলে মনে করতো না। তাই তাদের ধর্মের প্রতিও তারা ছিলো নিরাসক্ত। তারাও বলতো যে, ইহুদী খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই।

কোরআন প্রথমে তো ইহুদী ও খৃষ্টানদের বেহেস্তের ওপর একচেটিয়া অধিকার খন্ডন করেছে। তারপর তাদের এক অপরের বিরুদ্ধে উচ্চারিত মন্তব্য উল্লেখ করেছে। অতপর তাদের বিবাদের মীমাংসা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেছে। কেননা তিনিই একমাত্র ন্যায়বিচারক নিষ্পত্তিকারী। সকল বিবাদ তার কাছেই উপস্থাপিত হয়। যে জাতি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি কোন যুক্তি প্রমাণের ধার ধারে না এবং একমাত্র তারাই সত্যের অনুসারী এবং একমাত্র তারাই বেহেশতের

অধিকারী বলে যে দাবী করে, তা খন্ডন করার পরও বিনা প্রমাণে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর মীমাংসার ওপর ন্যস্ত করে দেয়া ছাড়া তাদের মোকাবেলা করার আর কোন কার্যকর পন্থা নেই।

কেবলা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইহুদীদের অপপ্রচার

অতপর কোরআন ইহুদীদের আরেকটি অপচেষ্টার নিন্দা করে। রসূল (স.)-এর নির্দেশাবলী ও উপদেশাবলীর বিশেষত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তারা মুসলমানদের মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির যে পাঁয়তারা করে, কোরআন তার কঠোর সমালোচনা করে এবং তাকে আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর স্মরণে বাধা দান ও তাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করে।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ......সেখানেই আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।' (আয়াত ১১৪-১১৫)

আমার মতে বিশুদ্ধতম কথা এই যে, এই দুটো আয়াত কেবলা পরিবর্তনের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ইহুদীরা মুসলমানদের কাবামুখী হয়ে নামায পড়া ঠেকানোর অপচেষ্টা চালিয়েছিলো অথচ তা দুনিয়ার মানুষের প্রথম ঘর ও প্রথম কেবলা। ইহুদীদের এই অপচেষ্টার সাথেও এই দুটো আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে যা জানা যায়, তাতে আয়াত দুটোর বক্তব্যের অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে বলে মনে হয়। তবে নাযিল হওয়ার কারণ যাই হোক, আয়াতটি ব্যাপকতর অর্থবোধক এবং এর বক্তব্য আল্লাহর সকল মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কোন মসজিদেই আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দান এবং তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা নিন্দনীয়। অনুরূপভাবে এ কাজ যারা করবে তাদের সম্পর্কে কোরআন এখানে যে বিধান দিয়েছে তাও তাদের সকলের জন্যে প্রযোজ্য। সে বিধানটি হলো,

'আল্লাহর মসজিদে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া প্রবেশের অধিকার নেই।'

অর্থাৎ তারা কেবল আল্লাহর ঘরে নিরাপত্তা প্রার্থী হয়ে প্রবেশ করা ছাড়া নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত থাকার যোগ্য। (মক্কা বিজয়ের বছর এরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। বিজয়ের দিন রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফের চত্বরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।........এ ঘোষণা শুনে কোরায়শ বংশের বড় বড় নামজাদা ব্যক্তিরা নিরাপত্তা প্রার্থী হয়ে সেখানে প্রবেশ করলো। অথচ এক সময় তারাই রসূল (স.)-কে ও তার সংগীদেরকে মসজিদুল হারামে আগমন করতে বাধা দিত।) তদুপরি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তিও তাদের প্রাপ্য।

১১৪ নং আয়াতের শেষাংশের একটি ব্যাখ্যা এভাবেও করা হয়েছে যে, আল্লাহর মসজিদে তাদের অত্যন্ত ভয়-ভীতি সহকারে প্রবেশ করা উচিত। কেননা এটাই আল্লাহর ঘরের যথার্থ আদব ও সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা। এ ব্যাখ্যাটিও এখানে গ্রহণযোগ্য ও শুদ্ধ।

আয়াত দুটো কেবলা পরিবর্তনের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এই মতটিকে যে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি, ১১৫ নং আয়াতের বক্তব্য হলো তার কারণ।

'আল্লাহর জন্যেই পূর্ব ও পশ্চিম, যেদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ তায়ালা আছেন।'

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ইহুদীদের এই অপপ্রচার খন্ডনের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে যে, তাহলে তো বাইতুল মাকদেসের দিকে ফিরে মুসলমানরা যত নামায পড়েছে সব বাতিল হয়ে গেছে। সে জন্যে তারা আল্লাহর কাছে কোন পুরস্কার পাবে না। আয়াতটি তাদেরকে এই বলে জবাব দিচ্ছে যে, সকল দিকই কেবলা। যেদিকেই মুখ করে কেউ আল্লাহর এবাদত করবে, সেদিকেই আল্লাহ তায়ালা আছেন। একটি নির্দিষ্ট দিক স্থির করা আল্লাহর একটা নির্দেশ মাত্র। এ নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা শুধু ওই দিকেই রয়েছেন, অন্য দিকে তিনি নেই। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর কোনো অসাধ্য কাজ চাপিয়ে দেন না এবং তাদের সৎ কাজের প্রতিদান কমান না বা নষ্ট করেন না। তিনি তাদের মনের খবর জানেন, তাদের আবেগ অনুভূতি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও নিয়ত সম্পর্কে অবহিত। তার আদেশ পালনে প্রশস্ততা রয়েছে এবং নিয়ত তার জানা রয়েছে।

'তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।'

ইহুদী খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা

এরপর কোরআন আহলে কেতাবের আল্লাহ সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের বিভ্রান্তি এবং তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি ও বিকৃতির বিষয়টি আলোচনা করেছে। তাওহীদ হচ্ছে প্রত্যেক নবীর প্রচারিত আল্লাহর দ্বীনের সঠিক চিন্তা ও ধারণার মূল ভিত্তি। কিন্তু এই তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে আহলে কেতাব যে বিকৃত ধ্যান ধারণা পোষণ করতে থাকে, তাকে কোরআন জাহেলী চিন্তাধারার সমতুল্য বলেছে।

আল্লাহর ব্যক্তিসত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত আরব পৌত্তলিকরা যে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত ছিলো, 'আহলে কেতাব'ও তদ্রূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোরআন বলছে, এ ব্যাপারে আরব মোশরেকদের মনমানসিকতার সাথে আহলে কেতাব মোশরেকদের মন মানসিকতায় সাদৃশ্য রয়েছে। তার মতে শেরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে এই দুই গোষ্ঠীতে কোন পার্থক্য নেই। এই প্রসংগে সঠিক ইসলামী আকীদা কি তাও এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

'তারা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র! আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর। সকলেই তার অনুগত। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যখন কোন....... তাদের পূর্ববর্তীরাও অনুরূপ কথা বলেছিলো তাদের সকলের মন ছিলো একই রকম। আমি আয়াতগুলোকে বিশ্বাসীদের জন্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করেছি।' (আয়াত ১১৬-১১৭-১১৮)

'আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

এই ভিত্তিহীন কথাটা শুধু খৃষ্টানরাই যে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে, তা নয় বরং ইহুদীরাও হযরত উযায়ের (আ.) সম্পর্কে বলেছে। অনুরূপভাবে মোশরেকরাও ফেরেশতাদের আল্লাহর সন্তান বলতো। আয়াতে এখানে প্রত্যেক গোষ্ঠীর ধারণাগুলোকে তুলে ধরা হয়নি। কেননা এখানে আরব উপদ্বীপের সমকালীন তিনটি ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, আজও এই তিনটি সম্প্রদায়-ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকরা- একইভাবে ইসলামের সাথে শত্রুতা করে চলেছে। একটি বিশ্ব খৃষ্টবাদ, একটি বিশ্ব ইহুদীবাদ, অপরটি বিশ্ব কম্যুনিজম। এ তিনটি গোষ্ঠী তৎকালীন মোশরেকদের চেয়েও কট্টর কাফের। এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খৃষ্টান ও ইহুদীরা নিজেদেরকে একমাত্র সাধক ধর্মানুসারী বলে যে দাবী করে তা অসার ও বাতিল। কেননা স্পষ্টতই তারা পৌত্তলিকদের সমমনা।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারার অন্যান্য ভ্রান্ত দিক তুলে ধরার আগে তাদের এই জঘন্য ধারণার অপনোদজগতের প্রকৃত সম্পর্কটা কি তা বর্ণনা করা হয়েছে।

'আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত।'

নির্ভেজাল তাওহীদ

এখানে আমরা ইসলামের নির্ভেজাল ও পূর্ণাংগ চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। আমরা জানতে পারি, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃত ধরণটা কি। জানতে পারি কি প্রক্রিয়ায় স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছে। কোরআনে বর্ণিত চিন্তাধারা অন্য সকল চিন্তাধারার চেয়ে স্পষ্ট ও উৎকৃষ্ট। সৃষ্টিজগত স্রষ্টার দ্বারা উদ্ভুত হয়েছে শুধুমাত্র তার মহাপরাক্রান্ত অসীম শক্তিমান ইচ্ছার প্রয়োগ দ্বারা। তিনি শুধু বলেছেন 'হও,' অমনি যা তিনি চেয়েছেন তা হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্রষ্টা কর্তৃক কোন জিনিসের সৃষ্টির নিছক ইচ্ছা করাটাই তার অস্তিত্ব লাভের জন্যে যথেষ্ট এবং শুধু এই প্রক্রিয়াই এই বিশাল সৃষ্টিজগতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আর প্রতিটি সৃষ্টির জন্যে যে আকৃতি ও রূপ নির্দিষ্ট ছিলো সেই আকৃতি ও রূপেই তা উদ্ভূত হয়েছে। এ জন্যে কোন শক্তি বা বাস্তব মাধ্যমের প্রয়োজন হয়নি। তখন এই ইচ্ছাটা, যার প্রকৃত ও নিগূঢ় পরিচয় আমাদের অজানা, কিভাবে কাংখিত সৃষ্টির ওপর গিয়ে পতিত বা তার সাথে মিলিত হয়েছে, সেটা এখন এক দুর্জেয় রহস্য, যা মানুষের নাগালের বাইরে। কেননা মানুষ তা আয়ত্ত করার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষমতা রাখে না এজন্যে যে, এটা তার জন্যে অত্যাবশ্যকীয় নয়। যে দায়িত্ব পালনের জন্যে তার সৃষ্টি হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তার সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর খেলাফত ও গড়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্যে ।

পৃথিবীতে তার দায়িত্ব পালনের জন্যে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক নিয়ম জানা তার প্রয়োজন সেই পরিমাণ জ্ঞানই তাকে দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা যতটুকু উপকৃত হওয়া যায় এখানে ঠিক ততোটুকুই তাকে দেয়া হয়েছে। বৃহত্তম খেলাফতের দায়িত্ব পালনের সাথে যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের সম্পর্ক নেই, সে সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করা হয়নি, এটা কুলকিনারাহীন প্রান্তর যেখানে কোন আলোক স্তম্ভ নেই। মানবীয় দর্শন এলোপাতাড়িভাবে এসব অজানা রহস্য উদঘাটনের জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছে এবং মানুষের ধীশক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব আন্দায অনুমান করছে। অথচ তাকে এ ময়দানে কাজ করার যোগ্যতা, ক্ষমতা, সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ কিছুই দেয়া হয়নি। তথাপি এই চেষ্টা চালাতে গিয়ে অনেক উচ্চাংগের হাস্যকর আন্দায-অনুমান সংঘটিত হচ্ছে, যা দেখে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবে যে, একজন দার্শনিকের মস্তিষ্ক থেকে এসব উদ্ভট চিন্তা কিভাবে জন্ম নেয়। এর একমাত্র কারণ এই যে, দর্শনের এই নিশানবাহীরা মানবীয় বোধশক্তির গন্ডীর বাইরে কাজ করতে গেছে। ফলে তাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় করেও তারা কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। সে এমন কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তেও আসতে পারেনি, যার প্রতি কোন ইসলামী চিন্তাধারার অধিকারী ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী ব্যক্তি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। ইসলাম তার অনুসারী মোমেনদেরকে এই দিক নির্দেশনাবিহীন প্রান্তরে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো থেকে রক্ষা করেছে। এই ব্যর্থ নিষ্ফল ও ভ্রান্ত চেষ্টা থেকে তাকে রেহাই দিয়েছে। তথাপি গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত কিছু মুসলিম দার্শনিক যখন এই উচ্চমানে পৌঁছার সুসাহস দেখালেন, তখন তাদের গ্রীক গুরুদের মত জটিল ও জগাখিচুড়ি চিন্তাধারার শিকার হলেন। তারা ইসলামী চিন্তাধারার মাঝে ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা ঢুকাবার চেষ্টা করেন।

বস্তুত, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যখনই তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের বাইরে কাজে নিয়োগ করা হবে এবং তার ওপর তার স্বভাবসুলভ ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হবে তখন এই পরিণতি দেখা দেয়া অনিবার্য।

ইসলামী মতবাদ এই যে, সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্রষ্টা তুলনাহীন। কোন কিছুই তার মত নয়। এ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, 'সর্বেশ্বরবাদ' (ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ) নামে যে ধারণাটা একশ্রেণীর অমুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ ইসলামী চিন্তাধারার বহির্ভূত। এই মতবাদের মূল কথা হলো, সৃষ্টি ও স্রষ্টা একক সত্তা। সৃষ্টি স্রষ্টার সত্তার প্রতিবিম্ব, অথবা অন্য কথায় বলা যায়, সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টারই আকার রূপ। কিংবা এই ধারণার ভিত্তিতে যেভাবেই উভয়কে একই সত্তার দুই অংশ কল্পনা করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে ভিন্নতর অর্থে সৃষ্টি একক ও অভিন্ন সত্তা। কেননা স্রষ্টার অভিন্ন ইচ্ছায় সে এককভাবে সৃজিত, যে প্রাকৃতিক নিয়মে সে পরিচালিত তাও এক ও অভিন্ন তার আংগিক গঠন ও সমন্বয় এবং তার প্রতিপালনের দিকে তার মনোনিবেশ ও এবাদাতেও সে একক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেছেন এভাবে,

'বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, সকলেই তাঁর অনুগত।'

'অর্থাৎ কোরআন বলছে, বিশ্ব জগতের সব কিছু স্বয়ং তিনি নন, এগুলো তার মালিকানাভুক্ত ও তাঁর একান্ত অনুগত। সুতরাং এ কথা ভাবার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন নেই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাতে তার কোন সন্তান থাকা জরুরী। মূলত পৃথিবীর সকল সৃষ্টি একক ও অভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা সবাই একই পন্থায় পরিচালিত।

'তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যখন তিনি কিছু সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু বলেন 'হও,' সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।'

আল্লাহর ইচ্ছা কিভাবে সংঘটিত ও কার্যকর হয় তা মানুষের অজানা, কেননা তা মানবীয় অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষমতা বহির্ভূত। সুতরাং এই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা এবং এই অজানা তেপান্তরে পথপ্রদর্শকবিহীনভাবে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো নিরর্থক ও নিষ্ফল।

'আল্লাহর সন্তান আছে', এই মর্মে আহলে কেতাবদের প্রচারিত ভ্রান্ত বক্তব্য খন্ডন করার পর মোশরেকদের আরেকটা ভ্রান্ত বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এ বক্তব্যেও আহলে কেতাবদের বক্তব্যের মত কিছু কু-ধারণা ও ভ্রান্ত চিন্তা ফুটে উঠেছে। (আয়াত ১১৮)

ইহুদী ও মোশরেকদের অমূলক দাবী

'যারা অজ্ঞ তারা বলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে সরাসরি কথা বললেই পারেন অথবা আমাদের কাছে সরাসরি নিদর্শন এলেই তো হতো! এ ধরনের কথা তাদের পূর্ববর্তীরাও বলতো।'

এই অন্ধ লোকেরা হচ্ছে আরবের নিরক্ষর মোশরেক জনগোষ্ঠী। তাদের কাছে কেতাবের কোন জ্ঞান ছিলো না। তারা প্রায়ই রসূল (সা.) -কে চ্যালেঞ্জ দিতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলুক অথবা তাদের কাছে অলৌকিক কোন প্রমাণ আসুক! মোশরেকদের এ উক্তি এখানে তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো তাদের পূর্ববর্তী ইহুদী ও অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাদের নবীদের কাছে যে অনুরূপ দাবী জানাতো-এ কথা ব্যক্ত করা। মুসার (আ.) কাছে তাঁর জাতি দাবী করেছিলো যে, আমরা আল্লাহকে খোলাখুলি দেখতে চাই। অলৌকিক ঘটনার দাবীতে তারা ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতো। কাজেই সেসব আহলে কেতাব আর এইসব মোশরেকদের মধ্যে স্বভাব, চিন্তাধারা ও পথভ্রষ্টতায় একটা গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়েছে,

'তাদের অন্তর একই রকম।'

সুতরাং ইহুদীরা মোশরেকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা যায় না, বরং তারা সবাই একই মনমানসিকতাসম্পন্ন, তারা সবাই একই রকম গোয়ার্তুমি ও গোমরাহীতে লিপ্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'বিশ্বাসীদের জন্যে আমি আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছি।'

যে ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান মজবুতভাবে শেকড় গেড়েছে সে কোরআনের আয়াতগুলোতে তার বিশ্বাসের বাস্তবরূপ প্রতিফলিত দেখতে পাবে এবং এর ফলে সে তার বিবেকের প্রশান্তি খুঁজে পাবে। আয়াতগুলো নিজে দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি করে না, বরং মজবুত ও সুদৃঢ় বিশ্বাসই তাকে আয়াতের মর্ম ও স্বরূপ বুঝাতে সাহায্য করে হৃদয়কে প্রকৃত সত্যোপলব্ধির যোগ্য করে তোলে।

আহলে কেতাব ও মোশরেকদের প্রতারণামূলক উক্তি বাতিল প্রমাণ করার পর কোরআন পরবর্তী আয়াতগুলোতে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে তার সংগ্রামের প্রকৃত ধরন কি তাও বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের সাথে তার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গেলে তাকে বড় মূল্য দিতে হবে, যা তার সাধ্য ও আয়ত্তের বাইরে, আর সে মূল্য দিলে আল্লাহর অসন্তোষ ও গযবের শিকার হতে হবে।

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছি। দোযখবাসী সম্পর্কে তোমাকে .... রক্ষাকারী ও সহায়তাকারী থাকবে না। যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি তারা তা যথাযথভাবে অধ্যয়ন করে, তারা তার প্রতি ঈমান আনে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।' (আয়াত ১১৯, ১২০ ও ১২১)

প্রথমেই বলা হয়েছে,

'আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি.....।'

এ বাক্যটি দ্বারা রসূল (স.)-কে সত্যপন্থী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, বিভ্রান্তকারীদের সৃষ্ট সন্দেহ খন্ডন করা হয়েছে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত এর দ্বারা নস্যাত করা হয়েছে।

'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে।'

অর্থাৎ তোমার কাজ হচ্ছে শুধু প্রচার করা। অনুগতদের সুসংবাদ প্রদান করা ও অমান্যকারীদের সতর্ক করাই হচ্ছে তোমার দায়িত্ব।

'দোযখবাসীদের জন্যে তুমি দায়ী নও।'

কেননা তারা তাদেরই কর্মফল ও নাফরমানীর পরিণামেই দোযখে যাবে।

ইহুদী ও খৃস্টানরা তোমার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চালিয়েই যাবে। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তারা চালাতেই থাকবে। তারা কখনো তোমার সাথে আপোস করবে না। যদি তুমি এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ ক্ষান্ত হও, সত্য প্রচার বন্ধ করো, এই বিশ্বাস ও ঈমান পরিত্যাগ করো এবং তাদের গোমরাহী ও শেরকের অনুসরণ করো তাহলেই করো তারা তোমার ওপর খুশী হবে।

'তুমি যতোক্ষণ তাদের দ্বীনের অনুসারী না হবে, ততোক্ষণ ইহুদী ও খৃস্টানরা তোমার ওপর খুশী হবে না।'

আসলে ওটাই হচ্ছে তাদের খুশী না হওয়ার মূল কারণ। তাদের খুশী না হওয়ার কারণ কোন যুক্তি প্রমাণের অভাব নয় এবং তুমি যে সত্যপন্থী সে সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাও তাদের অসন্তুষ্টির

কারণ নয়। তুমি তাদের প্রতি যতই সমঝোতা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করো, কোনো কিছুতেই তারা খুশী হবে না, তারা খুশী হবে, যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ করে তাদের মতের অনুসারী হয়ে যাও!

যে চিরস্থায়ী সমস্যাটা সর্বকালে ও সর্বদেশে মুসলমান ও আহলে কেতাবের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে ইসলামের আকীদা ও আদর্শ। এই আকীদার কারণেই ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে সর্বকালে ও সর্বত্র সংঘাত বাধায়। অবশ্য তারা নিজেরাও অনেক সময় কারণে অকারণে সংঘাত সংঘর্ষ বাধায়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে তাদের এই আদর্শগত লড়াই এক দিনের জন্যেও থামেনি। মুসলমানদের সাথে লড়াইর সময় তারা সব সময় নিজেদের কোন্দল ভুলে গিয়ে একত্রিত হয়ে গেছে।

আদর্শিক সংঘাত

প্রকৃতগতভাবেই এটা হচ্ছে আদর্শিক সংঘাত। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের স্থায়ী শত্রুরা এই সংঘাতকে সব সময় ভিন্নরূপ দিতে চেষ্টা করে তাদের স্বভাবসুলভ কুচক্রীপনা, ধোঁকাবাজী ও নোংরামির কারণেই তারা একে ভিন্নরূপ দিতে চেষ্টা করে। কারণ তারা বহুবারই দেখেছে যে, মুসলমানরা তাদের দ্বীনের জন্যে আদর্শের জন্যে অনেক বীরত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে, বিশেষ করে যখন তারা আদর্শিক জেহাদে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এজন্যেই এসব পুরনো দুশমনরা বর্তমানে যুদ্ধের পতাকা পাল্টে ফেলেছে। একে এখন আর তারা ধর্মযুদ্ধ নাম দেয় না, যদিও আসলে তা পুরোপুরি ধর্মযুদ্ধই। ধর্মীয় আবেগ ও বীরত্বকে তারা আসলেই ভয় পায়। তাই তারা এখন ভূমি ও দেশ, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং সামরিক কেন্দ্র...... ইত্যাদি নামে এই যুদ্ধ বাধায়, আর মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন, তাদের মনে তারা এ ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, আকীদা ও আদর্শের কথাবার্তা এখন সেকেলে ব্যাপার হয়ে গেছে। এবং এগুলো এখন আর কোন মানে হয় না। ধর্মের নামে যুদ্ধ বাধানোও এখন ঠিক নয়। এটা হচ্ছে অনেকটা ধর্মান্ধতারই লক্ষণ। এই শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তাধারা তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, এতে করে তারা ইসলামী বীরত্ব ও ভাবাবেগের তীব্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে। এদিক থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হওয়ার মানসে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম এই দুর্লংঘ প্রাচীরটাকে ধসিয়ে দেয়ার জন্যে চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। কেননা এই প্রাচীরের সাথে দীর্ঘকাল লড়াই করে তারা নিজেদেরকেই ক্ষতবিক্ষতই করেছে মাত্র।

আহলে কেতাবসহ সবাই জানে, এটা হচ্ছে আদর্শেরই লড়াই—ভূমির লড়াই নয়, ধন সম্পদের লড়াইও নয়, সামরিক কেন্দ্রের লড়াইও নয়। এ লড়াই ভুয়া নামের পতাকা সমুন্নত করার লড়াইও নয়। এই ভুয়া পতাকা তারা তাদের মনের অভ্যন্তরে লুকানো এক জঘন্য উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করে থাকে। লড়াই-এর আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়ার মানসেই তারা এটা করে। আমরা যদি তাদের প্রতারণায় প্রতারিত হই তাহলে সেটা হবে আমাদেরই দোষ। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে (স.) ও তাঁর মাধ্যমে তার উম্মাতকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে,

'ইহুদী ও খৃস্টানরা তোমার ওপর কখনো খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে যাও।'

এই ধর্মান্তরই তাদেরকে খুশী করার একমাত্র উপায়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু চূড়ান্ত সত্য কথা হলো,

'তুমি বলে দাও, আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে আসল হেদায়াত।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন তা ছাড়া আর কোন পথই হেদায়াতের নয়। সুতরাং তার বিনিময়ে আর কিছুই লাভ করা যেতে পারে না। হেদায়াত কখনো ত্যাগ করার বিষয় নয়। তা নিয়ে কোন দরকষাকষিও চলতে পারে না। যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক, এই সঠিক পথের বিনিময়ে তাদের মৈত্রী, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব লাভের আকাংখা যেন মোমেনদেরকে পেয়ে না বসে, সে ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যদি তোমার কাছে সত্য জ্ঞান আসার পরেও তুমি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো, তাহলে তোমাকে আল্লাহ গযব থেকে রক্ষা করার কেউই থাকবে না, থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।'

আল্লাহর বন্ধু ও শ্রেষ্ঠতম রসূলকে এরূপ ভয়ংকর হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তুমি যদি এই হেদায়াত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হও, তাহলে তুমি বাতিলপন্থীদের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর শিকার হয়ে পড়বে। কেননা আল্লাহর যে হেদায়াতের বাণী সরাসরি তোমার কাছে আসে, তার বিকল্প আর কোন হেদায়াতের পথ নেই। তুমি যদি পথচ্যুত হও, তবে নিছক তাদের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর অনুগত হয়েই পথচ্যুত হবে–কোন যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হয়ে নয়। আর যারা তাদের কামনা বাসনার পরোয়া করে না বুঝতে হবে তারা তাদের নিজেদের কেতাব সঠিকভাবে অধ্যয়ন করে, তাই তারা তোমাদের আনীত সত্যের প্রতি ঈমান আনে। যারা তা মানেনা তারাই ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে,

'বস্তুত, ঈমানের ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? কেননা ঈমান হলো সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত।' (আয়াত ১২১)

এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী ঘোষণা দেয়ার পর বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। যেন সুদীর্ঘ বিতর্ক ও বাকবিতন্ডার পরই তাদের কাছে এই শেষ আবেদনটি রাখা হচ্ছে। তাদের প্রতিপালক ও নবীদের সাথে তাদের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার পর এবং রসূল (স.) ও মোমেনদেরকে সাবধান করার পরই তাদেরকে লক্ষ্য করে যেন শেষ আবেদনটি এখানে পেশ করা হচ্ছে। কারণ তারা আল্লাহর এই মহান আমানতের ভার বহনে অবজ্ঞা ও অবহেলায় করছিলো। তাই তাদেরকে এখানে পুনরায় সম্বোধন করা হয়েছে।

'হে বনী ইসরাঈল, আমার সেই নেয়ামতের কথা তোমরা স্মরণ করো......।' (আয়াত ১২২)

এ পর্যন্ত আলোচ্য অংশের মধ্যে আহলে কেতাবদের বিষয়গুলোই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং আলোচনার প্রায় সবটুকু জুড়ে রয়েছে বনী ইসরাঈল জাতির বৃত্তান্ত। যত নবী সে জাতির মধ্যে (বিগত চার পাঁচ হাজার বছর ধরে) এসেছেন, যে আইন-কানুন তাঁরা চালু করেছেন, যে আদর্শ তাঁরা উপস্থাপন করেছেন তার মোটামুটি বিবরণ এখানে রয়েছে। মূসা (আ.) থেকে নিয়ে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত দীর্ঘ যমানা ধরে আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের যাবতীয় ওয়াদা ও চুক্তির আলোচনাই প্রায় এর সারাটি অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। আবার এসব আলোচনার বেশীর ভাগই রয়েছে ইহুদীদেরকে নিয়ে। খৃষ্টানদের বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে কম। মোশরেকদের বিষয়গুলোর প্রতি সামান্য কিছু ইংগিত দেয়া হয়েছে মাত্র; তাও শুধু তাদের সেসব বিষয়ে, যেগুলোর সাথে ইহুদী খৃষ্টান অথবা আহলে কেতাবদের সাথে গভীর মিল রয়েছে।

ইবরাহীম (আ.)-এর যথার্থ অনুসারী

কিন্তু বর্তমানের এই আলোচনা এগিয়ে চলেছে মূসা (আ.)-এর পূর্বেকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে। এসব ঘটনার মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর ওইগুলো বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর সাথে আরব-মোশরেকদের ব্যবহারের মিল রয়েছে। সেই বিবদমান ঘটনাগুলোও বিবৃত হয়েছে, যেগুলো মুসলমান ও মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত ইহুদীদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত সৃষ্টি করে রেখেছিলো।

আহলে কেতাবরা ইসহাক (আ.)-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর বলে পরিচয় দিতো এবং সেই কারণে তারা গৌরবও বোধ করতো। তারা মনে করতো ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ও তার বংশধরদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বরকত দানের যে ওয়াদা ছিলো সেই ওয়াদার কারণে তারাই আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের বেশী অধিকারী। অতএব, হেদায়াতের ধারক, বাহক এবং দ্বীনের পথে নেতৃত্ব লাভের অধিকারী তারাই। পরকালেও জান্নাত তারাই লাভ করবে–তাদের আমল আখলাক যাই-ই হোক না কেন।

অপরদিকে কোরায়শের লোকেরা মনে করতো ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তারা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তারাই ইবরাহীম (আ.)-এর যথাযথ উত্তরাধিকারী। সুতরাং কর্তৃত্ব, মান-সম্ভ্রম ও রহমত-বরকত লাভ করার যোগ্যতা ও অধিকার তাদেরই বেশী। তারা যখন মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী হিসেবে সারাবিশ্বে স্বীকৃত ও সমাদৃত, তখন তাদেরই হাতে ধর্মীয় নেতৃত্ব আসার কথা। তারাই প্রকৃতপক্ষে আভিজাত্য ও গৌরবের অধিকারী।

ইহুদী ও নাসারাদের দাবীর কথা কোরআনে কারীমে এইভাবে উল্লেখিত হয়েছে,

'আর তারা দাবী করে বললো, ইহুদী অথবা নাসারা ব্যতীত অন্য কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

এই কারণেই তারা মুসলমানদেরকে ইহুদী ও নাসারা বানানোর চেষ্টা করে চলেছিলো। তারা বললো, 'তোমরা ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে যাও তাহলেই হেদায়াত পেয়ে যাবে।'

এভাবে যারা মসজিদসমূহে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করতে নিষেধ করতো তাদের সম্পর্কেও কালামে পাকে কথা এসেছে। তারা মসজিদগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টাতেও নিয়োজিত ছিলো। মসজিদ ভাংগা বা দ্বীন-ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় বিশেষভাবে ইহুদীরাই বেশী ষড়যন্ত্র করতো। কেবলা পরিবর্তনের ঘটনায় তারাই বেশী জ্বলেপুড়ে মরছিলো।

এখন ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) সম্পর্কে আলোচনা আসছে। আলোচনা আসছে কিভাবে বায়তুল হারাম-এর নির্মাণ কাজ শুরু হলো, কিভাবে তার ভিত্তি স্থাপিত হলো, তার দেওয়ালগুলোই বা কিভাবে নির্মিত হলো এবং তার ধর্মীয় মূল্যবোধ কি ছিলো মোটামুটি এই সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে, যাতে করে ইহুদী, নাসারা ও মোশরেকদের দাবীগুলোর অসারতা প্রমাণিত হয়, আর কেবলা পরিবর্তনের তাৎপর্যও সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করা যায়।

এমনি করে ইবরাহীম (আ.)-এর আনীত 'দ্বীন' এর মূল বিষয় যে ছিলো তাওহীদ-এর প্রতিষ্ঠা, তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মনগড়া সকল মতবাদ যে ছিলো ভ্রান্ত তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচনায় ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম সবাই যে একই আকীদা-বিশ্বাস ও একই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাও জানা যায়। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াকুব (আ.)-এর আর এক নাম ছিলো ইসরাঈল

এবং তাঁর নামেই ইহুদীরা 'বনী ইসরাঈল' বলে পরিচিত।) মুসলমানদের দ্বীন সম্পর্কে যে আকীদা বিশ্বাস তাও ওপরে বর্ণিত নবীদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অভিন্ন। সবাই একইভাবে শেরক্কে উৎখাত করার কাজে নিয়েজিত ছিলেন। কেউ নিজস্ব উদ্ভাবিত কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে দুনিয়ায় আসেননি। ঈমান আকীদার কথাগুলো প্রতিষ্ঠাই মোমেন-হৃদয়ের একান্ত কামনা ও বাসনা, সেখানে কোন অন্ধ বিদ্বেষ পোষণের স্থান নেই। আকীদা বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্পর্ক কোনো রক্তের বা বংশের সাথে থাকে না–থাকে ঈমান ও আকীদার গভীরতার সাথে। অতএব, যে কোন দেশে যে কোন যুগে এবং যে কোন গোত্রের লোকেরা এই আকীদার ওপর দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই হবে সেই নবীদের ওয়ারিস। আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কের চাইতে তাদের সম্পর্ক নবীদের সাথে আরও গভীর হবে, আল্লাহ্র 'দ্বীন'ই সত্য-সঠিক জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই, নেই কোন আত্মীয়তা।

এই সকল তথ্যই ইসলামী জীবন পদ্ধতি রচনার পথে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। একথাগুলোকে অতি চমৎকারভাবে কোরআনে কারীম ব্যাখ্যা করেছে। কোরআন মজীদ আমাদের দৃষ্টিকে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি লোমহর্ষক ব্যবহার এর দিকে নিয়ে যায়। নমরুদ এর সাথে তাঁর সংলাপ সম্পর্কে জানায়, আরো জানায় তাঁর ওপর আপতিত যুলুম নির্যাতন ও পরীক্ষ-নিরীক্ষা সম্পর্কে এবং সে কারণগুলো সম্পর্কে যা তাঁকে আল্লাহ তায়ালা প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত করেছিলো এবং যা তাঁকে মানবমন্ডলীর নেতা বানিয়েছিলো। তাঁরই শিক্ষা ও ত্যাগ-কোরবানীর পথ ধরে উম্মতে মোহাম্মদী তথা মুসলমানরা মোহাম্মদ (স.)-এর সেই একই দাওয়াত কবুল করেছে, যা ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) তাদের দান করেছিলেন। পিতা-পুত্র মিলে তারা দুজনে মসজিদে হারাম গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে এই ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সেই উদ্দেশ্যের পথে কাজ করে যারা সে আমানতের হক আদায় করেছেন তারাই তাঁর রক্তসূত্রে আগত সকল বংশীয় লোক থেকে বেশী নৈকট্যের অধিকারী। এই একটি মাত্র কারণ যার ওপর আকীদার উত্তরাধিকার হিসাবে মোহাম্মাদ (স.)-এর রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সঠিক চিন্তাধারার মজবুতী এসেছে।

এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম-এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। রেসালাত-এর প্রথম এবং শেষ কথাটিও হচ্ছে এইটি। এইভাবেই একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আ.) বিশ্বাস করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর পরে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের পরবর্তী বংশধরেরা। তার পরবর্তীতে মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামও একই আকীদার ধারক ও বাহক ছিলেন। সর্বশেষে মুসলমানরাই ইবরাহীম (আ.)-এর মীরাস লাভ করলো। অতএব, যে কেউ এখন এই আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী হবে সেই-ই প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হবে, উত্তরাধিকারী হবে তাঁর প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা ও সুসংবাদেরও। যে ব্যক্তি এ আকীদার প্রতি অমনোযোগী হবে এবং ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াবে সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভেংগে ফেলবে, ফলে সে তাঁর উত্তরাধিকার হারাবে এবং তাঁর প্রতি প্রদত্ত সুসংবাদও তার জন্যে কার্যকর থাকবে না।

ইমামত প্রসংগে কোরআন

সুতরাং ইহুদী-নাসারাদের শুধুমাত্র ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় ও বাছাইকৃত বান্দাহ হওয়ার দাবী নাকচ হয়ে গেল। অস্বীকার করা হলো তাদের ওয়ারিস হওয়া ও খলীফা হওয়ার কথা। যে দিন থেকে তারা এই আকীদা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে সেই দিন থেকেই তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হওয়ার এই সম্মান কেড়ে নেয়া হলো এবং একইভাবে কোরায়েশদের কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী ও নির্মাণকারী হওয়ার যে গৌরব ছিলো তাও ছিনিয়ে নেয়া হলো, কারণ তারা এই পবিত্র ঘরের নির্মাণকারী অথচ সেই আকীদা পরিত্যাগ করার কারণে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। অতপর ইহুদীরা যে মনে করতো যে তাদের কেবলাকেই মুসলমানদের কেবলা মানা উচিত এ দাবীও নাকচ হয়ে গেল, সুতরাং এখন থেকে কা'বাই হলো মুসলমানদের ও তাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা।

কোরআনে কারীমের আলোচ্য অংশের মধ্যে যে বিস্ময়কর তথ্যগুলো পরিবেশিত হয়েছে তা বহু বিষয়কেই জীবন্ত করে তুলে ধরেছে। আহলে কেতাবদের সম্পর্কিত আলোচনা মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কোরআনে কারীম ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলছে,

'স্মরণ করো, সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে কিছু নিদর্শন দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন যখন সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, অবশ্যই আমি তোমাকে গোটা মানবজাতির নেতা বানাতে চাই। সে বললো, আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও কি এমন নেতা বানাবে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার ওয়াদা যালিমের জন্যে নয়।' (আয়াত ১২৪)

আল্লাহ রব্বুল ইযযত তার নবী (স.)-কে বলছেন, স্মরণ করে দেখ, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ইবরাহীমকে বিভিন্ন বিষয় ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর সে এই দায়িত্বগুলো পালন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। আল্লাহ তায়ালা অন্য স্থানে ইবরাহীম (আ.)-এর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলছেন যে, 'সে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলো, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার উপর খুশী হয়েছেন আর এই কারণেই সে তাঁকে সাক্ষী হিসাবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে, ইবরাহীমই সেই ব্যক্তি যে তার ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেছিলো।'

ইবরাহীম (আ.) মর্যাদার যে আসনটি লাভ করেছিলেন তা অবশ্যই অতি মহান । এ সম্মানজনক আসন আল্লাহ তায়ালা নিজ খাস মেহেরবানী দ্বারা তাকে দিয়েছিলেন। মানুষের নিজেদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে যার দ্বারা সে কোন ওয়াদা পূরণ করতে পারে অথবা কোন দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারে।

সে সময় থেকেই ইবরাহীম (আ.) সেই সুসংবাদ বাণী পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন অথবা তাঁর বিশ্বস্ততা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, অবশ্যই আমি পৃথিবীর বুকে তোমাকে নেতা বানাতে চাই। এমন নেতা যাকে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে সবাই গ্রহণ করবে, আর তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে যাওয়ার কাজে নেতৃত্ব নেবেন, ভাল কাজে এগিয়ে দেবেন আর সবাই তাঁর অনুসারী হবে। তাঁর মধ্যে ওরা নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী খুঁজে পাবে।

ইবরাহীম (আ.) মানব প্রকৃতির সকল স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই গুণাবলী তাঁর বংশধর, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে পৌঁছে যায়। আওলাদে ইবরাহীম এর মধ্যে গভীরভাবে গড়ে ওঠা এই স্বাভাবিক গুণাবলী ছিলো সকল যামানার মানুষদের মধ্যে অনুকরণযোগ্য, যার ভিত্তিতে সাধারণভাবে মানুষ অগ্রগতি ও মানব কল্যাণের পথ দেখতে পেয়েছে এবং মানব সত্তা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছে। এর সূচনা হয়েছিলো ইবরাহীম (আ.) থেকে এবং পরবর্তী লোকেরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা অনুসরণ করেছে। এই-ই ছিলো সেই অনুভূতি, যার কারণে কেউ ধ্বংস হয়েছে, কেউ বিপদগ্রস্ত হয়েছে, আবার কারও জীবন ফলে ফুলে সুশোভিত হয়েছে। কিন্তু সত্যের এই চেতনা মানব প্রকৃতির মর্মমূলে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। এই প্রকৃতিগত চেতনার ভিত্তিতেই ইসলাম উত্তরাধিকার বন্টন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এ বন্টন-নীতি সম্পূর্ণ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এবং মানুষ এই বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন কর্মঠ হয় তেমনি তার সমগ্র প্রচেষ্টাকেও সে কাজে লাগাতে পারে। এই নিয়মনীতিকে ধ্বংস করার যে কোন প্রচেষ্টা মানব-প্রকৃতির মূল ভিত্তিকেই ধ্বংস করার নামান্তর। এটা হচ্ছে বিকৃত সামাজিক আচরণের এমন এক চিকিৎসা যা কৃত্রিম এবং যার দ্বারা মূল সমস্যার কোন সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন চিকিৎসা যেমন সমস্যার সমাধান দিতে পারে না, তেমনি তা কোন সংশোধনী আনতে পারে না এবং আনলেও তা স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি এমন আছে যা প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় অথচ তা যে কোন সংশোধন আনার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা রাখে, আর তার জন্যেই প্রয়োজন হেদায়াত ও ঈমান এর পথ গ্রহণ, মানবসত্তা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন, মানব প্রকৃতি ও তার গঠন সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। এরশাদ হচ্ছে,

'ইবরাহীম বললো, আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ ইমাম হবে না।?

এ কথার জওয়াবে তার পরীক্ষাকারী ও নির্বাচনকারী আল্লাহর পক্ষে যে কথাটি বলা হয়েছে তা তার আলোচনা ইতিমধ্যে এসে গেছে, তা হচ্ছে, ইমামত শুধু দেওয়া হবে তাদেরকে, যারা ঈমান আমল ও চিন্তা-চেতনায় ও সংশোধনী কাজকর্মের মাধ্যমে তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এটা বংশগত বা গোত্রগত কোন মীরাস নয় যে, রক্ত-মাংসের সম্পর্কের কারণে তাদের জন্যে তা নির্ধারিত হবে। বরং ইমামতের জন্যে দ্বীনী যোগ্যতা ও আকীদা-বিশ্বাসের স্বচ্ছতাই হবে এখানে একমাত্র বিষয়। রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সবই হচ্ছে এক একটি বড় বড় জাহেলিয়াত যা ইসলামী চিন্তাধারার সাথে নীতিগতভাবেই সাংঘর্ষিক। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

'আমার ইমামত-দানের ওয়াদা তারা লাভ করবে না, যারা যালেম।'

যুলুম–এর বহু ধরণ এবং প্রকৃতি রয়েছে। এক, শেরক-এর গুনাহ করে নিজের ওপর যুলুম করা। দুই, বিদ্রোহ করার মাধ্যমে মানুষের ওপর যুলুম করা। এইভাবে যালেমদের জন্যে যে ইমামত (নেতৃত্ব) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সে অর্থে সর্ব-প্রকার নেতৃত্বকেই বুঝায়, যেমন রেসালাত নেতৃত্ব, খেলাফত নামায এর নেতৃত্বসহ অন্যান্য সকল প্রকার ও সকল পর্যায়ের নেতৃত্ব। এর সর্বপর্যায়ে এবং সকল ব্যাপারে ইনসাফ বা সুবিচার কায়েম করাই ইমামতের হক আদায়ের মূল কথা। যুলুম যত প্রকার আছে তার সবটাই মানুষকে ইমামত-এর যোগ্যতা থেকে

দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই কথাটাই ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হয়েছিলো। এই অঙ্গীকার-এর মধ্যে কোন হেরফের নেই, নেই কোন গোপনীয়তা। এ কথা অকাট্যভাবে সত্য যে ইনসাফ না করার কারণে ইহুদীদেরকে ইমামত-এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে অপসারিত করা হয়েছে যাবতীয় নেতৃত্ব থেকে। তারা যুলুম করেছে, অগণিত অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর আইন অমান্য করেছে এবং তাদের দাদা ইবরাহীম (আ.)-এর আকীদা-বিশ্বাস থেকে তারা ফিরে গেছে।

এই কথাটাও ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হয়েছিলো যে নেতৃত্বের ব্যাপারে এটাই চূড়ান্ত কথা যে, যারা ইনসাফ করবে না (প্রকারান্তরে তারাই যুলুম করবে) তাদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে দেয়া হবে। এই কথা অনুযায়ী আজকের মুসলমান যারা শুধু নামেই মুসলমান, তারা আল্লাহর না-ফরমানী যুলুম আল্লাহর পথ থেকে দূরে শরীয়তের হুকুম-আহকাম সব উপেক্ষা করে যথেচ্ছ জীবন যাপন করায় নেতৃত্বরূপী আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তারা পুরোপুরি মাহরূম হয়ে গেছে। যতই তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা আজ ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ইসলামের জীবন পদ্ধতি তারা পরিত্যাগ করেছে; যার কারণে তাদের মুসলমানিত্বের দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মূল বিষয়গুলো থেকে তারা আজ বহু বহু দূরে অবস্থান করছে।

যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে মজবুত হয়না ইসলাম সে ধরনের সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলে। আকীদা বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী কাজ এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে সে ব্যক্তির সাথে নৈকট্যের বন্ধনও কেটে যায়। একই জাতির মধ্যকার দু'টি দলের মধ্যেও মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় যদি আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকে। এমনকি পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যেও আদর্শের পার্থক্যের কারণে বিরাট বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও মতাদর্শের বিভিন্নতায় বিচ্ছেদ আসে। আরব মোশরেকরা এক জাতি এবং মুসলিম-আরবরা পৃথক আর এক জাতি। এ দুই এর মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, আর না আছে কোন নৈকট্য, আর না তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে কোন সম্বন্ধ। অপর দিকে, আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে তারা এক জনগোষ্ঠীর আর যারা ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা আলইহিমুস সালামের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা আর এক জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা গড়ে উঠতে পারে না। পিতা-পুত্র-পৌত্র হওয়ার কারণেই যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা নয়, আসল যে কারণে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা ঈমান ও আকীদার সম্পর্ক। বিভিন্ন বংশের সব লোক মিলে যে জাতি গড়ে ওঠে তা বেশীদিন টিকে না। মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বন্ধন ও ঐক্য গড়ে ওঠে সেইটাই স্থায়ী হয়; যদিও তাদের সবার বাসস্থান ও রং চেহারা বিভিন্ন। এই-ই হচ্ছে ঈমানী ধ্যান-ধারণা যা আল্লাহ তায়ালার মহান কেতাবে বিবৃত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে দেখ, সে সময়ের কথা যখন আমি এই মহান কা'বা ঘরকে সমগ্র মানবমন্ডলীর কেবলা বানিয়েছিলাম এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ইবরাহীম এর অবস্থানের জায়গাটিকে তোমরা সেজদার জায়গা বানিয়ে নাও। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈল থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এই বলে যে, তারা দুজনে আমার এই ঘরটিকে তাওয়াফকারী, এখানে অবস্থানকারী এবং রুকু ও সিজদা-দানকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখবে।' (আয়াত ১২৫)

কাবাঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

এক সময় এই পবিত্র কা'বা ঘরের খেদমতের ভার গ্রহণ করে মক্কার কোরায়শরা। এই কারণেই তারা মোমেনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতো, তাদেরকে কষ্ট দিতো এবং দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্যে তাদেরকে চাপ দিতো, যার ফলে তারা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনকে ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হলো। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, এ ঘরটি দূর-দুরান্তর থেকে আগত সকল মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হোক, তাদেরকে কেউ ভয় না দেখাক, বরং তাদের জান-মাল যেন এই ঘরে এসে নিরাপদ হয়ে যায়। চেয়েছিলেন এ ঘরকে শান্তির আধার, শান্তি-দানকারী এবং নিরাপদ স্থান বানাতে। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যেন তারা 'মাকামে ইবরাহীমকে' নামাযের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে নেয়। বস্তুত মাকামে ইবরাহীম বলতে পুরো ঘরটাকেই বুঝানো হয়েছে। আমরাও এখানে মাকাম ইবরাহীম-এর ব্যাখ্যায় পুরো ঘরকেই বুঝিয়েছি।

এখন মুসলমানদের পক্ষে বায়তুল্লাহকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করা এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, যার ওপর কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এটাই প্রথম কেবলা যার দিকে ইবরাহীম (আ.)-এর যামানা থেকে তাঁর মুসলিম উত্তরাধিকারীরা বরাবর নামায পড়ে এসেছে। নামায পড়েছে তারা যারা সঠিকভাবে তওহীদে বিশ্বাসী ছিলো। তারা জানতো যে এটা আল্লাহরই ঘর–কোন মানুষের নয়। ঘরের যিনি মূল মালিক, তিনি তাঁর দু'জন নেক বান্দাহর কাছ থেকে এ ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা ঘরটিকে যাবতীয় আবিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং এ ঘরকে সদা-সর্বদা তাওয়াফকারী, এখানে অবস্থানকারী ও রুকু সেজদাদানকারীদের জন্যে পরিস্কার পরিচ্ছন করে রাখবে। চারদিক থেকে আগত হজ্জ যাত্রীদের জন্যে একে প্রস্তুত রাখবে। এ ঘরের রক্ষণা-বেক্ষণকারীরাই হচ্ছে এ ঘরের অবস্থানকারী, যারা তাদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনার তাগিদে এখানে থাকতে বাধ্য হয়। আর যারা এখানে নামায পড়বে, রুকু দেবে, সেজদা করবে তারা নিজ নিজ প্রয়োজন মত এখানে আসবে, তাদের কেউই এ ঘরের মালিক নয়, এমন কি ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্সালামও এ ঘরের মালিক ছিলেন না। সুতরাং কেউই উত্তরাধিকার সূত্রে এ ঘরের মালিক হতে পারে না। তাঁরা উভয়ে ছিলেন এ ঘরের খাদেম। তাঁদের কাজ ছিলো এখানে আগত আল্লাহর মোমেন বান্দাহদের জন্যে ঘরটিকে উপযুক্ত সেজদাগাহের উপযোগী বানিয়ে রাখা। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার রব এ শহরটিকে নিরাপদ বানিয়ে দাও এবং রোজ হাশরের ওপর ঈমান আনয়নকারী এর বাসিন্দাদেরকে নানাপ্রকার ফলমূল থেকে রেযেক (যাবতীয় জীবনধারণকারী সামগ্রী) দান করো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিন্তু সামান্য কিছু মালমাত্তা আমি দেবো, আর তারপর তাদেরকে দোযখের আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য করবো, আর সে বড়ই নিকৃষ্ট হবে সে প্রত্যাবর্তনস্থল।' (আয়াত ১২৬)

ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে এই ঘরের নিরাপদ হওয়ার বিষয়টিকে আর একবার তুলে ধরা হলো এবং উত্তরাধিকার বলতে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ বুঝায় তার গুরুত্বও আর একবার জানিয়ে দেয়া হলো। ইবরাহীম (আ.) প্রথমেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন। তিনি তখন থেকেই এ কথাগুলো মনে রেখেছিলেন যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, আমার এ ওয়াদা যালেমদের কাছে পৌঁছবে না। তিনি এ শিক্ষাকে স্মরণ রেখেছিলেন,

এইজন্যে তাঁর দোয়াতে এ কথাগুলো দেখা যায়, যেন সে শহরবাসীকে আল্লাহ তায়ালা ফলমূল-দ্বারা রেযেক দান করেন। এখানে এই দোয়ার হকদার বলতে তাদেরকেই বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে যারা সে শহরবাসীর মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হবে।

অবশ্যই ইবরাহীম (আ.) ছিলেন বড়ই বিনয়ী, বড়ই সহিষ্ণু, বড়ই নিষ্ঠাবান এবং সত্যের ধারক ও বাহক হিসেবে অত্যন্ত মজবুত। তিনি ছিলেন তাঁর রব-এর শিক্ষাপ্রাপ্ত, অত্যন্ত পরিমার্জিত আদব-এর প্রতিমূর্তি। তিনি আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়ার সময় এই আদবের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছেন এবং প্রার্থনা জানানোর সময় খুবই বিনয়াবনত থেকেছেন। এই কারণেই তাঁর রব-এর নিকট থেকে তার কাছে স্পষ্ট জওয়াব আসছে। শেষের কথাগুলোর বিষয়ে তিনি মুখ খোলেননি, অর্থাৎ যারা ঈমান আনবে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।

এরপর ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের প্রতি তাওয়াফকারী, রুকু-দানকারী ও সেজদাদানকারীদের জন্যে যে ঘরটিকে এবাদাতগাহ হিসেবে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে নির্দেশ কত চমৎকারভাবে তাঁরা পালন করেছিলেন তার সুন্দর ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে দৃশ্যের ছবি কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এমন নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে যে পড়ার সময় তাঁদের কাজগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে আর আমাদের কানগুলো যেন তাঁদের কথোপকথনগুলো স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ঐ সময়ের কথা যখন গড়ে তুলছিলো ইবরাহীম কাবা ঘরের ভিত্তি। আর ইসমাঈলও ছিলো তার সাথে। তারা দুজনে বলছিলো........... তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে। অবশ্যই আপনি একমাত্র শক্তিমান এবং আপনি একমাত্র বিজ্ঞানময়।' (আয়াত ১২৭)

আমরা এবার একথাগুলোর ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করবো। এখানে ব্যাখ্যা আসছে একটি ঐতিহাসিক খবর-পরিবেশনের আকারে। ঘটনার বিবরণে বলা হচ্ছে,

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন ইবরাহীম কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলো, আর তার সাথে ছিলো ইসমাঈলও।'

ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

এতটুকু শোনার পর বাকি খবরটুকু শোনার জন্যে আমাদের মন উন্মুখ হয়ে উঠে, এমন সময় আমরা যেন বাস্তব চোখে দেখছি পিতা-পুত্র ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় কাতর কণ্ঠে দোয়া করছেন, আমরা যদিও আমাদের মানস-চোখে তাদের দেখছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁরা দুজনে যেন আমাদের সামনেই রয়েছেন, আমরা তাঁদের কাতর-কণ্ঠের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি,

'ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাচ্ছিলো (তখন তারা এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো, হে আমাদের মালিক, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি) তুমি আমাদের কাছ থেকে সেই কাজটাকে কবুল করো, একমাত্র তুমিই (মানুষের ভেতর বাইরের) সব কিছু জানো এবং শুনো। (তারা আরো বললো,) হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার অনুগত মুসলিম বান্দা বানাও। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার অনুগত(বান্দা) বানিয়ে দাও। (হে মালিক) তুমি আমাদের তোমার এবাদাতের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ

দেখিয়ে দাও। (যদি আমরা এতে কোনো ভুলক্রটি করি, তাহলে) তুমি আমাদের তাওবা কবুল করো, কারণ তুমিই একমাত্র তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।' (আয়াত ১২৭-১২৮)

জনশূন্য নিঝুম সে উপত্যকায় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে কর্মরত শ্রান্ত ক্লান্ত পিতা-পুত্রের কাতর কণ্ঠের আবেগময় দোয়ার সেই মধুর সুরের লহরী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে আশ-পাশের পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সেই সুর আজও যেন আমাদের প্রাণে বাজে। সেই নীরবতা, সেই শূন্যতা আজও যেন সেখানে বিরাজমান, আর তারই মধ্য থেকে যেন ভেসে আসছে আল্লাহ তায়ালার দু'জন বান্দার সেই সুমধুর কথার ধ্বনি। এর সবই যেন আমাদের সামনে ভাসছে, এই মনোরম দৃশ্যের ছবি আজো যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাযির হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের তারে তা সুমধুর ঝংকার বাজিয়ে তুলছে। কোরআনে কারীমে উপস্থাপিত বর্ণনাশৈলীর এই হচ্ছে চমৎকারিত্ব। অতীতের ঘটনাবলীকে এমন সুন্দরভাবে কোরআনে করীম আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, অতীত আর অতীত মনে হয় না, বরং তা জীবন্ত ও বাস্তব বর্তমানে পরিণত হয়ে যায়। তা যেন আমরা শুনতে পাই দেখতে পাই। সেগুলো যেন গতিশীল ও জীবন্ত ছবি হয়ে আমাদের মানস পটে ফুটে ওঠে, সেখানে যেন জীবনের স্বগৌরব স্পন্দন শোনা যায়! এইটিই হচ্ছে সে মহাশিল্পীর তুলির আঁচড়। আর যে কেতাবে এই মহামূল্যবান শিল্পের সমারোহ তা অবশ্যই চির-অম্লান চির অমর।

দোয়ার কথাগুলোতে কাতর কণ্ঠে কি বলা হচ্ছে। এই-ই হচ্ছে নবীর দোয়ার আদব এ হচ্ছে সেই আদব, সেই ঈমান, সেই চেতনা যা কোরআনে করীম নবীদের উত্তরাধিকারদের শেখাতে চায় এবং তাদের হৃদয়ের গভীরে ও চেতনার মধ্যে জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলতে চায়!

'হে আমাদের রব, আমাদের দোয়া মেহেরবাণী করে তুমি কবুল করে নাও, অন্তরের গহীন কোণে আমাদের যে অব্যক্ত কথা লুকিয়ে আছে, যা প্রকাশ করার মত ভাষা আমাদের নেই সে কথাগুলো তুমি একমাত্র শুনতে পাও, আর বিশ্ব-মানবতার কি দুঃখ, কি ব্যথা যা কেউ দেখতে পায় না কেউ জানে না তা একমাত্র দেখো, তুমিই জানো!'

একথাগুলো হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে কাতরকণ্ঠের আরযি পেশ, যাতে করে দুঃখ দারিদ্র ও মানুষের প্রতি যুলুমের অবসান ঘটে, যাতে তার রাজ্যে তার বিধান চালু হওয়ার মাধ্যমে নিগৃহীত মানবতা শান্তির আশ্রয় খুঁজে পায়। এ কাতরকণ্ঠের প্রার্থনাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশী প্রিয়। এর পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীর বারিধারা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা নিজের অন্যতম নাম 'সামীউদ্-দুয়া'- 'দোয়ার শ্রবণকারী' রেখে বান্দাহর অন্তরে আশার আলো জালিয়ে দিয়েছেন। বান্দাহর অব্যক্ত ইচ্ছা ও চেতনার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি তার দ্বারা সম্ভব নয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা বান্দার নিয়তের কথা জানেন এবং তিনি সে বিষয়ে বিবেচনা করবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ.) ও তার পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর কথার উদ্ধৃতি পেশ করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমাদের রব, আমাদের দু'জনকে পরিপূর্ণভাবে আপনার নিকট আত্মসমর্পণকারী বানিয়ে দাও। আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদল মুসলিম বানিয়ে দিন এবং আল্লাহর আমাদেরকে আমাদের বন্দেগীর পদ্ধতিসমূহ শিখিয়ে দিন, আর আমাদের তওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনিই একমাত্র তওবা কবুলকারী মেহেরবাণ।'

এই দোয়ার মাধ্যমে, তাদের ইসলামের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর চেতনায় একথা জাগরুক হয়েছিলো যে তাঁদের অন্তর যেন আল্লাহ পাকের দু'টি আংগুলের মধ্যে অবস্থিত। আল্লাহর পথই সঠিক পথ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন ক্ষমতা বা কোন শক্তি আর কারও নেই। তাঁর দিকেই পিতা-পুত্র দুজনই প্রত্যাবর্তন করছেন এবং নিজেদেরকে তার কাছে সোপর্দ করছেন মূলত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাওয়ার জায়গা রয়েছে।

'এরপর এই দোয়ার অনুসরণেই মুসলিম উম্মাহ্ বংশ পরম্পরায় দোয়া করতে থাকবে, 'উম্মাতের মধ্যে আমাদের একদল নিবেদিত প্রাণ মুসলমান বানিয়ে দাও।'

এই দোয়া মোমেন অন্তরের চাহিদাগুলোর বহিপ্রকাশ। আকীদা-বিশ্বাস সকল মানুষেরই কিছু না কিছু থাকে এবং তা হচ্ছে প্রথম সেই জিনিস যা মানুষকে যে কোন কাজ করার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগায়। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের চেতনার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত-পুষ্ট হওয়ার কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বর্তমান ছিলো, যার জন্যেই তাঁরা সদা-সর্বদা কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন। এ নেয়ামত ছিলো ঈমানের নেয়ামত। এই ঈমানের জন্যে তাঁরা লালায়িত ছিলেন আর তাঁদের রব এর নিকট এই প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন যে, তাঁদেরকে দেয়া নেয়ামত যেন তাঁদের বংশধরদেরকেও দেয়া হয়। একদিকে বংশধরদের জন্যে যেমন জীবনধারণ সামগ্রী সরবরাহের জন্যে তারা দোয়া করছিলেন, তেমনি দোয়া করছিলেন যেন ঈমানের নেয়ামতও তাদের দান করা হয় এবং তাদেরকে যেন এবাদতের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া হয়, স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়-কি এবাদত তাঁরা করবেন এবং তাঁদের তাওবা যেন কবুল করে নেয়া হয় কেননা তিনিই একমাত্র তাওবা-গ্রহণকারী মেহেরবান।

রসূল পাঠানোর জন্যে বিশেষ দোয়া

আরও দোয়া করেছেন যেন তাদের পরবর্তী বংশধরদের পথের সন্ধান না জানা অবস্থায় ছেড়ে দেয়া না হয়, এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমাদের রব তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন........নিশ্চয় আপনিই একমাত্র শক্তিমান, বিজ্ঞানময়।' (আয়াত ১২৯)

ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের দোয়ার বহু বহু যুগ পরে মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ঘটেছে। তাঁর আগমন ঘটেছে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের বংশের মধ্যেই। এদেরকেই তিনি আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদেরকে কেতাব ও হেকমাত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের সর্বপ্রকার খারাবী কলুষতা থেকে পবিত্র করবেন। তাদের দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছিলো, কিন্তু তার বাস্তবায়ন করার সময় যখন আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তিনি তখনই এসেছিলেন-এর আগে নয়। এতে কারো ব্যস্ত হওয়া বা হতাশ হওয়ার পরওয়া আল্লাহর নেই।

আরবের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিদ্বেষ চলছিলো তা নিরসনের ক্ষেত্রে এই দোয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম থেকে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা নিয়েছিলেন, কা'বা ঘরের ভিত্তি গড়ে তোলার পর সে ঘরকে যেন তাওয়াফকারী, এখানে অবস্থানকারী, রুকুদানকারী ও সেজদা-দানকারীদের জন্যে প্রস্তুত রাখা

হয়। কোরায়শদের এরাই ছিলেন পূর্বপুরুষ যারা কা'বা শরীফের খাদেম হিসেবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'হে আমাদের মালিক, আমাদের দুজনকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী বানিয়ে দাও। আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদল মুসলিম বানিয়ে দাও। আরও স্পষ্ট ভাষায় তাঁরা দরখাস্ত পেশ করেছেন,

'হে আমাদের রব তাদের মধ্যে, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করো যে তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে এবং তাদেরকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে। আর তাদেরকে পবিত্রও করবে।'

তাঁরা দু'জনই গোটা উম্মতে মুসলেমাহ্‌র জন্যে ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারকে তাদের দোয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একইভাবে তারা বায়তুল হারামেরও উত্তরাধিকার হয়েছিলেন। এই কারণেই সেই ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়া হয়। এ ঘরকে মোশরেকরাও কেবলা মানতো এবং একে ইহুদী নাসারাদের কেবলা থেকে তারা উত্তম মনে করতো। সাধারণ নাসারাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর মনে করে এবং এই উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কারণে নিজেদের হেদায়াত ও জান্নাতের অধিকারী বলে দাবী করে–মনে করে সব কোরায়েশ ব্যক্তিই ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর, তাদের বুঝা উচিত যে, ইবরাহীম (আ.) তাঁর বংশধরদের উত্তরাধিকারের আমানত ছেড়ে যাওয়ার সময় দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, আমার এই ওয়াদা কিন্তু যালেমরা পাবে না। আর ওই শহরবাসীকে রেযেক ও বরকতদান করার জন্যে দোয়া করার সময় ইবরাহীম (আ.) বিশেষ করে বলেছিলেন। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রোয হাশরের ওপর ঈমান আনবে।'

যখন ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর হুকুমে কা'বা ঘর নির্মাণ ও তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শুরু করেছিলেন তখন তারা এই বলে দোয়া করেছিলেন, যেন তাঁরা নিজেরা মুসলমান থাকেন এবং একদল মুসলিম জনতা যেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পয়দা হয়। যেন তাদের বংশের মধ্যেই তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে রসূল নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং আহ্‌লে বায়ত (বনী ইসমাঈল) দের মধ্য থেকে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে রসূল নিযুক্ত করলেন। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে তাঁর মাধ্যমে এক মুসলিম জাতি গড়ে উঠলো। তারা দ্বীনে ইবরাহীমীর যথাযথ উত্তরাধিকার বলে পরিচিত হলো।

ইবরাহীম (আ.)-এর ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে একসময় দেখা যায় ইমাম নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে। অবশ্য এই পর্যায়ে সমস্ত কথাগুলো একত্রিত হওয়ায় এই ঝগড়া মিটানোর মত যথেষ্ট যুক্তিও এখানে হাযির হয়ে গেলো। কেউ উম্মতে মুসলিমাহ্‌র সাথে ইমামত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো, আর কেউ লিপ্ত হলো রসূল (স.) নবুওয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে। এ'দুটো কথার ওপরও প্রশ্ন আসলো। আরও প্রশ্ন আসলো সঠিক দ্বীন এর তাৎপর্য সম্পর্কে। এসব কথার জওয়াবে নিচের আলোচনা আসছে,

'সেই ব্যক্তি ছাড়া' কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ইবরাহীম এর দ্বীন থেকে যে তার ব্যক্তি সত্তাকে বুদ্ধিহীনতা ও যুক্তিহীনতার দিকে এগিয়ে ....জন্যে মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা পুরোপুরি মুসলমান (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না। (আয়াত ১৩০, ১৩১ ও ৩২)

হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকুব আলাইহিমুসসালাম নিজ নিজ সন্তানদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি দ্বীনের ধারক ও বাহক হিসেবে তাঁদেরকে পছন্দ করেছেন। অতএব তাদের জন্যে অন্য কোন দ্বীন-অনুসরণের সুযোগ নেই, অন্য কোন দিকে তারা মুখ ফেরাতেও তারা পারবে না। আল্লাহ-প্রদত্ত এই সম্মান এবং এই বিশেষ দয়া-অনুগ্রহের নূন্যতম দাবী হচ্ছে তারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ পাকের শোকরগোযারি করবে। এই দ্বীনকে তারা মজবুতভাবে অনুসরণ করবে এবং আমরণ এই দ্বীন-এর হেফাযতের জন্যে তারা আত্ম-নিবেদিত থাকবে। বলা হয়েছে, তোমরা 'মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত।'

এই-ই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম বা ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীন। এই দ্বীনই হচ্ছে খাঁটি ইসলাম। সেই যালেম ব্যক্তি ছাড়া এ দ্বীন থেকে অন্য কেউই দূরে সরে যাবে না যে নিজের ওপর যুলুম করেছে। নিজেকে সে জেহালতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার সাথে সে নিজেকে মিথ্যার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইচ্ছা বিবেক-বুদ্ধির ডাকে সাড়া না দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে সে অবশ্যই চরম নির্বোধ। ইবরাহীম (আ.) হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি যাকে তাঁর মালিক সারা পৃথিবীর নেতা হিসেবে নিজে বাছাই করেছেন এবং আখেরাতে তাঁকে তিনি নেক লোক হিসেবে তুলবেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাকে বাছাই করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

'যখন তার রব তাকে বললেন, আত্মসমর্পণ করো।'

একথা কানে আসার সাথে সাথে কাল বিলম্ব না করে, তিনি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা এদিক-ওদিক চিন্তা তার মাথায় ঠাঁই পায়নি। তাই সংগে সংগেই তিনি বলেছেন,

'আমি রাব্বুল আলামীন এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।'

নির্দ্বিধায় ও তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করার নামই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম, খাঁটি এবং স্পষ্ট ইসলাম। এইভাবে নিজেকে আত্মসমর্পণের পদ্ধতি ও ওসীয়ত তিনি সবার জন্যে রেখে গেছেন। একইভাবে তাঁর পৌত্র ইয়াকুবও (আ.) তাঁর বংশধরদেরকে নির্দ্বিধায় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করার জন্যে ওসীয়ত করে গেছেন। ইয়াকুবই হচ্ছেন ইহুদীদের ভাষায় সেই ইসরাইল যার বংশধর বলে ইহুদীরা নিজেদের পরিচয় দেয়, অথচ তাঁর ওসীয়তকেই তারা মানে না, তারা তাঁর ডাকেও সাড়া দেয় না সাড়া দেয় না তাদের দাদা ইবরাহীম (আ.)-এর ডাকে।

ইবরাহীম (আ.) ও ইয়াকুব (আ.) উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদেরকে আল্লাহর দ্বীন-রূপী এই নেয়ামতকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার মাধ্যমে শোকরগোযারি করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের কথার উদ্ধৃতিই কালামে প্যাকে আসছে,

'হে আমার বংশধরেরা এই দ্বীন-এর ধারক ও বাহকরূপে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকেই পছন্দ করেছেন।'

এটা আল্লাহ তায়ালার নিজের বাছাই। তাঁর নিজে কাউকে বাছাই করার পর সেই ব্যাপারে আর কারো কোন মতামত থাকে না। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী এবং বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহর এই নেয়ামত-দান এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক দ্বীনের ধারক-রূপে বাছাই করা বড় রকমের সম্মান যার জন্যে দুনিয়ার জাতিসমূহ লালায়িত! সুতরাং তাদের

একইভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার যেন এ পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার আগে তারা এই দ্বীন-এর হেফাযতকারী হিসেবে কিছু অবদান রাখতে পারে এবং এজন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সাধনা করতে পারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, তোমরা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না।'

হাঁ, আজ তাদের জন্যে উপযুক্ত সুযোগ এসেছে, সেই রসূল তাদের কাছে এসে গেছেন যাঁর কথা তারা ইতিমধ্যে জেনে গেছে, তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাচ্ছেন। তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের দাদা ইবরাহীম (আ.)-এর ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই রসূলই এসে গেছেন।

এই রসূল সম্পর্কেই ইবরাহীম ও ইয়াকুব আলাইহিমাস সালাম নিজ নিজ সন্তানদের ওসীয়ত করে গেছেন। হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ওসিয়তের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর শেষ লক্ষণ আসা পর্যন্ত তার মুখে এই একই কথা ছিলো। আজ বনী ইসরাইল জাতির আজ সে কথায় কান দেয়া উচিত। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুব মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন? স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন.......আমরা সেই একক সর্বশক্তিমান মাবুদেরই অনুগত্য করবো।' (আয়াত ১৩৩)

ইয়াকুব ও তাঁর বংশধর যারা মৃত্যুর সময় হাযির ছিলো তাদের কথোপকথোনের এই দৃশ্য একটি বিরাট প্রভাব বিস্তারকারী উল্লেখযোগ্য দলীল, যা আজও বনী ইসমাইলের লোকদের মানসপটে ভাসছে। মৃত্যু হাযির, এ কঠিন মুহূর্তে তাঁর বংশধরদেরকে নিয়ে তিনি কি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন? তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে সেই সময়েও কোন্ মহা গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন? কোন্ মহা-সমস্যা সেই মুহূর্তে তাঁকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিলো যে, সেই কঠিন অবস্থাতেও তিনি বারবার সেই কথাটিই উল্লেখ করে তার বংশধরদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা লাভ করতে চাচ্ছিলেন? কোন সে মহামূল্যবান বস্তু যার প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছিলেন তিনি তাঁর বংশধরদেরকে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছিলেন যে, সে মীরাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে যাবে। এই নিশ্চয়তাটুকু লাভ করেই তিনি শান্তিতে এই দুনিয়া ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন। এইসব বিস্তারিত ধারা বিবরণী কি বনী ইসরাঈলদের নিকট রক্ষিত বই পুস্তকে নেই?

সেই পরিত্যক্ত মীরাস ছিলো তাদের জীবন দর্শন ও আকীদা-বিশ্বাস। এই হচ্ছে সেই সম্পদ এবং সব থেকে বড় জিনিস। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তাঁর মৃত্যুর কষ্টকেও ভুলিয়ে দিয়েছিলো। সে কঠিন সময়েও তাঁর যবানে মোবারকে বারংবার এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে,

'তোমরা আমার পর কার এবাদত করবে',

ইয়াকুব (আ.) তাঁর জাতির নাড়ী চিনতেন, তাঁর আশংকা ছিলো যে তাঁর মৃত্যুর পর হয়ত তারা গোমরাহ হয়ে যাবে। এজন্যে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তার প্রশ্নের মধ্যে এই উদ্বেগই প্রকাশ পাচ্ছিল। এই কঠিন মুহূর্তের প্রশ্নটি হয়ত তাঁর জাতির নিকট গুরুত্ব পাবে, তাই বারবার প্রশ্ন করে তিনি তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাচ্ছিলেন যে, অবশ্যই তারা বাপ দাদার মূল মীরাস তওহীদ এর নেয়ামতকে ধ্বংস করে দেবে না। তারাও যথাযথ ওয়াদা করেছিলো, হাঁ আমরা আনুগত্য করবো আপনার মাবুদের, আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও

ইসহাক-এর মাবুদের গোলামী করবো। তাঁর কাছেই আমরা আত্মসমর্পণ করবো। বনী ইসরাঈল তাদের 'দ্বীন'-কে ঠিক মতোই জানে, স্মরণও করে। আলাপ-আলোচনার সময়ও বলে। তাদের মূল মীরাস যে তওহীদ-এর মীরাস, সে কথাও তারা মানে এবং খুব স্পষ্ট করে সে কথাগুলো তারা বলেও। তাদের মৃত্যুপথ যাত্রী মুরুব্বী ও নবীকে তারা কেমনভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছে ও তাদের ওয়াদা-দ্বারা নিশ্চিন্ত করছে।

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের এভাবেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারাও তাকে কথা দিয়েছিলো যে তারা মুসলমান থাকবে।

আজ কোরআন সেই বনী ইসরাইল জাতিকেই জিজ্ঞাসা করছে,

'ইয়াকুব (আ.)-এর মৃত্যু যখন সমাগত হয়েছিলো তখন তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বসূরীরা) সেখানে উপস্থিত ছিলে কি?'

এ বাস্তব কথার সাক্ষ্য দিতে গিয়েই আল্লাহ তায়ালা ওপরের কথাগুলো বলেছেন। তিনি তাদের কথা দিয়েই তাদের হঠকারিতা ধরিয়ে দিতে চান এবং তাদের যাবতীয় ভুল কথাগুলোকে তিনি এই একটি কথা দিয়ে নাকচ করে দিতে চান। তিনি তাদের বর্তমান ব্যবহারকে তুলে ধরে বলতে চান যে, তারা তাদের বাপ ইসরাইল-কে যে কথা দিয়েছিলো তা সবই তারা ভংগ করেছে।

এই বিবরণের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে অতীতের সেই উম্মত এবং বর্তমান বনী ইসরাঈল জাতি এক নয়। এদের পূর্ব-পুরুষেরা নবীর আনুগত্য করে সঠিকভাবে ইয়াকুব (আ.)-এর উত্তরাধিকার রক্ষা করেছিলো। কিন্তু আজকের বনী ইসরাইলরা নবীর পথ ছেড়ে দিয়ে তার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আগেকার সে উম্মত অতীত হয়ে গেছে; যে কাজ তারা করেছে তার পুরষ্কারও তারা পাবে আর তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছো তার বদলাও তোমরা পাবে। আর ওরা যা কিছু করে গেছে তার জন্যে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।'

প্রত্যেককে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে। প্রতিটি পথ, প্রতিটি ঠিকানা এবং প্রতিটি কাজের জন্যে হিসাব দিতে হবে। ওরা ছিলো মোমেন উম্মত। অতএব তাদের পরে যারা এসেছে এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে সে মোমেনদের কোন সম্পর্ক নেই। এই পরবর্তী মানুষেরা পূর্ববর্তীদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না। ওরা একদল এবং এরা আর এক দল। ওদের পতাকা একটি এবং এদের পতাকা আর একটি। প্রথম উম্মতের ঈমানী ধ্যান-ধারণা পরবর্তী উম্মত থেকে ভিন্ন। জাহেলী ধ্যান-ধারণা চিরদিন এক এবং অভিন্ন থাকে। এক যুগের জাহেলী ধারণা ও অন্য যুগের ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, কাজ ও ব্যবহার দ্বারাই সম্পর্ক নির্ণীত হয়। জাহেলী সম্পর্ক নির্ণীত হয় মানুষের গোত্র ও বংশের ভিত্তিতে। ঈমানী চেতনা ও ফাসেকী চেতনার মধ্যে এখানে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে ঈমানদারদের দল ও জাহেলী মতাদর্শের অধিকারীদের মধ্যে বহু বিষয়েই পার্থক্য বিরাজমান থাকে। তারা কোন দিক দিয়েই একদল নয়। তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ও নৈকট্য গড়ে উঠতে পারে না। বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে তাদেরকে এক জাতি মনে হলেও আল্লাহর হিসেবে তারা কিন্তু ভিন্ন জাতি। মোমেনদের দৃষ্টিতেও তারা ভিন্ন জাতি। মোমেনদের দৃষ্টিতে তারাই এক জাতি, যারা এক

মতাদর্শের অধিকারী, তারা যে যামানাতেই থাকুক না কেন এবং যে দেশেরই তারা অধিবাসী হোক না কেন। এক দেশের অধিবাসী বা এক যামানার লোক হলেও মতাদর্শের কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হয়ে যায় এটাই হচ্ছে সঠিক চিন্তাধারা। ঈমানী চিন্তাধারার ভিত্তিতেই মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়; কোন এক বিশেষ মাটির মানুষ হিসেবে তাদের আত্মিক উৎকর্ষ হয় না।

এই ঐতিহাসিক বিবরণের ভিত্তিতে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাবলী ও আল্লাহর সাথে সম্পাদিত তাঁর চুক্তি লক্ষণীয়-আরো লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের কা'বা বায়তুল হারামের ঘটনাবলীর পাশাপাশি রেখে মীরাস ও দ্বীন-এর তাৎপর্য পর্যালোচনা করা। মুসলমানদের সমসাময়িক আহলে কেতাবদের দাবীগুলোর দিকেও লক্ষ্য করা দরকার। তাদের যুক্তিতর্ক সবই দুর্বল ও মূল্যহীন। অপরদিকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে সকল দিক দিয়েই রয়েছে স্বাভাবিকতা।

'তারা বলে, ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে যাও তাহলেই সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়ে যাবে তুমি বরং বলো ইবরাহীমের দ্বীনই সত্য সঠিক জীবন ....আল্লাহর রং আর আল্লাহর রং-এ রংগীন যারা তাদের থেকে সুন্দর রং-এর অধিকারী আর কে হতে পারে? আর আমরা তাঁরই এবাদতকারী, আর তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল নন।' (আয়াত-১৩৫-১৩৬-১৩৭)

ইহুদীদের কথা ছিলো, ইহুদী হয়ে যাও তাহলেই হেদায়াত পেয়ে যাবে। নাসারাদের কথাও একটাই নাসারা হয়ে যাও তাহলে হেদায়াত পেয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা উভয় জাতির কথার এক সংগে জওয়াব দেওয়ার জন্যে নবী (স.)-এর মুখে এই কথা তুলে দিলেন

'বলে দাও, ইবরাহীমের দ্বীন-এর একনিষ্ঠ অনুসারী আমি। আর ইবরাহীম কখনো মোশরেক ছিলো না।'

আমরা এবং তোমরা সবাই ইবরাহীম-এর দ্বীন-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। তিনিই আমাদের ও তোমাদের সবার পূর্ব পুরুষ এবং দ্বীন ইসলামের ভিত্তিই তাঁর থেকে; তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পাবেন বলে ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অথচ এখন তোমরা জ্বলজ্যান্ত শেরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছো। এরপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ঘোষণা দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন। এ দ্বীন সকল নবীর পিতা ইবরাহীম (আ.) থেকেই এসেছে।

'বলে দাও, আমরা আল্লাহ পক্ষ থেকে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও পরবর্তীকালের নবীদের ওপর অবতীর্ণ সব কিছুর ওপর ঈমান এনেছি। মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের ওপর যা কিছু তাদের মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছিলো তাও আমরা বিশ্বাস করেছি। তাদের নিকট অবতীর্ণ সেই কেতাবগুলোতে প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না, আমরা তার কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

সকল নবীর ওপর অবতীর্ণ কেতাবসমূহের মধ্যেই এই ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। সকল রসূলদের মধ্যেও ছিলো এই একই সুর। এই-ই হচ্ছে ইসলামী ধ্যান-ধারণার অন্যতম মূলনীতি। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বত্র এই নীতিই পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম উম্মাহ-ই দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে কায়েম রাখার জন্যে নবীর ওয়ারিস হিসেবে দায়িত্বশীল। তারই 'দ্বীন'-এর দাওয়াতকে সঠিকভাবে অপর জাতির কাছে পেশ করবে। বিপদসংকুল ঘাঁটি পেরিয়ে তারা

হেদায়াতের আলোকে সমুজ্জ্বল করবে। সকল নবীর শিক্ষা এক ও অভিন্ন হওয়ার এটা একটি বৈশিষ্ট যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। মানব-সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ জীবন ব্যবস্থা, এজন্যে কারো প্রতি এতে কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ বা ঈর্ষা না রেখে গোটা মানুষ জাতির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা কাজ করে গেছে।

এই পর্যায়ে এসে যে মহাসত্যটি স্থিরীকৃত হয়ে গেলো তা হচ্ছে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে দৃঢ়-বিশ্বাস পয়দা করা। এটাই হেদায়াতের মূল লক্ষ্য। এই গভীর বিশ্বাসের ওপরই মোমেনদের জীবন টিকে আছে। এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা যার যত বেশী সে ততো বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত। এই বিশ্বাস যার যত নড়বড়ে হেদায়াতের পথে তার দৃঢ়তাও তত দুর্বল। সে দুর্বল বিশ্বাসের কারণেই বিভিন্ন দল মতের মধ্যে বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার কারণে মুসলিম-জীবনে হাজারো অস্থিরতা নেমে আসে। এরশাদ হচ্ছে,

'অন্যরা যেভাবে বিশ্বাস করেছে সেইভাবেই যদি তারাও বিশ্বাস করে তাহলে তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে। যদি তারা সেই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে তাহলে তারা নানাপ্রকার মতভেদে জড়িয়ে পড়বে।'

মনে রাখতে হবে যে, ওপরের কথাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই এই সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে এ কথাগুলো তাঁরই প্রেরিত। এই সাক্ষ্যদানই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে মোমেনদের জন্যে এক মহা সম্মান। হেদায়াত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর কেউই এ ক্ষমতা রাখে না। যে জিনিস দ্বারা আল্লাহ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন সেই জিনিস থেকে কেউ যদি নিরাপত্তা পেতেই না চায় তাহলে অবশ্যই সে সত্য প্রাপ্তির প্রশ্নে জটিলতার মধ্যে পড়বে এবং সত্য সঠিক পথকে দেখেও সে দেখতে পাবে না। যে হেদায়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এবং আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাসও করে না, সে যতই চেষ্টা করুক না কেন প্রকৃত মোমেনকে বিপথগামী করতে পারবে না, মোমেনের ওপর বে-ঈমানের ষড়যন্ত্র কার্যকরীও হবে না, সে যতই বিরোধিতা করুক এবং যতই ঝগড়া-বিবাদে মোমেনকে জড়াতে চাক না কেন আল্লাহ তায়ালাই তাকে পরিচালনা করবেন। তার জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম-সম্পাদনকারী। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা প্রণিধানযোগ্য,

'অচিরেই তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবেন, আর তিনিই শুনেন তিনিই জানেন।'

মোমেনদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা এবং চির সত্য ইসলামী জীবনের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণে হামেশা গৌরব বোধ করা। সম্মানিত বোধ করা সেই সকল নিদর্শনের ওপর যা, আল্লাহ পাক তার প্রিয় মানুষদেরকে দিয়েছেন। কেননা তার কারণেই তারা পৃথিবীর বুকে পরিচিত ও সমাদৃত। এরশাদ হচ্ছে,

'এই হচ্ছে আল্লাহর রং আর আল্লাহর রং-এ যে রঞ্জিত হবে তার থেকে সুন্দর মানুষ আর কে আছে। আমরা হচ্ছি তাঁরই বান্দাহ।'

যে রংটি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে রাংগাতে চান তা হচ্ছে মানব মন্ডলীর কাছে তাঁর শেষ রসূল প্রেরণ করা, যাতে করে সারা পৃথিবী জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মানবতা বোধ গড়ে ওঠে। যার মধ্যে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ, গোত্র প্রীতি ও স্বজনপ্রীতি-থাকবে না সেথায় কোন বর্ণ প্রীতি।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ পাকের কথা,

'আল্লাহর রং! আর আল্লাহর রং থেকে উত্তম রং আর কার আছে?'

আবার আয়াতের শেষে দেখি বান্দাহর কথা,

'আর আমরা তাঁর এবাদতকারী (সর্বক্ষণ তারই অনুগত)।'

অথচ আয়াতের সবটুকুই কোরআনের আয়াত হিসেবে প্রেরিত। এ দুটো অংশকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। এখানে একই আয়াতের মধ্যে একই প্রসংগে এবং পাশাপাশি আল্লাহর কথার সাথে বান্দাহর কথার অবস্থান বান্দাহর জন্যে বিরাট এক সম্মান। এর দ্বারা বান্দাহ ও তাদের রব-এর মধ্যকার এক গভীর সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এর দ্বারা বান্দাহ ও মনিবের সম্পর্কের মজবুতিও দেখানো হয়েছে। এ ধরনের বহু উদাহরণ কোরআনে মজীদের মধ্যে রয়েছে এবং নিশ্চয়ই এর একটা সুগভীর তাৎপর্যও রয়েছে। তারপর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় একটা অকাট্য যুক্তি!

'বলো, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করছো? অথচ তিনি আমাদের যেমন রব, তেমনি তোমাদেরও রব। আমাদের কাজগুলোর ফল আমাদের, আর আমরা একান্তভাবে তাঁরই বান্দাহ।'

আল্লাহ পাকের তাওহীদ ও তার মালিকানার প্রশ্নে কারো কোন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার সাধ্য নেই, তিনি আমাদের যেমন রব তেমনি তোমাদেরও রব। আমাদের কাজের ব্যাপারে আমাদেরকে তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর তোমাদেরকে তোমাদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে। আমরা একান্তভাবে তাঁর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দাসত্ব করি, তাঁর সাথে আর কাউকে আমরা অংশীদার বানাই না । তাঁর বদলে অন্য কারো কাছে আমরা কিছু চাইনা বা আশাও করি না। এই কথাগুলো মুসলমানদের দৃষ্টিভংগীর ও তাদের বিশ্বাসেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এ কথাগুলোর মধ্যে কোন বিতর্ক তোলার বা ঝগড়া করার করার কোনোই সুযোগ নেই।

এই পর্যায়ে এসে বর্ণনাভংগী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তর্ক-বিতর্কের মোড় এবার অন্য দিকে ফিরে যাচ্ছে। এ কথাগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, এ কথার মধ্যে কোনপ্রকার গোঁড়ামী বা না সূচক কথা বলার কানো সুযোগ নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি একথা বলছো যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য ব্যক্তিরা ইহুদী অথবা নাসারা ছিলো!'

তারা ছিলো মূসা (আ.) এর পূর্ববর্তী মানুষ। ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের উদ্ভব হওয়ার অনেক আগের মানুষ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের 'দ্বীন' সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর তা হচ্ছে সুস্পষ্টতই ইসলাম। (যার বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।) এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন?'

এ এমন একটি প্রশ্ন যার কোন জওয়াব নেই। এ প্রশ্নের মধ্যেই একথা নিহিত রয়েছে যে মানুষের বাক্‌শক্তি এর কোন জওয়াব দিতে পারবে না।

তারপর তোমরা এও জানতে পারবে যে, তাঁরা (নবী রসূল ও তাদের সাথীরা) ইহুদী ও খৃষ্টান নাম-এর উদ্ভব হওয়ার অনেক পূর্বেকার মানুষ ছিলেন। এটাও জানতে পারবে যে, তাঁরা ছিলেন প্রথম সারির সেইসব মানুষ, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই বান্দাহ ছিলেন এবং কোন শেরক-এর সাথে তাঁরা জড়িত ছিলেন না। আর হে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি, তোমাদের কাছে যে কেতাব এখনও বর্তমান আছে তা আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সত্য দ্বীন নিয়ে শীঘ্রই আখেরী যামানার নবী আসবেন, যা হবে দ্বীনে ইবরাহীম (আ.)-এর অবিকল নমুনা; কিন্তু সে কথাগুলোকে তোমরা তোমাদের হীন স্বার্থে গোপন করে চলেছো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর সে ব্যক্তি থেকে বড় যালেম আর কে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সেই সাক্ষ্যকে গোপন করে যা তার কাছে অবিকল অবস্থায় আছে?'

তোমাদের জানা উচিত যে, তোমরা যা কিছু গোপন করছো তা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাক্ষ্য গোপন করে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ? কিছুতেই তোমরা তা গোপন করে রাখতে পারবে না। মানুষকে অন্ধ বানানোর জন্যে বা সত্য কথা চেপে রাখার জন্যে তোমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছো তাও একদিন সব বিফল হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা বে-খবর নন সেই সকল কাজ থেকে যা তোমরা করে চলেছো!'

এই কুশ্রী কদাকার এবং নির্বোধ লোকদের কুযুক্তিপূর্ণ কথার চূড়ান্ত জওয়াব দেয়ার পর এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং পরবর্তী নবী রসূল, আর সমসাময়িক ইহুদীদের মধ্যকার বিতর্ক এখন এক সিদ্ধান্তকর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা ইবরাহীম ও তাঁর মুসলিম বংশধরদের বিবরণসহ সমগ্র আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে এখানে এর উপসংহার টানা হচ্ছে,

'এরাও ছিলো এক (ধরনের) সম্প্রদায়, যা সবাই আজ গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে (তার ফলাফল) তাদের জন্যে আর তোমাদের কর্মফল হবে একান্তভাবে তোমাদের জন্যে। তাদের (ভালো মন্দের) জন্যে তোমাদের কখনো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না।' (আয়াত ১৪১)

এখানেই এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটলো, তাদের সাথে যাবতীয় ঝগড়ারও অবসান হলো। হঠকারী ইহুদী ও খৃষ্টানদের বড় বড় দাবী-দাওয়াকেও এখানে অসার প্রমাণ করা হলো। ❑

[কোরআন মজিদ-এর প্রথম পারা ও 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর ১ম খন্ড এখানে সমাপ্ত হলো। এই খন্ডে ছিলো সূরা আল ফাতেহা ও সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ। সূরা আল বাকারার শেষ অংশ রয়েছে এই তাফসীরের দ্বিতীয় খন্ডে।]

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

২০তম খন্ড

২১তম খন্ড

২২তম খন্ড

سيّد قطب
في ظلال القرآن
باللغة البنغالية
المجلد الثانى
ترجمة القرآن
حافظ منير الدين أحمد
AL-QURAN ACADEMY LONDON
إكاديمية القرآن لندن